অখণ্ড জীবন-দর্শন

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

অখণ্ড জীবন-দর্শন

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম-এ

মুখবন্ধ

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৬৪ সালের শেষভাগে আমাকে সৎসঙ্গের সমগ্র ভাবধারা নিয়ে একখানি বই লিখতে বলেন। তার অব্যবহিত পরে এই বই লেখা সুরু করি। 'সত্তা সচ্চিদানন্দময়' ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে বাণীটি আছে, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অবলম্বন ক'রে প্রথম অধ্যায়টি রচিত হয়। একেবারে শেষ অধ্যায় ছাড়া অন্যান্য অধ্যায়গুলি রচিত হয় 'আমাদের গন্তব্য হ'ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি'—এই বাণীর উপর ভিত্তি ক'রে। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি, দীক্ষা, সাধনা, সৃজনতত্ত্ব, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, বিবাহ, পারিবারিক জীবন, সমাজ-জীবন, চতুর্ব্বর্ণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সদাচার, অর্থনীতি, কৃষিশিল্প, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, রাজনীতি, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি বহু বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। উপসংহারে দেওয়া হয়েছে দর্শন অধ্যায়টি। এক কথায় ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের অন্তর-বাহিরের সব দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে—যুগপুরুষোত্তমের সর্ব্বসমস্যাসমাধানী ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে। সপরিবেশ সত্তাসম্বর্দ্ধনাই যে প্রত্যেকের প্রতিপদক্ষেপে কাম্য এবং ঈশ্বরমুখীনতা তথা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমের প্রতি অচ্যুত সক্রিয় নিষ্ঠার ভিতর দিয়েই যে তা' বাস্তবায়িত হ'তে পারে, তা' বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখান হয়েছে। জন, জাতি ও বিশ্বের বৈশিষ্ট্যানুগ, একসূত্রসঙ্গত, সর্ব্বসমন্বয়ী, সর্ব্বতোমুখী বিকাশ ও কল্যাণের উপর সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এককে বাদ দিয়ে যে অপরের সাত্বত স্বার্থ সম্পূরিত হ'তে পারে না, তা' নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জীবন একটি অখণ্ড ব্যাপার, তাই এর প্রত্যেকটি দিকের সঙ্গে অন্য প্রত্যেকটি দিকের রয়েছে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। এই যোগসূত্র দেখাতে গিয়ে অনিবার্য্যভাবে কোথাও-কোথাও পুনরুক্তিদোষ ঘটেছে। যা হোক আমাদের এক পরম সান্ত্বনা এই যে, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প'ড়ে শুনিয়ে তাঁর নির্দ্দেশমত সংশোধন ক'রে রাখা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা-অনুযায়ী পুস্তকের নামকরণ করা হয়েছে 'অখণ্ড জীবন-দর্শন'। তাঁর ঈপ্সিত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপুরণী, সমষ্টি উৎসারণী, ঈশ্বরৈকলক্ষ্য, সামগ্রিক-দৃষ্টিসম্পন্ন, অখণ্ড জীবনদর্শনের চিত্রই এখানে সাধ্যমত অঙ্কন করা হয়েছে।

সমগ্র রচনাটি লিখিত অবস্থায় দীর্ঘদিন প'ড়ে ছিল। ব্যাপারটি সম্প্রতি পরম-পূজ্যপাদ বড়দার গোচরে আসায়, তিনি দয়া ক'রে নিজ দায়িত্বে পুস্তকখানির প্রকাশনার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। তাঁকে জানাই আমার সভক্তি প্রণাম। সৎসঙ্গ প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ এবং প্রুফ-রীডার শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর যে-উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানি লিখতে বলেছিলেন, তাঁর দয়ায় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করব। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হো'ক।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ, ১৩৮০
ইং ১৪।৪।১৯৭৩

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'অখণ্ড জীবন-দর্শন' পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকেই কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত থেকেছি। কোন পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিনি। এর পিছনে আমার একটি ভাবপ্রবণ যুক্তি আছে। সেটি হলো এই যে, পুস্তকটির রচনার সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে বিশ্বচরাচরের ধাতা, পাতা ও ত্রাতা যিনি, সেই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দিব্য প্রেরণা ও নির্দ্দেশ অমোঘভাবে ক্রিয়া করে চলেছে। আমার বুদ্ধি ও বোধের মালিন্যহেতু যা'-কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল তা' লিখিত অধ্যায়গুলি তাঁকে প'ড়ে শোনাবার সময় তিনি দয়াপরবশ হয়ে স্বয়ং সংশোধন ক'রে দিয়ে গেছেন। রচনা সমাপ্ত হবার পর তাঁর ঈপ্সিত অন্যতম কাজ তাঁর অভিপ্রায়-অনুযায়ী সমাহিত হলো ব'লে তিনি সুগভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমার অক্ষমতা অনন্ত। কিন্তু তাঁর নির্দ্দেশিত, অনুমোদিত ও আশিস্‌পূত এই পুস্তকের পরিবর্তন না হওয়াই সমীচীন ব'লে আমার মনে হয়। অবশ্য ছাপার ভুলগুলি সংশোধন ক'রে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি মানুষ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে সুকেন্দ্রিক ও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে চলুক—এই-ই তাঁর অন্তরতম অভীপ্সা। এই গ্রন্থের পঠন, পাঠন ও অনুশীলন যদি আমাদিগকে পরমপুরুষের এই শাশ্বত ভাগবত অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তনে প্রবুদ্ধ করে তবেই এ প্রকাশনা সার্থক হবে।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর **শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস**
১৬।৩।১৯৭৯

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

'অখণ্ড জীবন-দর্শন'-এর তৃতীয় প্রকাশ অনেকদিন আগেই নিঃশেষিত হয়েছে। এ থেকেই এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। পাঠকগণের চাহিদা ক্রমাগত আসতে থাকায় গ্রন্থটির চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল। সৎসঙ্গ আন্দোলনের মূল দর্শনের এই সুন্দর উপস্থাপনাটির আমরা ব্যাপক প্রচার কামনা করি।

সৎসঙ্গ, দেওঘর **প্রকাশক**
১৫।৬।১৯৯৩

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

"অখণ্ড জীবন-দর্শন" গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু ক'রে সমষ্টি জীবন-চর্য্যার সাত্বত ধারা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনদর্শনের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। বিগত সংস্করণে যে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদ ছিল সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধন ক'রে শোভন-সুন্দর ভাবে এই সংস্করণটি প্রকাশ করা হ'ল। আমরা আশা করি পূর্বাপর সংস্করণগুলির মতো এই সংস্করণটিও পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর **প্রকাশক**
১৫।৪।২০০৯

আমার কথাগুলি যদি তোমার-

শুধু কথা-ভিত্তিরই খোরাক মাত্র হয়-

করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে

পৌঁছিয়ে যদি-

বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-

তবে-

পাওয়া যে তোমার

উপলব্ধিরই রয়ে যাবে-

তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমারই "আমি"

সূচীপত্র

সত্তা সচ্চিদানন্দময়

আমি আছি, তার মানে আমার জীবন বা সত্তা আছে। এই সত্তার অস্তিত্ব কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমরা স্বতঃই তা' বোধ করতে পারি। আমাদের আদিম চাহিদা হ'ল—এই সত্তাকে পোষণপুষ্ট ক'রে তোলা। তার জন্যে অনেক কিছু করণীয় আছে। এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর সূত্রাকারে বলেছেন—

"সত্তা সচ্চিদানন্দময়,
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা তাহাই ধর্ম্ম;
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে,
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা,
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন সমুত্থান।"

সৎ মানে বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব, চিৎ মানে সাড়া দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষমতা, আনন্দ মানে বর্দ্ধনসম্বেগ। অর্থাৎ, সত্তা থাকতে চায় চেতনা নিয়ে বৃদ্ধির পথে। এই-ই তার স্বভাব, থাকতে চায় ব'লে থাকার পরিপন্থী যা' তার নিরসন বা নিরাকরণ করতে চায়। তাই, তাকে বলা হয় অসৎ-নিরোধী। অসৎ মানে যা'

অস্তিত্বকে নষ্ট করে। ধর্ম্মের কাজ হলো সৎ, চিৎ ও আনন্দের পরিপোষণ এবং অসতের নিরোধ।

ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বলেছেন—

"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ!"

যা' দিয়ে নিজের ও অপরের জীবন ও বৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাকেই ধর্ম্ম বলে। "ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ একবার্ত্তাবাহী।"

তাঁর ছড়ায় আছে—

"অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম ব'লে জানিস তাকে।
বাঁচা-বাড়ার মর্ম্ম যা'
ঠিকই জেনো ধর্ম্ম তা'।
ধর্ম্মে সবাই বাঁচে-বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম না রে।
শঙ্খচক্রী আজও নারায়ণ
ধর্ম্মস্থাপনে জনম লন।
পূর্ব্বতনে মানে না যারা
জানিস্ নিছক ম্লেচ্ছ তারা।
প্রেরিতে যে প্রভেদ করে
অন্ধতমোয় সাবাড় করে।
না ধরে প্রেরিতে বর্ত্তমান
অন্ধতমোয় হয় প্রয়াণ।
সবার পূরণ করেন যিনি
তাঁরই মুখে বিধির বাণী।
ইষ্টবিহীন যার চলন
টুকরোমিতে তার মরণ।"

এক কথায়, ব্যষ্টি ও সমষ্টি যখন অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের পথে চলে, তাকেই বলে ধর্ম্মাচরণ।

এই ধর্ম্ম যাঁতে জীয়ন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তিনি হলেন আদর্শ। আদর্শকে গুরু, আচার্য্য, ইষ্ট ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে।

আদর্শ

যাহোক, ধর্ম্মের রূপ, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে গেলে আগে বুঝতে হবে আদর্শ বলতে কী বুঝায়, তাই আমরা সুরুতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করব। তাছাড়া, ধর্ম্ম জিনিসটি জীবন ও জগতের সবখানি জুড়ে ব্যাপ্ত, তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গকে অবলম্বন ক'রে আমরা ধর্ম্মের ব্যাপক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

আদর্শ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—"আদর্শ মানে সহজ কথায় এমনতর একটা জ্যান্ত মানুষ যে তার প্রিয়পরমের অকাট্য পীরিতের খাতিরে তার প্রিয়কে তার নিজের ভিতর-দিয়ে পারিপার্শ্বিকে সেবায়, সাহচর্য্যে, সমবেদনায়, তার বহুদর্শিতাকে নিয়ে বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে উদ্দীপ্ত করে, একটা সহজ উন্মাদনায় দুঃখ-কষ্টকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে প্রতিষ্ঠা করে; আর, তার ভিতরে মানুষ দেখতে পায় তার পথ, যাতে সে জীবন ও বৃদ্ধিকে সহজ ও অটুটভাবে আলিঙ্গন করতে পারে।"

আদর্শ মানে কোন অমূর্ত্ত ভাব নয়। আর, তাই আদর্শ বা গুরু হবেন যিনি, তাঁর আবার গুরু থাকা চাই। নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুকে অনুসরণ করার ভিতর দিয়ে ছাড়া মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে না। তার ভিতর অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আর, এই যাঁর না হয়েছে তিনি কখনও আদর্শ বা গুরুপদবাচ্য নন। বিকেন্দ্রিক যিনি, তিনি যত গুণসম্পন্নই হউন না কেন, তিনি কখনও অনুসরণীয় নন। আদর্শের আবার হওয়া চাই বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরমাণ। প্রত্যেকের সহজাত বৈশিষ্ট্যকে তিনি পালন-পোষণ করবেন, প্রত্যেকের স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্যকে তিনি সংরক্ষণ ক'রে চলবেন। কারও ভাবে ব্যাঘাত করবেন না তিনি। তাছাড়া, পূর্ব্বতন ঋষি, মহাপুরুষ ও প্রেরিত বা অবতার-পুরুষদের সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ থাকবে না, বরং থাকবে পরিপূরণ। তিনি কখনও একদেশদর্শী হবেন না। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সবদিককার সুসমঞ্জস ও সামগ্রিক পরিপূরণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নই হবে তাঁর লক্ষ্য। তিনি কখনও গণ্ডীস্বার্থী হবেন না। তিনি হবেন সবার স্বার্থে স্বার্থান্বিত, তাই সবারই মিলনতীর্থ। প্রত্যেকের কল্যাণ তাঁর কাছে আত্মকল্যাণের সামিল। প্রত্যেককে তিনি বোধ করবেন নিজেরই ভিন্ন-ভিন্ন মূর্ত্তি ব'লে।

কোন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁর কাছে স্থান পাবে না, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়

ও দলের লোক তাঁর প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা পাবে। তাঁর কাছে এসে পূর্ব্বতন ঋষি-মহাপুরুষদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হবে সঞ্জীবিত। প্রত্যেকের ধর্ম্মনিষ্ঠা হবে আবেগপ্রবুদ্ধ। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোন স্থান থাকবে না তাঁর কাছে। বরং থাকবে বৈশিষ্ট্যস্ফূরণী, আত্মশক্তি-উদ্বোধনী, দক্ষতাদীপনী, বিজ্ঞানসম্মত দীক্ষার ব্যবস্থা। তাঁর করা, বলা, ভাবার মধ্যে কোন গরমিল থাকবে না। তাঁর বাণী, নীতি ও উপদেশ তাঁর জীবনে ও আচরণে হবে প্রতিফলিত। এক কথায় তিনি হবেন আচরণ-সিদ্ধ আচার্য্য। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, সত্যের এই তিন ভূমি-সম্বন্ধে তাঁর থাকবে সামগ্রিক প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও অধিগতি। সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিন গুণেরই সাত্বত বিনিয়োগ ও বিন্যাস করবেন তিনি। তিনি তথাকথিত অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির উদ্বোধনে মানুষকে ক'রে তুলতে চাইবেন যোগ্যতর ও উন্নততর।

তাঁর সমগ্র ভাবধারা ও কর্ম্মধারা হবে একসূত্রসম্মত এবং সত্তাপোষণী। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে ধারণ-পালন-পোষণসম্বেগ-প্রবুদ্ধ। তিনি হবেন অচ্যুত যোগযুক্ত, ত্রিকালজ্ঞ, তত্ত্বদর্শী ও অভ্রান্ত। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সাত্বত বিবর্ত্তনকে প্রগতিশীল ক'রে তুলতে প্রয়াস পাবেন তিনি। তিনি হবেন একত্বানুধ্যায়ী ও সংহতি-সন্দীপী। সাত্বত কৃষ্টি, ঐতিহ্য সংস্কার ও প্রথাকে তিনি কখনও অবজ্ঞা তো করবেনই না, বরং তিনি সেগুলিকে আরও সন্দীপ্ত ক'রে তুলবেন। তিনি হবেন সহানুভূতিশীল, সেবানিরত, সহজ প্রেমিক মানুষ। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম তিনেরই সলীল সঙ্গতি ও সমন্বয় থাকবে তাঁর ভিতর। আরো অনেক লক্ষণ আছে তাঁর। জীবনকে তিনি কখনও অস্বীকার করেন না। জীবনকে তিনি চান উৎসমুখী ক'রে সবদিক দিয়ে ষোলকলায় বাড়িয়ে তুলতে। তাঁর অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি তাঁকে ক্ষয় ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযানমুখর ক'রে তোলে। তিনি একাকার করতে চান না বা বড়কে ছোট করতে চান না। বরং ছোটকে বড় এবং বড়কে আরো বড় করতে চান এবং প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়ে ব্রাহ্মী বিবর্ত্তনের পথে পরিচালিত করতে চান। তিনি ব্যক্তিস্বার্থকে বাদ দিতে চান না। কিন্তু তাকে স্বতঃ ক'রে তুলতে চান ইষ্ট ও পরিবেশের সেবার মাধ্যমে। মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির অস্বীকার, অবদমন বা প্রশ্রয় কোনটাই তিনি পছন্দ করেন না, বরং তিনি চান সেগুলির সুকেন্দ্রিক, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ, যার ভিতর-দিয়ে মানুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত হ'য়ে

উঠতে পারে। প্রকৃত আদর্শের গুণাবলীর অন্ত নেই। এককথায়, তাঁকে বলা যায় ঈশ্বরের ব্যক্ত প্রতীক।

দীক্ষা

আমরা জানি, আমরা প্রত্যেকেই যোগাবেগ বা সত্তার টান নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এই যোগাবেগ বা টান আমরা যেখানে স্থাপন করব, আমরা গ'ড়েও উঠব তেমনিভাবে। "স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্র-বিশেষে ফল।" "শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" আমাদের টান যদি ঐ আদর্শের উপর পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীভূত করতে পারি—সুনিষ্ঠ অচ্যুত সক্রিয়তায়, তাহ'লে আর আমাদের কোন ভাবনা নেই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তখন সহজেই আমাদের করতলগত হবে। ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণের অধিগমনে সার্থক হব আমরা।

অন্তরের ষোল আনা টান আদর্শে কেন্দ্রায়িত করতে গেলে নিত্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন করতে হয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলি জেনে নেওয়াই দীক্ষাগ্রহণ। দীক্ষা গ্রহণের পর নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য সেগুলি পরিপালন করা চাই। তবেই আদর্শের প্রতি আমাদের অনুরাগ দিন-দিন স্ফীত ও বর্দ্ধিত হ'তে থাকবে। এককথায়, আমাদের চরিত্র তাঁর ভাবে অনুরঞ্জিত হ'তে থাকবে।

সাধনা

এই অনুরঞ্জনার পথে প্রধান অন্তরায় হলো স্বার্থপ্রত্যাশা। আমরা যদি প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে তাঁকে অনুসরণ করি, তবে আমাদের কাছে মুখ্য হ'য়ে ওঠে ঐ প্রত্যাশার পূরণ, ইষ্ট গৌণ হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমরা যে উদ্দেশ্যের কাছে জীবন উৎসর্গ করি, রঞ্জিতও হ'য়ে উঠি তেমনতর। তাই, তাঁর জন্য তাঁকে চাইতে হবে—অস্খলিত নিষ্ঠা-নিপুণ অনুরাগ নিয়ে। ইষ্টের ইচ্ছাপূরণ, ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সাধনই হওয়া চাই আমাদের সত্তার সম্বেগ। বাইরে ইষ্টকে নিয়ে চললেও ভিতরে-ভিতরে অন্য কোন কামকামনা বা প্রবৃত্তি যদি আমাদের কাছে প্রধান হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সেগুলি বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে যে-কোন সময় আমাদের ইষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে পারে। মোটপর, কপটতা নিয়ে এ-পথে শেষ

রক্ষা করা সম্ভব নয়। আবার, টানটা নিষ্ক্রিয় বা অলস হ'লেও তাতে চরিত্রে হাত পড়বে না। টান হ'লে যেমনতর ভাবা, বলা, করা ও চলা আসে, তেমনতর ভাবা, বলা, করা ও চলার অনুশীলন করতে হবে। ইষ্টকেন্দ্রিক ভাবা, বলা, করা ও চলাকেই বলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার। এই সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। একটা মস্ত ভরসার কথা এই যে, যে যেমনই হোক না সে যদি আগ্রহের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচার পালন ক'রে চলে, তার ভিতরে ধীরে-ধীরে ইষ্টনিষ্ঠা ও ইষ্টানুরাগ গজিয়ে উঠতে থাকে। এটা হ'ল একটা অকাট্য মনোবৈজ্ঞানিক সত্য।

ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ও শ্রমসুখপ্রিয়তা

ইষ্টনিষ্ঠা মানে নিতান্তরূপে, নিশ্চিতরূপে নিবিষ্টচলনে, নাছোড়বান্দা হ'য়ে নিঃশেষে ইষ্টানুসরণে লেগে থাকা। সব বিরুদ্ধ আকর্ষণ ও বাধাবিঘ্নকে এড়িয়ে অস্খলিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর স্বস্তি, তৃপ্তি, প্রীতি, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাসাধনে অচ্যুত সক্রিয়তায় ব্যাপৃত থাকতে হবে। এটা একটা নেশার মত পেয়ে বসা চাই আমাদের জীবনে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতি, আশা-ভয়, প্রলোভন, অত্যাচার, সম্পদ-বিপদ, রোগ-শোক, তাড়ন-পীড়ন, ভর্ৎসনা ইত্যাদির কোন কিছুতেই যে আমরা ইষ্ট থেকে টলব না এমন একটা দৃঢ়পণ আমাদের মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসা চাই। তবেই আমরা অপরাজেয় হ'য়ে উঠব জীবনে। এই নিষ্ঠাই মানুষকে ক'রে তোলে পরাক্রমী ও বীর্য্যবান। ইষ্টনিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-হিসাবে থাকে ইষ্টের প্রতি আনুগত্য ও ইষ্টার্থী কৃতিসম্বেগ ও শ্রমসুখপ্রিয়তা। আনুগত্যের মধ্যে আছে প্রীতিবাধ্য চলন। কৃতিসম্বেগ মানে করার ঝোঁক। যাঁকে আমরা ভালবাসি, তাঁর প্রীতিজনক কর্ম্ম ক'রে তাঁকে আমরা খুশি করতে চাই। যতই এমনতর কাজ করা যায়, ততই আরও করতে ইচ্ছা করে। এই পূত-উৎসাহ ও পুণ্য-উন্মাদনা ক্রমেই বেড়ে চলে। কিছুতেই স্তিমিত হয় না। আর, তাই-ই জীবনকে ক'রে তোলে তরতরে ও চিরতরুণ। অফুরন্ত কর্ম্মশক্তির ঢল নামে দেহ-মনে-মস্তিষ্কে। আর, আমরা ইষ্টার্থে এইভাবে যতই পরিশ্রম ও কষ্ট করি না কেন, তাতে কিন্তু কখনও মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ আসে না, এমনকি কোন সুখ-সুবিধা বা প্রশংসা না পেলেও নয়, বরং তাঁর জন্য কষ্ট করতে পারার সুযোগ পাওয়ার দরুনই নিজেকে ধন্য, সুখী ও

কৃতকৃতার্থ মনে হয়। এই সুখ থেকে কখনও বঞ্চিত হ'তে ইচ্ছা করে না। বড়ই প্রিয় মনে হয় এই কষ্টার্জ্জিত আত্মপ্রসাদ। এর কাছে আর সব প্রাপ্তি তুচ্ছ। তাই, নিষ্ঠা এমন একটি দুর্লভ জিনিস যা' মানুষের অন্তরের অভাববোধকে, কাঙ্গালপনাকে, শূন্যতাবোধকে, চাই-চাই দেহি-দেহি বোধকে, প্রত্যাশাপীড়িত পরবশতাকে বিদূরিত ক'রে তাকে স্বরাট, আত্মবশ, পূর্ণতা-প্রদীপ্ত ও ব্রহ্মানন্দমগ্ন ক'রে তোলে।

প্রবৃত্তি

দীক্ষার অনুশীলন ও অনুসরণ কেমন ক'রে মানুষকে নিষ্ঠানন্দিত অনুরাগপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলে তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। আমরা এইবার দেখব কেমন ক'রে ইষ্টনিষ্ঠা ও ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। প্রবৃত্তি বলতে বোঝা যায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ও তৎসঞ্জাত নানা অভিব্যক্তিকে।

প্রবৃত্তি না থাকলে কী হয়

মানুষের ভিতর যদি কোন প্রবৃত্তি না থাকে, তাহ'লে সে হ'য়ে দাঁড়ায় জড়-পদার্থের মত। তাকে পুরোপুরি মানুষের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। বড় জোর তাকে বলা যায় subman বা অপমানব। বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বত্তা, কর্ম্মক্ষমতা সবদিক দিয়ে সে হয় খাটো। সে সমাজের বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তার জীবনসম্বেগ হ'য়ে থাকে স্তিমিত। সে ভালও করতে পারে না, খারাপও করতে পারে না। তাই তার জীবনে বিবর্ত্তনের সম্ভাবনা লুপ্তপ্রায় হ'য়ে থাকে। বেঁচে থেকেও সে জীবন্মৃত।

প্রবৃত্তি-বশ্যতার ফল

আর, মানুষ যদি প্রবৃত্তিগুলির অধীন হয়, প্রবৃত্তির উপর তার যদি কোন আধিপত্য না থাকে, তাহ'লে সে হয় পশুরও অধম। তার দ্বারা তার নিজের ও পরিবেশের যে কত ক্ষতি হয় তা ব'লে শেষ করা যায় না। জগতে আজ যে এত দুঃখ-কষ্ট, তার প্রধান কারণ মানুষের প্রবৃত্তিবশ্যতা। প্রবৃত্তিপরায়ণতা যে পদে-পদে কত ভুল, ভ্রান্তি, অশান্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, দুর্দ্দৈব, সঙ্কট

ও সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে সপরিবেশ মানুষকে মৃত্যুপথযাত্রী ক'রে তোলে তার সীমা সংখ্যা নেইকো। অতীত ও বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত জীবনে, দাম্পত্য জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে যত বিপর্য্যয়ী কাণ্ড ঘটেছে ও ঘটছে তার অধিকাংশেরই মূলে আছে প্রবৃত্তি পরবশতার দানবীয় লীলা। এই-ই মানুষকে সুখী হ'তে দিচ্ছে না, সুস্থ হ'তে দিচ্ছে না। ভূতের মতন তাকে পেয়ে ব'সে বেহদ্দ পাগল নাচনে তাকে নাচাতে-নাচাতে হয়রাণ ক'রে ছাড়ছে। আর, সঙ্গে-সঙ্গে আনছে আরো-আরো ক্ষয়, ক্ষতি, দুর্ব্বলতা, মনস্তাপ, অজ্ঞতা, অন্ধতা ও তামস অভিভূতি। মানুষের জীবন হ'য়ে উঠছে যন্ত্রণাময়। পৃথিবী হ'য়ে উঠছে মনুষ্যবাসের অযোগ্য। মারণযজ্ঞের সমিধ আহরণে সব দেশ আজ ব্যস্ত। তাই মানব-সমাজ আজ বিশ্ব-ধ্বংসের আতঙ্কে অস্থির। এর পিছনে যত কারণই থাকুক, বিশ্লেষণ করতে-করতে শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পাব—মানুষের প্রবৃত্তি-দাস্য ও তৎসঞ্জাত অজ্ঞতাই হ'ল মূল কারণ। তাইতো এগুলিকে বলে ষড়রিপু। রিপু মানে শত্রু। এরা যদি বশে না থাকে, তবে শত্রুর মতই কাজ করে।

প্রবৃত্তি-নিরোধ

এদের এই প্রতিকূল আচরণ দেখে অনেকে এদের চিরতরে উচ্ছিন্ন ও নিরুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারও ফল হ'য়ে ওঠে বিষময়। অস্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তি অবদমনের চেষ্টা করলে, অনেক সময় শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি, বিকৃতি ও দুষ্টাচারের সৃষ্টি হয়, যা' মানুষের জীবনকে ক'রে তোলে পঙ্কিল, জটিল ও অসংলগ্ন। সে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। ধীরে-ধীরে মনের সাম্য হারিয়ে ফেলে। অনিদ্রা, অবসন্নতা, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি, স্নায়ুরোগ, মস্তিষ্কবিকার, সন্দেহ-বাতিক ইত্যাদি নানা উৎকট উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় বোধ, বিবেচনা, কার্য্যকরী ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি, মনোবল, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি লোপ পেতে থাকে। জীবন হ'য়ে উঠতে থাকে নিথর।

প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ

দেখা যাচ্ছে বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ে সব দিকেই বিপদ, অথচ এগুলি না থাকলেও নয়। এখন এগুলি নিয়ে কী করা? এইখানেই আসে আদর্শানুরাগের কথা।

মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম আসক্তি বা যোগাবেগ যদি আদর্শে নিবদ্ধ হয়, তাহ'লে সে প্রবৃত্তির অঙ্গুলি হেলনে প্রবৃত্তির সেবায় আত্মনিয়োগ তো করেই না, বরং প্রতিটি প্রবৃত্তিকে ঐ জীবন্ত আদর্শের সেবায় নিয়োজিত ক'রে ছাড়ে। প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি, পছন্দ, চাহিদা ও প্রয়োজনমত সে চলে না, কারণ, তার চালক প্রবৃত্তি নয়। তা'র চালক হলেন ইষ্ট। ইষ্টের নীতিবিধি, চাহিদা ও পছন্দ-অনুযায়ী সে প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফেরায়। প্রবৃত্তিচলন তার কাছে যতই প্রিয় ও আকর্ষণীয় হোক না কেন, তার মোহ সে বিসর্জ্জন দেয় ইষ্টের প্রতি অনুরাগের দরুন। সে এমন কিছু করতেই চায় না, যাতে ইষ্টের মনে ব্যথা লাগে। আবার, ইষ্টের খুশিমত চলা তার পক্ষে যতই কষ্টকর হোক না কেন, সে-কষ্টও সে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। ইষ্টই যে তার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব। তাঁর তুষ্টি, পুষ্টি, প্রীতি, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা ছাড়া তার জীবনই যে নিরর্থক। ইষ্টই তার জীয়নকাঠি। ইষ্টই তার প্রাণবায়ু। তাঁকে নিয়েই তার বাঁচা। তাঁকে নিয়েই তার জীবনের উপভোগ। ইষ্ট নিজে দাঁড়িয়ে আছেন সব প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে। তাই, তাঁকে ভালবেসে মানুষ অগোচরে প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য লাভ করে।

প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের তাৎপর্য্য

এতে প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তারা ম'রে যায় না বা শুকিয়ে যায় না। বরং সুস্থ, সবল ও সুষ্ঠু হ'য়েই বেঁচে থাকে। আর, তাই-ই কিন্তু দরকার। কারণ, ওগুলি হ'ল মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনা অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার যোগানদার। প্রভুত্ব নিয়ে ইষ্টানুগ সাত্বত ছন্দে যদি প্রয়োজন ও মাত্রামত ওগুলির ব্যবহার করা যায়, তাহ'লে ওরা ভাল বই মন্দের কারণ হয় না। এমনি ক'রে প্রবৃত্তিগুলি অমৃতের উৎসস্বরূপ হ'য়ে উঠতে পারে। ধর্ম্মপ্রাণ জিতেন্দ্রিয় দম্পতির সংযত বৈধী কামচর্য্যার ভিতর-দিয়ে দেবতুল্য সন্তানের আবির্ভাব হ'তে পারে। অথচ মানুষ যদি কামের ক্রীড়ণক হয়, তাহ'লে ঐ কাম যে কত অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে তার অন্ত নেইকো। প্রত্যেক প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেই এমনতর। প্রবৃত্তি ভাল বা খারাপ কিছু নয়। সে ভালমন্দ হ'য়ে দাঁড়ায় ব্যবহারের গুণে বা দোষে। আসল কথা, প্রবৃত্তির হাতে না গিয়ে, প্রবৃত্তিকে হাতে আনতে হবে। আর, প্রবৃত্তিকে হাতে আনতে গেলে প্রবৃত্তিকে হাতে এনেছেন যিনি, তাঁর হাতে যেতে ও থাকতে হবে আমাদের।

বৃত্তি-স্বারূপ্য ও তার অতিক্রমণ

এ-ছাড়া প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ওঠার সম্ভাবনা নেই। কারণ, আমরা সাধারণতঃ প্রবৃত্তির সঙ্গে একাকার হ'য়ে লেপটে থাকি। তা' থেকে আলাদা করতে পারি না নিজেদের। আলাদা হ'তে গেলেই সাত্বত ভূমিতে বিরাজ করছেন আমাদের ঊর্দ্ধে ও বাইরে এমন একজন জীয়ন্ত আশ্রয়, অবলম্বন বা মানুষ চাই। তাঁর সঙ্গে যদি ভালবাসার বন্ধন দিয়ে বেঁধে ফেলি নিজেদের, তাঁকে যদি আঁকড়ে ধ'রে থাকি বুক দিয়ে, তখন তাঁর প্রতিকূল যা', যা' আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় ঐ যোগবন্ধন থেকে, তাঁকে আমরা ভাল ক'রে বোধ করতে পারি, চিনতে পারি, জানতে পারি। এই অবস্থায় প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে আবিষ্কার করা যায় এবং ইচ্ছা থাকলে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। নইলে প্রবৃত্তির কুক্ষিগত থাকি আমরা যখন, প্রবৃত্তি ও আমাদের মধ্যে যখন কোন ভেদরেখা থাকে না, সত্তা যখন বৃত্তি-স্বারূপ্য লাভ করে, তখন প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ব'লে ধরা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনাই থাকে না। তাই, এ ব্যাপারে জীবন্ত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ অপরিহার্য্য। জীবনবৃদ্ধিকামী প্রতিটি মানুষের পক্ষে এই জিনিসটি না হ'লেই নয়। আদর্শে দীক্ষিত ও অনুরাগসম্পন্ন না হ'লে পরিবেশের প্রভাবে ও প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ ভবসাগরে কর্ণধারহীন তরণীর মত নিরুদ্দেশে ভাসতে-ভাসতে কোথায় যে কোন্ অবস্থায় পড়বে তার কোন ঠিক নেই।

গুরুকরণ

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলেছেন—"এ কথা ঠিকই, যার গুরু বা আদর্শ নাই, আদর্শ বা গুরু ব'লে মানা যার কুষ্ঠিতে ভগবান লেখেননি, সে পতিত নিশ্চয়ই। আর, সে যত enlightened-ই হোক, তার পতনও তত enlightenedly."

মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তি

সদ্দীক্ষা তো চাই-ই। কিন্তু তারও পূর্ব্বে চাই মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি। ও থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম পাঠ সুরু হয়।

জীয়ন্ত আদর্শের প্রয়োজনীয়তা

অনেকে বলেন জীয়ন্ত আদর্শ না হ'লেও চলতে পারে। কতকগুলি উচ্চভাব নিয়ে মানুষ যদি চলে, তাহ'লেই হ'তে পারে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর অন্তরের টান নিয়ে যোগবদ্ধ হওয়া কঠিন ব্যাপার। ভাবের সঙ্গে স্থূলভাবে বাস্তব আদান-প্রদান চলে না। আর, ঐ ভাবের বাস্তব রূপও উপলব্ধি করা যায় না, যদি তা' কোন ব্যক্তিতে মূর্ত্ত না হয়। দয়াবানের মাধ্যমেই মানুষ দয়াকে অনুভব করতে পারে। নইলে দয়া একটা কথার কথা মাত্র। সব গুণ সম্বন্ধেই এমনতর। মূর্ত্ত আদর্শ না হ'লে মহত্তর জীবন-সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা বা প্রেরণা সঞ্চারিত হ'তে পারে না। আর, সেই জীবন্ত আদর্শ না থাকলে ভালবাসার যোগটা হবে কার সঙ্গে—যার প্রতি ভালবাসার দৌলতে, যার মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মানুষ তার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত ক'রে মহৎ জীবনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে? তাই, এ-কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা বাস্তবে সফল হয় না।

বহুজনকে অনুসরণ করলে কী হয়?

কেউ-কেউ বলেন, যার কাছে যা' ভাল পাব তার কাছ থেকে তাই নেব। একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাব কেন? কিন্তু এই কথার মধ্যে একটা ভুল আছে। অন্তরের টানকে যদি আমরা বহুধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলি, তাহ'লে আমাদের ব্যক্তিত্বও খণ্ডিত ও সামঞ্জস্যহীন হ'য়ে উঠবে। তাই, ঐ টানকে কেন্দ্রীভূত করা চাই উপযুক্ত একে, এবং তারই পরিপূরণ ও পরিপোষণ মানসে পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে যেখান থেকে যা' প্রয়োজন তা' আহরণ করতে হবে। "ভক্তি একের জন্য বহুকে ভালবাসে, আর আসক্তি বহুর জন্য এককে ভালবাসে।"

কেউ-কেউ আবার বিবেকের দোহাই দেয়। তাদের ধারণা, ভগবদ্দত্ত বিবেকই তো মানুষকে সৎ পথে চালিত করবে। কিন্তু এই বিবেক সবার সমান নয়। যার চলন-চরিত্র, বোধ, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সংস্কার যেমন, তার বিবেকও তেমন। বিবেক মানে সদসৎ বিচার-ক্ষমতা। এ প্রত্যেকের তার মত। তাই, এর মধ্যে যে ভ্রান্তি থাকতে পারে না, তা কিন্তু নয়। বরং অন্তরে মালিন্য থাকার দরুন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিবেকের সিদ্ধান্ত ভুল হ'য়ে থাকে। আর, কোথাও তা'

নির্ভুল হ'লেও তা' মানুষের চলনার নিয়ামক হ'তে পারে কমই। কারণ, যুক্তিবিচার মানুষকে চালিত করে না, চালিত করে তাকে তার ভালবাসার সম্বেগ। এই সম্বেগ যার যেখানে সংন্যস্ত হয়, তার জীবনগতিও তন্মুখী হ'য়ে চলে। আবার, বিবেকবুদ্ধির অছিলায় মানুষ অনেক সময় অগোচরে দুর্ব্বলতাকে সমর্থন ক'রে থাকে। তার নিজের কাছেই তা' ধরা পড়ে না। এমনকি অনেক সময় অন্যেও তা' ধরতে পারে না।

বিবেক-অনুসরণ

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিস্ফুট হবে। অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে স্বজনবধের নানা অনিষ্টকারিতার কথা উল্লেখ ক'রে যুদ্ধপরিহারের সমর্থনে যে-সব যুক্তিপ্রদর্শন করেছিলেন, সেগুলি অকাট্য ও ধর্ম্মসম্মত ব'লেই মনে হয়। কিন্তু তার মধ্যে গলদ কোথায় তা বোঝাবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অজস্র বিষয় আলোচনা করেন। এবং গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে দেখা যায়, অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।" (১৮।৭৩)

ধর্ম্মের নামে এইভাবেই মানুষ প্রায়শঃই মোহ ও বিস্মৃতিকে প্রশ্রয় দেয় এবং তাকেই ধর্ম্ম ব'লে পরম আগ্রহে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। মনের এই কারচুপি মানুষের কাছে ধরা পড়ে না। এমনকি অভ্রান্ত শাস্ত্রাদিরও ব্যাখ্যা ক'রে নিজের মনের মত ক'রে, মনের গোলক-ধাঁধা থেকে তার রেহাই নেই। সেই ভুল ভাঙতে দরকার হয় রক্তমাংসসঙ্কুল আদর্শের, যিনি নিজেই ধর্ম্মমূর্ত্তি। তাঁর হাতে না পড়া পর্য্যন্ত মানুষের মনগড়া ধর্ম্মবোধের মোহ কাটে না, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। মানুষ নিজের স্তর-অনুযায়ী মনন ও ধারণার ঘানিতে ঘুরপাক খায়। তার অসংস্কৃত বোধের উপর রং চড়িয়ে তাকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে আদর্শ ব'লে খাড়া করে। কিন্তু জীবন্ত আদর্শকে গ্রহণ করলে এই ফাঁকিবাজী খাটে না। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন বাস্তবতায় কোন্‌টা কী।

ঠাকুর কথার অর্থ

তাঁর সঙ্গে চলতে পদে-পদে ঠোক্কর লাগে। এই ঠোক্কর দেন ব'লে তাঁকে

বলা হয় ঠাকুর। তিনি কখনও ভুলের সঙ্গে আপোষরফা করেন না। তিনি চির-অচ্যুত, চিরনিনড়। ধর্ম্মের এই চলমান জীয়ন্ত স্বরূপ দেখে মানুষ বুঝতে শেখে, ধরতে শেখে ধর্ম্ম কী। আর, চলতেও শেখে ধর্ম্মের পথে। কল্পনার কুঠুরী ছেড়ে বেরিয়ে এসে দিনের আলোতে প্রকৃত ধর্ম্মকে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ করে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে। আমাদের মনের জগতের ধর্ম্মবোধের সঙ্গে তাঁর সবটা হয়তো খাপ খায় না, কিন্তু তাই ব'লে তাঁকে আমাদের মনের মত ক'রে পেতে চাওয়ার চেষ্টা করা ভাল নয়। তাতে আমরা তাঁর হব না, তঁদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণও হবে না, বিবর্ত্তনও হবে না। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ হ'তে থাকলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, তাঁর তালে-তালে পা ফেলে চলতে হবে—তাঁকে চির-অভ্রান্ত ও চির-মঙ্গলময় জেনে। দিব্যজীবনের পথে প্রধান সম্বল হল আদর্শ বা ইষ্টে নিনড় নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস।

প্রবৃত্তিগুলি সত্তাপোষণী হয় কখন?

এই নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস যদি সুদৃঢ় অতলস্পর্শী না হয়, তাহ'লে মনের কোন্ তরঙ্গ যে আমাদের কখন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেইকো। তাঁকে শুধু কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করলে হবে না, সেই সঙ্গে লাগাতে হবে সমগ্র প্রাণ ও সত্তা। টান যত প্রবৃত্তিভেদী ও সত্তাসঙ্গত হবে প্রবৃত্তিগুলি ততই সুবিন্যস্ত ও সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠবে। তারা তখন বাঁচা-বাড়ার পথে কোন বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারবে না। সবগুলি একমুখী হ'য়ে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে সপরিবেশ সত্তাসম্বর্দ্ধনার ইন্ধন হ'য়ে উঠবে। তখন হৃদয়ঙ্গম হবে প্রবৃত্তিগুলি কতখানি পবিত্র, ঈশ্বরীয় ও অমৃতময়।

সত্তার বিধৃতি

এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে 'বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি'। অর্থাৎ, বৃত্তিগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে মানুষের সত্তা সুষ্ঠুভাবে বিধৃত হয়। ধৃতির মধ্যে আছে ধারণ, পোষণ। আর, এই ধারণ-পোষণ হ'ল জীবনের, অস্তিত্বের। আমরা যতদিন বৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে জীবন যাপন করি, ততদিন আমাদের জীবন কিন্তু আদৌ নিরাপদ নয়। ঐ প্রবৃত্তি-পরায়ণতার মধ্যেই থাকে ধৃতি-বিধ্বংসী বীজ। তা' অলক্ষিতে আমাদের মরণের পথ প্রশস্ত করে। বাঁচার তাগিদে আমরা যেমন এক হাত দিয়ে জীবনের ভিত গড়ি, প্রবৃত্তির তাগিদে অন্য হাত দিয়ে তা' আবার ভেঙ্গে খানখান

করি। একজনের হয়তো শরীর ভাল নয়। সে অনেক চেষ্টায় শরীর ভাল ক'রে তুললো। শরীর ভালোর দিকে যেতেই তাকে হয়তো অমিতাচারের প্রবৃত্তি পেয়ে বসলো। সে তার ঝোঁক সামলাতে পারলো না। তার ফলে তার শরীর আবার খারাপ হ'য়ে গেল। প্রবৃত্তি-পরায়ণতা থাকলেই জীবন-চলনার মধ্যে এমনতর স্ববিরোধিতা, অসঙ্গতি ও আত্মশত্রুতা থাকবেই, তাই ঐ অবস্থায় জীবনধৃতি শক্ত বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না।

জীবন-উপভোগ

তাহ'লে কি আমাদের জীবনে উপভোগ ব'লে কিছু থাকবে না? আমরা কি মরণভীত হ'য়ে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শময় এই আনন্দের জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে বিরসবদনে 'শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিনযাপনের গ্লানি' বহন ক'রে চলব? তা মোটেই নয়। সাত্বত অর্থাৎ সত্তাপোষণী উপভোগ তো চাই-ই। আর, ত্যাগ করতে হবে তারই পরিপন্থী যা' তাই। ত্যাগ-বাতিকগ্রস্ত হ'য়ে সর্ব্বপ্রকার জীবনীর উপভোগকে যদি রূঢ় হস্তে প্রতিরুদ্ধ করা হয়, তবে তা' হবে মৃত্যুর অগ্রদূত—তাই অধর্ম্মের জনক। এককথায়, ত্যাগ ও ভোগের সীমারেখা এমনভাবে নির্দ্ধারণ করতে হবে, যাতে তা' জীবনকে অমৃতসন্দীপ্ত ক'রে তোলে। যা'-কিছুর উপভোগ করতে হবে, সেই মাত্রায়, সেই বিধিতে যাতে কিনা তা' নিজের ও পরিবেশের বাঁচা-বাড়ার প্রতিকূল না হয়। এই মানদণ্ডকে বলে ধর্ম্ম। প্রতিটি উপভোগ হওয়া চাই ধর্ম্মসঙ্গত। তাই গীতায় আছে—'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মিভরতর্ষভ।' বৃত্তির ঊর্দ্ধে যদি না থাকা যায় তাহ'লে কিন্তু তার ধর্ম্মদ উপভোগ সম্ভব হয় না। ওতেই নিমজ্জিত হ'য়ে বেহুঁশ হ'য়ে পড়তে হয়। আর, তেমনতর অবস্থায় প্রকৃত উপভোগও হয় না। যে সাঁতার কাটতে জানে না, সে কি অথৈ জলের মধ্যে নেমে সেই জলকে উপভোগ করতে পারে? উপভোগ করতে চাই আধিপত্য। তাই, ইন্দ্রিয়জয়ী আদর্শে যুক্ত হয়ে, তাঁরই নিষ্ঠানন্দিত অনুসরণে জিতেন্দ্রিয়তা আয়ত্ত করাই হ'ল জীবনকে অব্যাহতভাবে বজায় রাখা ও উপভোগপ্রতুল উদ্বর্দ্ধনের পথে পরিচালিত করার তুক। এটা বাদ দিয়ে সাত্বত জীবনধৃতির সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। এই মৌলিক প্রস্তুতি নেই ব'লেই তো সর্ব্বতঃ-সার্থক জীবনের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিত বলিষ্ঠ মোহন রূপ সাধারণতঃ আমাদের বড় একটা চোখে পড়ে

না। প্রায় জীবনই দেখা যায় ভাঙ্গাচোরা ও অসঙ্গতিবহুল। তার মধ্যে অনেক ফাঁক, অনেক গোঁজামিল। তাই, যেন কেবলই নড়বড় করে, টলমল করে। সব বাধাকে বাধ্য ক'রে, দুর্গতিকে দূর্গ ক'রে অটল ধৃতির অধীশ্বর হওয়ার দুর্জ্জয় বীর্য্য যেন আজ সমাজ থেকে কোথায় অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সেই সুকেন্দ্রিক অমৃততপা ধৃতিপালী অমর-বীর্য্যের জাগরণ চাই সারা পৃথিবীতে। আমরা মরব না, মারব না, বরং মৃত্যুকেই অবলুপ্ত করতে চেষ্টা করব। 'মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়'—এই হবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য। প্রত্যেকের অস্তিত্ব যাতে অটুট হয়, তারই জন্য বদ্ধপরিকর হব আমরা। তা' করতে যা'-যা' করতে হয় তা' করার দায়িত্ব ও সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করব। আমরা বাঁচব, বাঁচাব। আমরা অপরকে বাঁচিয়ে বাঁচব, মেরে বাঁচার পরিকল্পনা করব না। আবার, অপরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হব না। অস্তিত্ব পরমপিতার দান, তাকে অনবধানতা বা উদারতার মোহে খেয়ালখুশিমত বিসর্জ্জন দেওয়া অধিকার আমাদের নেই। পরমপিতার গচ্ছিত ধন রক্ষার পূত দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি আমরা অবহিত হই, তাহ'লে একই সঙ্গে নিজেদের ও অপরের অস্তিত্বরক্ষার সঙ্গতিসূত্র ও কলা-কৌশল আমরা আবিষ্কার করতে পারব।

অসৎ-নিরোধ, হিংসা, অহিংসা

এই চলনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'ল কিন্তু অসৎ-নিরোধ। যা' সত্তাক্ষয়ী তাকে আমরা কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না—তা' আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যের ক্ষেত্রেই হোক। অবশ্য, অসৎ-নিরোধ যত হৃদ্য, নির্ব্বিরোধ, পরাক্রমী অথচ কুশলকৌশলী হয় ততই ভাল। এর মূলেও চাই শুদ্ধবুদ্ধি ও প্রীতি-সন্দীপনা। তাতেই তা' কার্য্যকরী হয়। হিংসা, অহিংসা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ওঠে এখানে। কিন্তু হিংসাকে অক্ষুণ্ণ রেখে অহিংসা কখনও জয়যুক্ত হ'তে পারে না। তাই, হিংসাকে হীনবল করার জন্য যা' করণীয় তা' করা অহিংসারই অপরিহার্য্য অঙ্গ। মানুষের দুরিতবুদ্ধিকে দূর করতে গেলে তাকে করতে হবে ধর্ম্মদান। অর্থাৎ, তার মধ্যে ইষ্টানুরাগ সঞ্চারিত করতে হবে। ইষ্টানুরাগ ব্যতীত মানুষের ভ্রান্তবুদ্ধি অপসৃত হবার নয়। তাই, সত্তাপোষণী যাজন বা ইষ্টপ্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন। মানুষ ঈশ্বরমুখী বা ইষ্টমুখী না হ'লে প্রবৃত্তিমুখী হবেই। এ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। তাই, অহিংসার সাধনাকে সফল ক'রে তুলতে গেলে নিজেরা

ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে অন্যকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তুলতে হবে। তবেই বাঁচোয়া। নইলে আত্মরক্ষাই অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে যার ভিতর যতখানি অক্ষত থাকতে দেওয়া যাবে, তার দৌরাত্ম্য তাকে ও বিশ্বপরিবেশকে ততখানি ক্ষতবিক্ষত করবেই। তার ক্রিয়া সে করবেই। কিছুতেই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাই নিজে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্যই আত্মশুদ্ধি ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে পরিবেশের পরিশুদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বলিষ্ঠ সক্রিয়তায়। এই পরিশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত কঠোরতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। চিকিৎসক যেমন রোগীরই কল্যাণের জন্য প্রয়োজনমত তার দেহে অস্ত্রোপচার ক'রে থাকেন, মানুষের কল্যাণের জন্যও তেমনি প্রয়োজনমত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

অনেকের প্রকৃতিই এমন যে তারা কিছুতেই সৎপ্রণোদনায় প্রবুদ্ধ হ'তে চায় না। তাদের ছলে-বলে-কৌশলে আয়ত্তে আনতে হবে যাতে তারা পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে।

"জন্মগত ভ্রষ্ট যারা
সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত
শুভের পথে পায় না রস।"
"শিষ্টাচারে শঠ প্রবঞ্চক
নাই যদি হয় জয়,
তুল্য ভয়াল সংঘাতে কর
শাঠ্য বুদ্ধি ক্ষয়।"

তাই, অসৎ-নিরোধের ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শন ও শাসনে সংযতকরণেরও একটা স্থান আছে। এই রুদ্রতা কিন্তু হিংসা নয়, তা' অহিংসারই দোসর। ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ তেজ, বীর্য্য, পরাক্রম ও রোষ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

শোষণের নিরাকরণ

সামাজিক জীবনের বিধৃতির ক্ষেত্রে একটা মস্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে মানুষের শোষণ-প্রবৃত্তি। মানুষ যখন অন্যকে উপযুক্ত পোষণ ও সেবা না দিয়ে, তাকে বঞ্চিত করে, তার বাঁচাবাড়াকে ব্যাহত ক'রে তার দ্বারা লাভবান হ'তে চায়,

তাকেই বলে শোষণ-প্রবৃত্তি। দেওয়া ও করার প্রবৃত্তি থেকে নেওয়া ও পাওয়ার প্রবৃত্তি যেখানে প্রবল, সেখানেই দেখা দেয় শোষণ-বুদ্ধি। তাই শোষণ-বুদ্ধি ধনীরও থাকতে পারে, দরিদ্রেরও থাকতে পারে। যার মধ্যেই এটা থাকুক না কেন, তা' কিন্তু নিন্দনীয়। এর ভিতর দিয়ে সমাজে আসে একটা দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা। অনেকে এর প্রতিকারের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা ও অধিকার লোপ ক'রে দিয়ে যাবতীয় সম্পদের সামাজিকীকরণ পছন্দ করেন। তার সুফল যাই হোক না কেন, কিন্তু তাতে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপ পায়, সে কথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। আর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তি যে জীবনে একটা পরম দুর্দ্দৈব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে আমরা এখানে প্রবেশ করব না। তবে আমরা চাই এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ও মালিকানা থাকবে, অথচ তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হবে।

প্রকৃত স্বার্থবোধ

এইজন্য চাই মানুষকে ধর্ম্মশীল ক'রে তোলা। যাতে তার আত্মবোধ ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে বৈশিষ্ট্যসম্মত সক্রিয় সেবায় বৃহৎ পরিবেশে ব্যাপ্তিলাভ করে। মানুষের শোষণ-বুদ্ধির মূল কারণ অজ্ঞতা, অপ্রীতি ও অযোগ্যতা। শোষণ করতে যাব কাকে? যাকে শোষণ করব সেই যে আমার পাওয়ার উৎস। প্রাপ্তির উৎসকে শুকিয়ে তুলে আমার পাওয়াটা ঘটবে কি ক'রে? পরিবেশকে শীর্ণ ক'রে আমি কি কখনও বাঁচতে পারি? পরিবেশ যে আমারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাকে হীনবল ক'রে আমি কি বলীয়ান থাকতে পারি? এই সত্যদৃষ্টি ও প্রীতিবোধের জাগরণ হয় বিশ্বাত্মবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ ইষ্টকে ভালবাসার ভিতর দিয়ে। আর, সেই জ্ঞান ও ভালবাসাই জাগিয়ে তোলে যোগ্যতা।

"ভালবাসার টান—
কর্ম্মে আনে সবলতা
জীবনে উত্থান।"

বড়ত্বের সাধনা

আর, যোগ্যতর যারা তাদেরও তখন আগ্রহ হয় স'য়ে-ব'য়ে পেলে-পুষে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে হাতে-কলমে ক'রে-করিয়ে অযোগ্য যারা তাদের যোগ্য

ক'রে তুলতে। তা' না হ'লে যে তাদেরই চলবে না। সকলে মিলে যেন তখন একটা মানুষ। তার মধ্যে কেউ পড়লে সে-পতনের আঘাত এসে লাগবে প্রত্যেকের গায়। বাস্তব ব্যাপারও এমনতর। আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্ন ও প্রবৃত্তি-অভিভূত ব'লে বোধ করতে পারি না, পরিবেশের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের কি গভীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। তাই আমরা উদাসীন থাকি, নিষ্ক্রিয় থাকি। একক বড়ত্বের সাধনা করি। কিন্তু সে বড়ত্ব টিকতে পারে না, যদি পরিবেশকে সাথে-সাথে টেনে তোলা না হয়। তাই, চাই সুকেন্দ্রিক প্রীতি-সঙ্গতি যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভালর জন্য উঠে-প'ড়ে লাগে। এই হ'ল স্বার্থের ভিত। নিজের ভাল মানে এতখানি। এই বোধকে মানুষের মেরুমজ্জায় মিশিয়ে আনতে হবে। ইষ্টকে সঞ্চারিত ক'রে মানুষের মনন, বচন ও চলনে যুগান্তর আনতে হবে। আবার, এই চলনার পরিপন্থী চলনায় চলতেই বদ্ধপরিকর যারা, তাদের বিরুদ্ধে বিহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসন প্রবর্ত্তন করতে হবে। এটাও ধৃতিপোষণী অসৎ-নিরোধের অঙ্গ। তবে দোষকে ঘৃণা করলেও আমরা যেন দোষীকে ঘৃণা না করি। সাত্বত বুদ্ধিকে আমাদের নিরন্তর সজাগ রাখতে হবে। তবেই সত্তার ধৃতি অটুট হবে।

পরিবেশ ও চেতনা

বাঁচতে গেলে পরিবেশকে ঠিক করা যে কতখানি প্রয়োজন সে-বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু এর ভিতর আরো গভীর কথা আছে। আমাদের চেতনা ও অনুভূতির মূলে আছে পরিবেশ। পরিবেশের স্মৃতি বা সংঘাত ছাড়া আমরা চেতনা বা অনুভূতিসম্পন্ন থাকতে পারি না। তাই, যদি আমরা উন্নত চরিত্র, চেতনা ও অনুভূতিকে সহজ ক'রে তুলতে চাই, তবে পরিবেশকেও উন্নত ক'রে তোলা প্রয়োজন।

সহানুভূতি ও সেবা

মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি হচ্ছে সহানুভূতি অর্থাৎ অন্যের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করা। এইটে হ'ল প্রাকৃতিক নিয়ম। তার কারণ, সবার মধ্যে একটা সত্তাগত মিল আছে। তাই, একের অনুভূতি অন্যের অন্তরেও অনুরণন তোলে। যার ভিতর প্রেম যত গভীর, তার এই সহানুভূতি তত সুদূর ব্যাপ্ত, তীব্র ও

সক্রিয়। যিনি বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত, তিনি বিশ্বচরাচরের স্থাবর-জঙ্গম প্রতিটি সত্তার প্রতি গভীরতম সক্রিয় সহানুভূতি বোধ করেন। তাঁর কাজই হয় প্রত্যেকের সুখ বাড়িয়ে তোলা এবং দুঃখ লাঘব করা। নিজের স্বস্তির জন্যই তিনি তা' না ক'রে পারেন না। অমনতর আদর্শপুরুষে অনুরাগ-সম্পন্ন যারা, তাদেরও সহানুভূতি দিন-দিন ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে। এই সহানুভূতি আত্মপ্রকাশ করে অনুসন্ধিৎসু সেবায়। পারিবারিক জীবনে এর দৃষ্টান্ত আমরা হামেশা দেখতে পাই। আদর্শ বা ইষ্টকে অনুসরণ ক'রে চলে যারা, তাদের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠে একটা বৃহত্তর পরিবারের বোধ। তাদের মধ্যেও পারস্পরিক সেবাবিনিময় ও সহযোগিতা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। এই করার পিছনে কোন লোক দেখান ভাব বা দয়া-প্রদর্শনের অহঙ্কার ঠাঁই পেতে পারে না। কারণ, করার মূলে থাকে ইষ্টকে প্রীত করার বুদ্ধি। ভাইয়ের মধ্যে যেমন পিতা আছেন, ইষ্টভ্রাতার মধ্যে তেমনি ইষ্ট আছেন। এই বোধে সেবাটা হ'লে মানুষ সেবা ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করে। অন্যকে ধন্য করছি এমনতর দম্ভ আসতে পারে না। প্রথমে ইষ্টভ্রাতা ব'লে সেবাটা সুরু হ'লেও, সে দেখতে পায় ইষ্ট সর্ব্বজীবের মঙ্গলকামী। তাই, তার সেবার পরিধিও দিন-দিন ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে।

ধর্ম্মদানই সর্ব্বোত্তম সেবা

পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে সর্ব্বোত্তম সেবা হ'ল ধর্ম্মদান। কারণ, তার ভিতর-দিয়েই মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি ও যোগ্যতার জাগরণ হয়। এই সেবাকে মুখ্য ক'রে অন্য সর্ব্বপ্রকার সেবা দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকে অন্তরে-বাইরে প্রকৃতভাবে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে। সুকেন্দ্রিক সেবায় সেব্য-সেবক উভয়েই শ্রেয়মুখী হ'য়ে ওঠে। মানুষের প্রবৃত্তিপরায়ণতার গায়ে যদি হাত না পড়ে, তাহ'লে সে যতই সেবা পাক না কেন, সে-সেবা তার অভ্যুদয়ের কারণ হয় না। যে প্রবৃত্তিস্বার্থী, সে সবকিছুর ভিতর থেকে প্রবৃত্তিকেই পুষ্ট ক'রে তুলতে চায়। আর, প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করা মানে সত্তাকে সঙ্কুচিত করা। যে নিজের সত্তাকে সঙ্কুচিত করতে অভ্যস্ত, সে অন্যের সত্তায়ও অপঘাত হানতে কসুর করে না। তাই, মানুষকে বিদ্যা, বিত্ত, বিষয় যা'ই দেওয়া যাক না কেন, তাকে যদি চারিত্র্য না দেওয়া যায়, আদর্শ না দেওয়া যায়, তবে তাকে কিছুই দেওয়া হ'ল না। তার সম্পদ ও সামর্থ্য সে-ক্ষেত্রে তার ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণেরও হেতু হ'তে

পারে। তাই, সহানুভূতির বশে,আমরা যার প্রতি যা'ই করি না কেন, দেখতে হবে তার ভিতর-দিয়ে সে সাত্বত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে কিনা, শুধু উপরসা সেবা দিলে হবে না, মানুষের জীবনের গভীরে যে ক্ষত আছে, যার দরুন মানুষ প্রতিনিয়ত কষ্ট পায় ও কষ্ট দেয়, তাকেও সারিয়ে তুলতে হবে। নইলে, সে-সেবা ফুটা পাত্রে জল ঢালার সামিল হবে। অনেক সেবা ক'রে দেখা যাবে—কারও জন্য করা হয়নি কিছু। কল্যাণের রসদ দেওয়া হয়নি কাউকে। তাই ব'লে বাহ্যিক সেবা দেওয়াটাকে আমরা কিন্তু মোটেই লঘু করছি না। সেটাও চাই।

লোক-ব্যবহার

সেবা ও ব্যবহার যা' কিনা সহানুভূতির অঙ্গ, তা' কেমনতর হবে, সে-সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কথাটি হ'ল—

"অপরের প্রতি কর সেই আচরণ
নিজে তুমি পেতে যাহা কর আকিঞ্চন।"

সহানুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য্য নিহিত আছে এই নীতিটির মধ্যে। এই নীতির অনুবর্ত্তনে জগৎ স্বর্গে পরিণত হ'তে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি বিচার করা যায়, তবে দোষদর্শন বা ঘৃণার কোন স্থান থাকতে পারে না। তখনই চিন্তা আসে, যে যা' করে, সে তা' কোন্ অবস্থায় প'ড়ে কেন করে। তার জন্মগত প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধেও চিন্তা আসে, আমি ঐ-অবস্থায় পড়লে কি করতাম ও কেমনতর ব্যবহার পেলে খুশি হতাম, তাও মনে আসে। স্বতঃই তখন দয়া, ক্ষমা, সহ্য, ধৈর্য্য, ইষ্টানুগ অধ্যবসায় এসে পড়ে। তাই ব'লে যে অসৎ-নিরোধ লুপ্ত হ'য়ে যায়, তা' কিন্তু নয়। তবে মানুষের সহানুভূতি যত বাড়ে, জ্ঞানও তত বাড়ে। আর, ঐ জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায়—কোথায় কিভাবে অশুভকে শুভে বিন্যস্ত করা যায়। আর, মানুষের যদি পরিবর্ত্তন করতে হয়, তাও তো তার ভালবাসার সূত্র ধরে। আর, সেই সূতোটি বহুক্ষেত্রে হাতে পাওয়া যায়, যদি তাদের সহানুভূতির সঙ্গে স'য়ে-ব'য়ে নেওয়া যায়। অন্তর ও চরিত্র যাদের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, বিকৃত ও অপরাধবহুল তাদের সুস্থ ক'রে না তুলতে পারলেও তো নয়। তাদের অসুস্থতা যত উগ্র হবে, সমাজের উপরও তার বিষক্রিয়ার সংক্রমণ হবে তত তীব্রভাবে। তাই, এদের যথাসম্ভব ভাল ক'রে তোলা চাই-ই। এদের বাদ দিলে পূর্ণ দায়িত্ব সহকারে সমাজের সেবা

করা হবে না। তাইতো দেখতে পাই পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকে বাদ দেন না। জঘন্যতম লোকদেরও মনেপ্রাণে ভালবেসে, তাদের শুধরে তোলেন তিনি। তাঁর এত ভালবাসা পেয়েও কেউ-কেউ প্রকৃতিবেশে তাঁকেই বিষের ছোবল মারতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু তিনি নীলকণ্ঠের মত সব বিষ হজম ক'রে, তাদের অমৃতই বিতরণ ক'রে চলেন। এমনি ক'রেই ধীরে ধীরে দানবের বুকে মানবকে জাগিয়ে তোলেন তিনি। সহানুভূতি ও প্রীতির এই দিব্য সেবা বাদ দিয়ে আজকের মানব-সমাজ কিন্তু কিছুতেই আত্মস্থ হ'তে পারবে না। পৃথিবীর সঞ্চিত হলাহল অমৃত-বিবর্ত্তনের পথ না পেয়ে নিত্য-নূতন বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে মানবের সমাজ, সংসার ও সভ্যতাকে অভিশপ্ত ক'রে তুলবে।

সহানুভূতির অন্তরায়

আর একটা টোটকা কথা আছে সহানুভূতির প্রসঙ্গে। দুঃখ-দুর্দ্দশায় মানুষকে সহানুভূতি দেখান যত সহজ, তত জয়, যশ, গৌরবের বেলায় তার সঙ্গে সমানতালে আনন্দ করা কিন্তু তত সহজ নয়। এর মূলে আছে পরশ্রীকাতরতা। অন্তরে পরশ্রীকাতরতা বা অহঙ্কার ইত্যাদি থাকতে সহানুভূতি সুসম্পূর্ণ হ'তে পারে না। পরশ্রীকাতরতা যেমন সৌভাগ্যবানের প্রতি মানুষকে বিদ্বেষপরায়ণ ক'রে তোলে, অহঙ্কার আবার তেমনি সৌভাগ্যবান যে তাকে সবার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে মিশতে দেয় না। কোনপ্রকার হীনম্মন্যতা থাকলে তা' মানুষকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে। অনাবিল, অব্যাহত সহানুভূতি তার পক্ষেই সম্ভব হ'তে পারে যে ইষ্টে নিবদ্ধ ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা হ'তে বহুলাংশে মুক্ত।

সংহতি

ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে বহু মানুষ যেখানে আদানে-প্রদানে, সেবায়-সহযোগিতায়, বাস্তব সক্রিয়তায় সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে, সেখানেই গজিয়ে ওঠে প্রকৃত সংহতি, সেই সংহত জনসমষ্টি সারা দেশ এমনকি সমগ্র জগৎকে সুসংহত ক'রে তুলতে পারে।

আদর্শপ্রাণতা ও সংহতি

সংহতির প্রাণ হ'ল একাদর্শপ্রাণতা। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি আদর্শ হবেন

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। অমনতর আদর্শকে অবলম্বন ক'রেই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও সত্তাগত চাহিদা পরিপূরিত হ'তে পারে। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে মানবমিলনের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। প্রত্যেকটি মানুষই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র, প্রত্যেকের পোষণ-প্রণালীও ভিন্ন, দুনিয়ায় প্রত্যেকের উপযোগিতা ও অবদানও বিভিন্ন। প্রকৃতিগতভাবে যে যা' সে যদি তা' না থাকে বা না হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তার যে কাজ সে তা' করতে পারে না, তাই সমাজও তার অনন্য সেবা ও অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। এতে সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সমাজও পঙ্গু হয়। যে কবিত্বের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, তাকে তার প্রতিভার স্ফুরণের সুযোগ না দিয়ে যদি অন্য কোন প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত ক'রে রাখা হয়, তবে না পারে সে ঐ জোর-ক'রে-চাপান কাজ ভালভাবে করতে, না পারে তার বিশিষ্ট গুণকে বিকশিত ক'রে তুলতে। সমাজ-জীবনের পক্ষে সে অনুপযোগী হ'য়ে ওঠে। তার নিজের জীবনে কোন সার্থকতার বোধ থাকে না। মনের মধ্যে একটা ব্যর্থতা, দ্বন্দ্ব ও অশান্তির হাহাকার গুমরে মরতে থাকে।

বৈশিষ্ট্য-পোষণ

তাই, আদর্শ বা ইষ্ট যিনি হবেন, তাঁর ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করার ক্ষমতা চাই। সঙ্গে-সঙ্গে জানা চাই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে ষোলকলায় ফুটিয়ে তোলবার কলাকৌশল। গোলাপগাছের পরিচর্য্যা ও চামেলীগাছের পরিচর্য্যা একরকম নয়, যদিও দু'টোই ফুলগাছ। এমনকি দু'রকমের গোলাপগাছের পরিচর্য্যার মধ্যেও বিভিন্নতা থাকে, মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রেও দুটি মানুষের জন্য করণীয় ঠিক এক নয়। যার জন্য যখন যেমনভাবে যা' করা প্রয়োজন, তার জন্য তখন তেমনভাবে তাই করতে হবে। একেই বলে বিধি, এইভাবে প্রত্যেকটি মানুষকে যদি তার বিশিষ্ট রকমে বিকশিত ক'রে তোলা যায়, তবেই মানব-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। কারণ, ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি।

ব্যষ্টি, সমাজ ও রাষ্ট্র

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা প্রয়োজন। অনেক সময় রাষ্ট্রনায়ক বা সমাজনায়কগণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্র বা সমাজের প্রয়োজনপূরণের একটি যন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করেন এবং সেইভাবেই তাঁরা বিধিবিধান প্রণয়ন ক'রে থাকেন।

এর চাইতে মারাত্মক ভুল আর হ'তে পারে না। ব্যক্তি বৃহৎ রাষ্ট্র বা সমাজ-যন্ত্রের নাটবল্টুর সামিল নয়। সেই যন্ত্রদানবকে চালু রাখাই তার একমাত্র কাজ নয়। তার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, নিরপেক্ষ উদ্দেশ্য আছে। তা' হ'ল তার আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরোপলব্ধি, রাষ্ট্র ও সমাজকে বরং তাই এমনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে তার অন্তর্গত প্রতিটি ব্যষ্টি আত্মোপলব্ধি ও ঈশ্বরোপলব্ধির সুযোগ পায়। ব্যষ্টি রাষ্ট্র বা সমাজের ক্রীতদাস নয়। প্রতিটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যসম্মত সুষ্ঠু-বিকাশের জন্যই রাষ্ট্র ও সমাজ। রাষ্ট্র ও সমাজ যত সময় পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যের অনুগামী, তত সময় পর্য্যন্ত রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে সহযোগিতা, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে চলা ব্যষ্টির সাত্বত কর্ত্তব্য ও স্বার্থেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজ যেখানে এই সাত্বত লক্ষ্য হ'তে বিচ্যুত ও বিভ্রষ্ট, সেখানে তাকে আদর্শানুগ ছন্দে অভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব জনগণের। এই হ'ল সাত্বত গণতন্ত্রের তাৎপর্য্য।

প্রত্যেকের গভীরতম পরিপূরণ চাই

প্রত্যেকের ভক্তি, বিশ্বাস, ধর্ম্মমত, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, জন্মগত প্রকৃতি ও চাহিদা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে জনগণকে যদি জীবনবৃদ্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহ'লেই সংহতির ভিত হয় পাকা। তখন প্রত্যেকেই মনে করে সে ব্যাহত হয়নি, পরিপূরিত হয়েছে। আর, ঐ এক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকার দরুন তারা একটা স্ফটিক সংগঠনে সুসংবদ্ধ হ'য়ে ওঠে। আদর্শ হলেন সেই সূত্র, যিনি সবাইকে প্রীতির-বন্ধনে গ্রথিত ক'রে তোলেন। তখন কেউ দূর থাকে না, কেউ পর থাকে না, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে ওঠে। এই সংহতির প্রতীক হ'ল মানবদেহ। আর প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যেকটি অঙ্গের ও সমগ্র জীবন্ত-দেহের পোষণদাতা। মানুষের সমাজদেহে পরস্পরের মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ গজিয়ে তোলাই ভাগবত সংহতির লক্ষ্য।

সংহতির বাস্তবরূপ

সৎসঙ্গ সেই মহাসংহতিরই উদ্গাতা। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ, পারসী, প্রতীচ্যবাসী, প্রাচ্যবাসী, বাঙ্গালী, বিহারী, মাদ্রাজী, গুজরাটি, মারাঠী, উড়িয়া, আসামী, পাঞ্জাবী, কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেসী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ,

সমাজসেবী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, সৈনিক, কৃষক, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, অভিজাত, অপাংক্তেয়, ধনিক-শ্রমিক, জমিদার-প্রজা, পুরুষ-নারী, শিক্ষক-ছাত্র, প্রবীণ-তরুণ, বিশ্বাসী-নাস্তিক, অধ্যাত্মবাদী-জড়বাদী, সাধু-তস্কর, ভাল-মন্দ ইত্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকারের লোক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রে কেমন ক'রে যে এক দিব্য মিলন-মধুচক্র রচনা করেছে—ইষ্টানুগ সক্রিয় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে, তা' এক পরম বিস্ময়ের বিষয়। এদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাবিরোধ, দলতান্ত্রিকতা, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির স্থান নেই বললেই হয়। যদিও দোষেগুণে সব ধরণের মানুষই এখানে আছে। এখানে বিজ্ঞানসম্মত সদ্দীক্ষা ও ইষ্টানুবর্ত্তিকাকে কেন্দ্র ক'রে সংহতির যে দিব্য ছবি রূপপরিগ্রহ করেছে, তাতে ভরসা হয়, এর উপযুক্ত সঞ্চারণার মাধ্যমে শুধু ভারতকে নয়, একদিন সারা জগৎকেও সুসংহত ক'রে তোলা সম্ভব হবে। সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম ও আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠবে এক বৈচিত্র্যসমন্বিত ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব, যেখানে মানুষমাত্রেই মানুষের ভাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরমাত্মীয়, তা' শুধু ভাবায় বা বলায় নয়, যুগপৎ ভাবায়, বলায় ও করায় অর্থাৎ বাস্তবে সর্ব্বতোভাবে।

ব্যষ্টিজীবনে সংহতি

সংহতি যে শুধু সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োজন, তা' নয়। ব্যষ্টিগত জীবনেও চাই সংহতি। মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তি, অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁক, সহজাত-সংস্কার, কর্ম্ম, বাক্য ও মনন যখন ইষ্টার্থ-সার্থকতায় একমুখী হ'য়ে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তখনই সে অখণ্ড সংহতব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। আর, তখনই সে জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারে। তার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে থাকে প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গতি। তার বেচালে পা পড়ে না। তার প্রতিমুহূর্ত্তের প্রয়াসই তখন হয় সৃজনমুখী, গঠনমুখী। ধাপে-ধাপে সে এগিয়ে চলে ঋদ্ধতর জীবনের পথে—জয় হ'তে জয়ে, যশ হ'তে যশে, বৃদ্ধি হ'তে বৃদ্ধিতে সঞ্চরণশীল হ'য়ে। আর, সংহত ব্যক্তিত্বই গণসংহতি সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে।

সংহতির সুফল

ব্যষ্টিগতজীবন বা সমষ্টিগতজীবন, যেখানেই ইষ্টানুগ সংহতির আবির্ভাব হয়, সেখানেই জাগরণ হয় মহাশক্তির। তখন শক্তি কতকগুলি রুদ্ধ বিচ্ছিন্ন কুঠুরীর

মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে না। সবগুলির মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ যোগসূত্র রচিত হয়। যার ফলে এক বিপুল শক্তিপ্রবাহ অব্যাহতভাবে তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলে। সমষ্টিও সেখানে যেন একটি ব্যষ্টি। জীবনবৃদ্ধির জন্য সমষ্টিদেহের যে অঙ্গে তখন যেমনতর যতটা শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন, সকলের যৌথ প্রচেষ্টা ও স্বার্থই হ'য়ে ওঠে বিহিতভাবে তার ব্যবস্থাপনা ক'রে সামগ্রিক সাম্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে চলা। তখন কেউ নিজেকে অসহায় বোধ করে না। প্রত্যেকেই জানে যে তার পিছনে অন্য সবাই আছে। তার ভাবনা কি? ভগবানের সন্তান হিসাবে মানুষ যে অনন্ত শক্তির আধার, তা' সে স্থূলভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে যদি ইষ্টানুগ সেবা, প্রীতি, সহানুভূতি, পারস্পরিকতা, সহযোগিতা, সংহতি, বিপুল, গভীর ও সলীল হ'য়ে ওঠে। মরজগৎই তখন অমরার নন্দন কাননে পরিণত হয়। সেখানে থাকে না দুঃখ, ব্যথা, অভাব। এগুলি থাকবে কি ক'রে যদি প্রত্যেকের জন্য সবাই হয়, সবার জন্য প্রত্যেকে হয়? একজনের অসুবিধা হ'তেই তো বিশজন সেখানে গিয়ে হাজির হয় এবং সেটা দয়া বা কর্ত্তব্য করার জন্য নয়—ইষ্টকে প্রীত করার জন্য। পরিবেশকে সুস্থ স্বস্থ ক'রে তুলে নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বস্তি বজায় রাখার জন্য। প্রত্যেকের জ্ঞান যদি এতখানি প্রোজ্জ্বল না হয়, প্রত্যেকের আত্মবোধ যদি এতখানি ব্যাপ্তিলাভ না করে, তাহ'লে ধর্ম্ম সেখানে একটা কথার কথা মাত্র। অজ্ঞতাকে অপসারিত ক'রে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে—অন্য মানে আমি, অর্থাৎ আমারই এক ভিন্ন রূপ, যে কিনা আমারই অস্তিত্বের অন্যতম জীয়ন-কাঠি। আমি আমাকেই অসুস্থ রেখে কিছুতেই ভাল থাকতে পারি না। সকল মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি, যে একসূতোয় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ান, তা' মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করা যায়, যখন প্রেমস্বরূপ ইষ্টের চলন শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করা যায়।

ব্যষ্টির সার্থকতা

তাই, একের শক্তি-সম্পদ বা গুণপনার কানাকড়ি দাম নেই, যদি তা' তার ও সেই সঙ্গে বৃহত্তর পরিবেশের সাত্বত সম্পোষণা না যোগায়। ইষ্টের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ও অসহযোগিতা যেখানে, অকৃতজ্ঞতা, অস্বীকৃতি ও উৎসবিমুখতা যেখানে, সেখানেই দানবীয়তা, আর দানবীয়তা আপন অন্তরেই তার নিধনবীজ বহন করে। দিব্যশক্তি সেখানেই শতধা উৎসারিত হ'য়ে ওঠে

যেখানে ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শোভন সমন্বয়ের স্বর্ণসূত্র অনির্ব্বাণ ঔজ্জ্বল্যে জাজ্জ্বল্যমান। প্রতিটি ব্যষ্টিকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলতে হবে ইষ্টের পথে, মঙ্গলের পথে, ধর্ম্মের পথে অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার পথে পরিবেশকে নিয়ে—সেবায়, সন্দীপনায়, সুনিয়ন্ত্রণী দায়িত্বে। আর, এই কেন্দ্রায়িত চলনের বুক চিরেই উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে সংহতি ও শক্তি।

বর্দ্ধনার মানদণ্ড

এই পটভূমিকা যেখানে রচিত হয়, সেখানেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন সম্যকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, আর, তাকেই বলে সম্বর্দ্ধনা। এই বর্দ্ধনা কিন্তু ভিতরে-বাইরে দুই দিকেই অভিব্যক্তি লাভ করে। বর্দ্ধনার মানদণ্ড হ'ল ব্রাহ্মণত্ব লাভ। নিষ্ঠানন্দিত ইষ্টানুচলনের ফলে মানুষ যখন প্রতিটি সত্তাকে নিজেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি ব'লে বোধ ক'রে, সবারই সত্তাসম্বর্দ্ধনী সেবায় নিয়োজিত থেকে ক্রমবর্দ্ধমানতার পথে এগিয়ে চলে সেই অবস্থাকে বলে ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞত্ব। এই চলন স্বভাব ও চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বতঃ হ'য়ে ওঠা চাই, যাতে মানুষ তার সংস্পর্শে এসে লহমায় বৃদ্ধিমুখী বৃহৎ প্রেরণায় সন্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এমনতর মানুষের কাছে এসেই মানুষ একটা মুক্তির আমেজ টের পায়। প্রবৃত্তির নিগড়ে বদ্ধ থেকে ইষ্ট ও পরিবেশের প্রতি বিমুখ হ'য়ে, আত্মকেন্দ্রিকতায় আমরা নিজেদের যে সঙ্কীর্ণতার জগতে নিমজ্জিত করি, তার জ্বালা আমাদের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ-বিদগ্ধ ক'রে তোলে। আমরা জ্বলে-পুড়ে মরি, কিছুতেই শান্তি পাই না। কারণ, ওটা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা মূলতঃ মহৎ ও বৃহৎ। সেই ভূমিতে সমাসীন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সোয়াস্তিও নেই, সার্থকতাও নেই। ব্রাহ্মণত্ব তাই আমাদের প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওখানে পৌঁছাতেই হবে আমাদের। নইলে নিস্তার নেই। জাগতিক সমস্যারও সমাধান হবার নয়, ঐ সুকেন্দ্রিক ব্যাপ্তি, বিস্তার ও প্রসারণশীলতার আশ্রয় ছাড়া। মায়ের স্নেহাঙ্কের মতই মানুষের পরম নিরাপদ আশ্রয় ঐ দৈবী জীবনচর্য্যার কোলে। ওতেই শান্তি, ওতেই তৃপ্তি।

ভগবানলাভ

অনেকে বৃদ্ধি বলতে বোঝেন, ভগবান লাভ। ভগবানলাভের মধ্যে আছে ভজমানতাকে অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবাশীলতাকে চরিত্রগত করা। তাও আবার

হওয়া চাই ইষ্টার্থে। যে-পরিভাষাতেই আমরা বলি না কেন, বৰ্দ্ধনার মধ্যেই আছে ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের মধ্যে সক্রিয় সংহতি সাধন। ইষ্ট ও পরিবেশের সঙ্গে বিহিত সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত হওয়া চাই এবং বাস্তব চলনে তার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠা চাই। এইটিই বৃদ্ধির মেরুদণ্ড।

বৰ্দ্ধনার বহিরঙ্গ প্রকাশ

জীবন-চলনার ক্ষেত্রে শুধু আন্তর বৰ্দ্ধনা হ'লেই হবে না, বৰ্দ্ধনার বহিরঙ্গ প্রকাশও চাই ষোল আনা। সপরিবেশ বাঁচতে-বাড়তে যা'-যা' লাগে, তার সবদিকেরই সুসমঞ্জস বিকাশ সাধন করতে হবে আমাদের। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই গ'ড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি; রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি জীবনের প্রয়োজনীয় সব দিককেই সাত্বত ছন্দে সমুন্নত ও সমন্বিত ক'রে তুলতে হবে, যাতে মানুষের বাঁচা-বাড়ার পথ অবাধ ও উন্মুক্ত হ'য়ে ওঠে। আমরা চাই মৃত্যুকে অবলুপ্ত ক'রে অমৃতের অধিকারী হ'তে। তাই অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, অযোগ্যতা, বিভেদ, বিরোধ, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, অসাধুতা, দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে জীবনের পরিপন্থী যা' তাকে মিস্‌মার ক'রে দিতে হবে। আর, সঙ্গে-সঙ্গে উৎসাহিত করতে হবে সেই সব প্রচেষ্টাকে, যাতে মানুষের জীবনবৃদ্ধি চির-অভ্যুদয়শীল হ'য়ে ওঠে।

সুসঙ্গত বিকাশ

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে জীবনে সৰ্ব্বতোমুখী কৃতকার্য্যতা ও উন্নতি লাভই আমাদের কাম্য। বাস্তব জীবনে অসঙ্গতি, খাঁকতি ও গোঁজামিল থাকবে যেখানে যতটুকু, তাই-ই আমাদের সাম্যহারা, স্বস্তিহারা ও বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলবে সেই পরিমাণে। চারিত্রিক বিন্যাসও ব্যাহত হবে সেই মাত্রায়। ফলকথা, ভিতরে-বাইরে সৰ্ব্বতোভাবে পূর্ণতা অর্জ্জনের সাধনা করতে হবে প্রতি পদক্ষেপে তিল-তিল করে বিধিবদ্ধ প্রণালীতে। চলা, বলা, করা ও ভাবার মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি ও সমতানতা আনতে হবে। একদিককে উপেক্ষা ক'রে একপেশে হ'য়ে আর একদিকে ঝুঁকে পড়লে হবে না। তাতে সামগ্রিক সামঞ্জস্য ব্যাহত হবে, প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এক কথায় নিখুঁত ও সুন্দর হ'তে হবে আমাদের সবদিক

দিয়ে নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে। তবেই আমরা মানবজীবনের মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারব ষোলকলায়। আর, এর জন্য চাই অতীতের সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বর্ত্তমানকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ক'রে উন্নততর ভবিষ্যৎকে সংসৃজন ক'রে চলা। এর মাধ্যমেই প্রতিটি ব্যক্তির সর্ব্বোত্তম বিকাশের পটভূমিকা রচিত হ'য়ে ওঠে।

সাধনার ক্রমাগতি

মানুষের সাধনা ও সিদ্ধির ক্রমাগতি যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহ'লে বিবর্ত্তন সুদূরপরাহত হ'য়ে ওঠে। এই বিবর্ত্তনকে অব্যাহত রাখার জন্য যুগপৎ দু'টি জিনিস দরকার। তার একটি হ'ল তপস্যা। শিক্ষা, জ্ঞান, গবেষণা, উন্নয়নমূলক প্রতিটি অনুশীলন ও প্রচেষ্টাই তপস্যার অঙ্গ। আর একটি হ'ল সুজনন। এ-সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করব। তবে এখানে শুধু এইটুকু ব'লে রাখা ভাল যে বৃদ্ধিমূলক সব প্রয়াসই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, যদি তার সঙ্গে সুবিবাহ ও সুজননের ব্যবস্থা না থাকে। কারণ, মানুষই মূল কথা। আর, মানুষেরও মূলভিত্তি হ'ল তার জন্মগত জৈবী সম্পদ। সেই পুঁজির উপর দাঁড়িয়েই চলে তার জীবনের কারবার। তাই, এই প্রাথমিক বুনিয়াদ ঠিক করার ব্যবস্থা যদি না হয়, তবে সম্বর্দ্ধনার পরিকল্পনা আকাশ-কুসুম মাত্র।

বর্দ্ধনার মূল রহস্য

আরো একটা কথা এখানে পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। ভিতরে-বাহিরে জীবনের অনন্ত দিক। এই বিচিত্র ধারাকে একসূত্রসঙ্গতিতে বিধৃত ক'রে—যদি অখণ্ড একীকরণে পর্য্যবসিত করা না যায়, তাহ'লে কিন্তু তালগোলের মধ্যে প'ড়ে যেতে হয়। চলা, বলা, ভাবা, করার পর্য্যায়, ক্রম, মাত্রা, সঙ্গতি, রীতি, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাল করতে গিয়ে মন্দ হয়ে বসে। বৃদ্ধির বদলে বিধ্বস্তিও এসে যেতে পারে। এই বিপদ এড়াতে গেলে প্রতিপদক্ষেপে চাই সচেতন ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপরায়ণতা, তবেই বিভ্রান্তি এড়িয়ে চলা যায়। তখন যা'-কিছুই হ'য়ে ওঠে জীবনবৃদ্ধির পরিপূরক। আর, তখন মানুষের ব্যক্তিত্বও নানাবিধ প্রবৃত্তি ও কামকামনার শায়কবিদ্ধ হ'য়ে শতধা খণ্ড-বিখণ্ড হ'তে পারে না। সে হয় একটা গোটা মানুষ, আস্ত মানুষ, যার ষোল আনা ভগবৎসেবায়

নিয়োজিত। এই অভঙ্গ যোগের ভিতর-দিয়েই সে এমন একটি আধার হ'য়ে ওঠে, যার ভিতর ভগবৎ-শক্তি ও ভগবদিচ্ছা অবাধে ক্রিয়া করতে পারে। তখন তাকে দিয়ে তার ও অন্যের ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। বৃদ্ধি ছাড়া ক্ষতি হয় না। এই তো সম্বর্দ্ধনার পরাকাষ্ঠা। সে তখন হ'য়ে ওঠে প্রতিটি মানুষের মহাবান্ধবস্বরূপ। তাকে দেখাও পুণ্য। এমনতর ভক্তকে দিয়েই বসুন্ধরা ধন্য হয়, দুনিয়া স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়।

অন্তর্মুখী প্রণিধান

'শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা' এই কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বে উল্লিখিত কথার সূত্র ধ'রে বলছেন 'আর ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান'। ধৃতি বা অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। তারই আর-একটা দিকের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে আলোকপাত করেছেন। মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করা। এই কারণমুখীনতা ও উৎসমুখীনতা নিয়ে যায় তাকে জ্ঞানের দ্বারে। স্বভাবতঃই সে তখন হয় অন্তর্মুখী ও ধ্যানপরায়ণ। নিজ অস্তিত্বের ভিত্তি কী, কিসের থেকে তার উৎপত্তি, কী তার গতি, কী তার গন্তব্য, কী তার স্বরূপ, কী তার সাধনা, কী তার জীবনের উদ্দেশ্য, মানবমনের এইসব চিরন্তন প্রশ্ন তাকে ভাবিত ক'রে তোলে। সে তখন একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে ঐসব প্রশ্নের সমাধান পাবার জন্য। এই প্রচেষ্টাকেই বলে প্রণিধান। মন তখন ঐ রাজ্যেই বিচরণ করে। তবে এ কথা বলা বাহুল্য যে, সমাধান যদি পেতে হয় তবে সমাহিত পুরুষে সক্রিয়ভাবে সমাহিত হতে হবে। ইষ্ট হলেন অখণ্ড জ্ঞান ও প্রেমঘন সমাধানমূর্ত্তি। তাঁর স্মরণ, মনন, ধ্যানধারণা, তদনুগ আত্মবিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর ভরণ-পূরণ-পোষণ-প্রতিষ্ঠা ও প্রীতিকর্ম্মে যে যত বিভোর ও তন্ময় হ'তে পারবে, সেই তত জীবনজিজ্ঞাসার সমাধান লাভে সমর্থ হবে। এক কথায়, নিজেকে ইষ্টের কাছে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে তাঁতেই থাকতে হবে নিরন্তর, তাঁকেই স্থাপন করতে হবে জীবনের মর্ম্মমূলে চিরন্তনকালের জন্য। প্রণিধানের মধ্যে আছে এতখানি।

সমাধি

প্রণিধান যত গভীর হয়, তাঁর সম্বন্ধে উপলব্ধিও তত গভীর হ'য়ে ওঠে।

তখন তিনিই যেন সত্তাকে অধিকার ক'রে বসেন ও চালিয়ে নিয়ে বেড়ান। এমনি ক'রেই ক্রমপদক্ষেপে আসে সমাধি। সমাধি মানে সমীচীনতার সহিত সর্ব্বতোভাবে ধারণ করা। আমাদের জীবন যখন সব সময়ের জন্য সবরকমে অস্খলিতভাবে ইষ্ট-বিধৃত হ'য়ে চলে অর্থাৎ ইষ্টকে ধারণ ক'রে চলে, তখন সেই অবস্থাকেই বলা যায়—চেতন ও সক্রিয় সমাধি। সমাধি মানে সমগ্র সত্তা দিয়ে ইষ্টকে সম্যকভাবে ধারণ, বহন, মনন, প্রীণন ও পোষণ ক'রে চলা। তিনি স্বয়ং সমাধানস্বরূপ। তাঁ'তে মানুষ যখন নিরবচ্ছিন্ন সমাহিতি লাভ করে, তখন তাঁর সঙ্গে মনপ্রাণের যোগ ও সমসূত্রতার ফলে তার অন্তরেও জেগে ওঠে অমেয় প্রজ্ঞালোক। সে তখন ছিন্ন-সংশয় হ'য়ে ওঠে। ইষ্টের সঙ্গে তার নিজের ও জগতের প্রত্যেকের কী সম্পর্ক, এবং প্রত্যেকের সঙ্গেও প্রতিটি-যা'-কিছুর সঙ্গে তার নিজের কী সম্বন্ধ—সবটার সুসমন্বিত বোধ তার অন্তরে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে। তখন সে কার্য্যকারণসহ, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ সহকারে বোধ করতে পারে ঐক্যের মধ্যে কেমনভাবে বৈচিত্র্য থাকে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে কেমনভাবে ঐক্য থাকে। একটা যে আর-একটাকে ছেড়ে নয়, এটা বৈজ্ঞানিক মরকোচসহ তার কাছে প্রত্যক্ষীভূত হয়। তাই, পারস্পরিক সঙ্গতিসহকারে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের পথে প্রত্যেকের চরম বিবৃদ্ধি কেমন ক'রে হ'তে পারে—তার গোপন রহস্যও তার কাছে উন্মুক্ত হ'য়ে যায়। জীবন ও জগতের কোন প্রশ্ন বা কোন সমস্যাই তার কাছে অব্যাখ্যাত, অমীমাংসিত ও সমাধানহারা হ'য়ে থাকে না। কার্য্যকারণসহ সবকিছুর মূল মরকোচ তার ধারণায় সম্যক উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আর, এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের জ্ঞান বাদ দিয়ে যে লেপাপোছা একত্বের জ্ঞান তা' কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে মানুষ ধরতে পারে বহুর প্রত্যেকের মধ্যে সেই পরম এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় কেবল পুরুষ যিনি—তিনি কোথায় কার ভিতরে কিভাবে আছেন।

কৈবল্য

তখন আসে কৈবল্য অর্থাৎ কেবলতা। এক ছাড়া দুই থাকে না জীবনে। 'যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র ইষ্ট স্ফুরে।' ইষ্টই সর্ব্বময় ও সর্ব্বস্বরূপ হ'য়ে ওঠেন তার কাছে। মানুষ তাঁতেই নৈরন্তর্য্য লাভ করে, দৃঢ়ভূমি হয়, অচলপ্রতিষ্ঠ হয়। জগৎ ও জীবন যেন তাঁতেই ভরা, তাঁতেই ঠাসা। তিনিই সব, তাঁর জন্যই সব।

যা' তাঁর সেবায় লাগে না, তার কোন আকর্ষণ থাকে না তার কাছে। তাঁর প্রেমেই সক্রিয়ভাবে মগ্ন হ'য়ে ওঠে মানুষ। মত্ত হ'য়ে ওঠে—নিঃসর্ত্তে ও নিঃস্বার্থভাবে। তিনি তাকে ভালবাসুন বা না-বাসুন, সেদিকে তার কোন খেয়াল থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের লাখ ভালবাসা পেয়েও মানুষের কোন কল্যাণ হয় না, মানুষ যদি নিজের তরফ থেকে নিষ্কাম সক্রিয়তায় তাঁকে ভাল না বাসে। ভক্তের তাঁকে না হ'লেই নয়। তাই, সে তাঁরই সেবায়, তাঁরই ভজনে, পূজনে, যাজনে প্রাণমন ঢেলে দেয়, মাতোয়ারা মসগুল হ'য়ে ওঠে। অন্তরে একমাত্র সাধ জেগে থাকে তার তাঁকে সুখী ক'রে সুখী হওয়ার, তাঁর উপভোগ্য হ'য়ে উঠে জীবনটাকে উপভোগ করার। একেই বলে মুক্তি ও প্রেম। কোন বাধা, বন্ধন বা বিদ্বেষ তাকে তিলেকের জন্যও ইষ্ট থেকে বিযুক্ত বা বিচ্যুত ক'রে রাখতে পারে না। ভগবানের নিঃসর্ত্ত আত্মদানের ভিতর-দিয়েই মানুষের সৃষ্টি, আর রক্তমাংসসঙ্কুল শ্রীভগবানের চরণে স্বতঃস্বেচ্ছ আত্মোৎসর্গের ভিতর-দিয়েই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। জীবনের সব যন্ত্রণা, সব বেদনা, সব ক্ষয়ক্ষতি, সব ব্যর্থতা সফল হয়, যদি মানুষ তার জীবনের অন্তর্নিহিত এই পরম তাৎপর্য্যটি উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে, একমাত্র তিনিই আছেন। সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের ভিতর-দিয়ে নিরন্তর তাঁরই লীলা উৎসারিত হ'য়ে চলেছে। তাই, এক ও অদ্বিতীয় যিনি তাঁ'তে সক্রিয় তন্ময়তা নিয়েই ভক্তের জীবন অতিবাহিত হয়। ভিতরে-বাইরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সব বৈচিত্র্যের ভিতর সে ক্রমাগত একমাত্র পরমপিতাকে প্রত্যক্ষ ক'রেই জীবন সার্থক করে। কৈবল্যের মধ্যে আছে এই নিনড়, নিশ্ছিদ্র, একনৈষ্ঠিক, একাগ্র নিত্য যোগযুক্ততা।

ইষ্ট যখন এইভাবে জীবনসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠেন, তিনি ছাড়া যখন আর সব কিছু জলো-জলো ও আলুনি লাগে, তাঁর জন্য যা' নয় তা' শত মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হ'লেও যখন মনকে মুগ্ধ করতে পারে না বরং যন্ত্রণাদায়ক ব'লে মনে হয়, তখনই হয় প্রবৃত্তিতৃষ্ণাদির নির্ব্বাণ। প্রবৃত্তিতৃষ্ণাই জীবকুলকে জন্মজন্মান্তর ধ'রে দগ্ধে মারে। তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সুকঠিন। সে যেন ভূতের মত মানুষকে পেয়ে ব'সে চাবুক মেরে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। মানুষকে ভ্রান্ত করে, অবসন্ন করে, কাঙ্গাল করে, লেলিহান করে। কিন্তু দেয় না কিছু জীবনের রসদ। বরং সত্তাকেই শীর্ণ ক'রে মারে। কামনার কেনা গোলাম যে তার তিলমাত্র স্বাধীনতা থাকে না। এই মহামোহের কবল থেকে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। প্রবৃত্তি-

প্রসূত একটা চাহিদার পূরণ হ'তে না হ'তেই আর কত চাহিদা যে মাথা তোলা দেয়, তার ইয়ত্তা নেই। তাই মনুসংহিতায় আছে—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে।'

কামভোগদ্বারা কখনও কামের নিবৃত্তি হয় না। বরং অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি সংযোগে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়, কাম-কামনাও তেমনি ভোগের দ্বারা আরও প্রবল হয়।

তৃষ্ণার নির্ব্বাণ

এই যে অন্তহীন তৃষ্ণা—তাই জানিয়ে দেয় যে মানুষ স্বরূপতঃ অনন্ত। তাই অনন্তের অভিসারেই তাকে চলতে হবে। কিন্তু সে তার স্বরূপ-সম্বন্ধে সচেতন নয় ব'লে প্রবৃত্তির ঘোরে কত দুর্ভোগেরই না সৃষ্টি করে। তাই, অনন্তের সচেতন সান্ত বিগ্রহ যিনি, তাঁর উপরই আমাদের অন্তহীন লোভ ও টান গজিয়ে তুলতে হবে, অনন্য-নিষ্ঠ হ'য়ে চাইতে হবে একমাত্র তাঁকেই। তবেই আমরা অজ্ঞতাপ্রসূত অনন্ত তৃষ্ণার হাত থেকে ত্রাণ পাব। মোটপর, ইষ্টকে নিয়ে নিঃশেষে ভরপুর হ'তে না পারলে কামনা-বাসনার সঙ্গে লড়াই ক'রে কিন্তু জেতা যাবে না। ইষ্টসর্ব্বস্ব হয়ে, ইষ্টৈকলক্ষ্য হ'য়ে যা'-কিছুকে তাঁর দিকেই মোড় ফেরাতে হবে, তাঁর পূজার নৈবেদ্য ক'রে তুলতে হবে। তবেই যাবে বাসনার দাসত্ব। ভগবান যত কাম্য হবেন, ততই অনর্থকর কামনার নিরসন হবে।

মহাজাগরণ

তখন আমাদের বুলি হবে—'তোমার ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।' জীবনটা তখন হবে তাঁরই লীলাভূমি। প্রবৃত্তিতৃষ্ণার নির্ব্বাণ হওয়ায় আমরা নিভে যাব না। বরং জীবন্মুক্তির ভিতর-দিয়ে তখনই হবে আমাদের জীবন সুরু। আমরা চৈতন্য-সমন্বিত মহাজীবনে জেগে উঠব। সে জীবন হ'ল যোগযুক্ত ভাগবত জীবন, কর্ম্মময় সর্ব্বার্থসার্থক শাশ্বত, সাত্বত দিব্যজীবন, যা' নিয়ত বিশ্ব-মঙ্গলযজ্ঞে নিয়োজিত। তখন আমিত্ব ও মমত্ব ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। ইষ্টকেই নিজের ও সবার প্রাণের প্রাণ, জীবনাধার ও সারাৎসার জেনে ত্রিভুবনের সকলকে আপন ব'লে বরণ ক'রে নেবে। সে জানবে 'মদাত্মা

সর্ব্বভূতাত্মা'। তাই, সর্ব্বভূতের হিতসাধনই হবে তার অতন্দ্র তপস্যা। মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ লাভের তাৎপর্য্য এতেই। একেই শ্রীশ্রীঠাকুর মহাচেতনসমুত্থান ব'লে বর্ণনা করেছেন।

জীবনের ধারা

জীবনের উদ্দেশ্য

প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের চলার পথ ও গন্তব্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চায়। এই ধারণা যদি বিহিত, বিশদ ও স্বচ্ছ না হয়, তাহ'লে তার চলাটা হয় এলোমেলো। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার দরুন তার অনেক শক্তির অপচয় হয়। অনেক সময় ভুলের দিকে ও বিকৃতির দিকে এতখানি অগ্রগতি হয়, যে তার প্রতিকারই দুরূহ হ'য়ে ওঠে। মানুষ যাতে এদিক দিয়ে অসুবিধায় না পড়ে সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্ট ক'রে বলেছেন—

"আমাদের গন্তব্য হ'ল—ঈশ্বরপ্রাপ্তি—
ধারণ-পালন-সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব,
তার উপায় হ'চ্ছে আচার্য্যে সক্রিয় অনুরতি,
তার থেকে আসে—আত্মনিয়ন্ত্রণ,
পরিবার-নিয়ন্ত্রণ, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ;
আর, এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সারাবিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা ক'রে
সবটা নিয়ে বিবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলা,
আর, এই সবগুলিকে সার্থক ক'রে তোলা—ঈশ্বরে;
আর, প্রাপ্তির পরম বেদনা এই-ই।"

জীবন-রহস্য

আমাদের জীবনের উৎসও ঈশ্বর, চলার পথও ঈশ্বর এবং গন্তব্যও ঈশ্বর। ঈশ্বরের মধ্যে আছে আধিপত্য। আধিপত্যের মধ্যে আছে ধারণ-পালন-সম্বেগ-সিদ্ধতা। আমাদের সত্তা ঈশ্বরেরই অবদান। আমরা আমাদের স্রষ্টা নই। স্রষ্টা তিনিই। এবং সৃষ্টির পিছনে তাঁর একটা গূঢ় অভিপ্রায় আছে। তাঁর সম্পদ নিয়েই আমরা আছি, থাকি ও চলি। তিনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে দিয়েছেন। এই

স্বাধীন ইচ্ছা আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, তার উপরই নির্ভর করে আমাদের জীবনের বিবর্ত্তন বা অপবর্ত্তন। আমরা ইচ্ছা করলে তাঁর পথেও চলতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে তাঁরই দেওয়া শক্তি নিয়ে বিপথেও চলতে পারি। বিপথে চলা মানে খেয়ালখুশিমত প্রবৃত্তির পথে চ'লে সত্তাকে ক্ষয় করা। কিন্তু সত্তা চায় বাঁচতে, বাড়তে। তার সে-আকৃতি ব্যাহত হয় যদি আমরা উৎসবিমুখ চলনে চলি।

"ভ্রান্তি এলো সেই—
উৎসবিমুখ চলন-বলন
বসলো পেয়ে যেই।"

উৎসবিমুখ হ'লেই আমরা ভ্রান্তির কবলে প'ড়ে যাই। তখনই আসে অজ্ঞতা, বিস্মৃতি ও চেতনাহীনতা।

মানুষের স্বরূপ

মূলতঃ আমরা নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সচেতন অস্তিবৃদ্ধিই আমাদের মৌল স্বভাবধর্ম্ম। কিন্তু স্বেচ্ছায় আমরা উৎস-বিমুখ ও বহির্ম্মুখী হ'য়ে সূক্ষ্ম ও স্থূল নানাপ্রকার আবরণে নিজেদের আবৃত ক'রে স্বরূপের স্মৃতি ও চেতনা হারিয়ে ফেলেছি। চলার পথে জন্মজন্মান্তর ধ'রে এমন কতকগুলি অভ্যাস ও সংস্কার অর্জ্জন করেছি যা' অস্তিত্বপোষণী ধারণ-পালন-সম্বেগের পরিপন্থী। এই বিজাতীয় অভ্যাস, বোধনা ও সংস্কারের হাত থেকে রেহাই পেতে গেলে আমাদের উৎসমুখী অর্থাৎ ঈশ্বরমুখী হ'তে হবে। তার ভিতর দিয়েই ধীরে-ধীরে জাগবে স্বরূপের চেতনা। আমরা আমাদের হারিয়ে ফেলা ঈশ্বরীয় স্বভাব তখন আবার ফিরে পাব। ঈশ্বরলাভ মানে ঈশ্বরীয় চরিত্রলাভ। 'God created man after His own image. (ঈশ্বর নিজের প্রতিকৃতি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন)। মানুষ যদি তার এই মূল পরিচয় জানতে না পারে, তার মূল স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে, তাহ'লে সে যত যাই করুক তা' ভূতের বেগার খাটায় পর্য্যবসিত হয় মাত্র। সে দিন-দিন আরোতর তামস বদ্ধদশায় নিমজ্জিত করে নিজেকে।

আত্মানং বিদ্ধি

সেইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে—'নিজেকে জান', 'আত্মানং বিদ্ধি', 'know thyself. নিজেকে জানা মানে নিজত্বে স্থিতিলাভ করা। আমাদের শাশ্বত নিজত্ব বলতে যদি কিছু থাকে তার অধিষ্ঠান ঈশ্বরে। তিনিই আমাদের জীবনের উদ্গময়ক। তা' থেকেই উৎসৃষ্ট আমরা। সৃজন-সূত্রে তাঁরই স্বভাবের উত্তরাধিকারী আমরা। তিনিই ধারণ-পালনী ধাতা-পাতা। এককথায়, আমাদের অস্তিত্বের ষোল আনা মালিক ঈশ্বর। তাঁরই পূর্ণ স্বত্ব-স্বামিত্ব আমাদের উপর। আমরা বিলকুল তাঁরই। এইটেই হ'ল বাস্তব সত্য। অহং নামে যে মিথ্যা দাবীদার জীবনের উপর ঈশ্বরের এই একচ্ছত্র অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে, তাঁকে উৎখাত ক'রে নিজে প্রভু হ'য়ে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যথেচ্ছভাবে চলতে চায়, তার অধীনতাই পরাধীনতা, মিথ্যাচার, অকৃতজ্ঞতা, অজ্ঞতা ও শয়তানী। আর, ঈশ্বরকে যথাসর্ব্বস্বের মালিক জেনে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সর্ব্বতোভাবে তাঁর অধীনতা স্বীকার ক'রে প্রতিপ্রত্যেককে ধারণ ও পালন করার সক্রিয় দায়িত্ব বহন ক'রে চলাই একাধারে ভক্তি, আত্মজ্ঞান, মুক্তি ও আনন্দ। তাই-ই জীবনের পরমপুরুষার্থ। তাই, ঈশ্বরে আত্মনিবেদন ক'রে, ঈশ্বরসর্ব্বস্ব হ'য়ে, ঈশ্বরের পথে, ঈশ্বরের জন্য, একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলাই যদি আমাদের জীবনব্রত হয়, তবেই বুঝতে হবে আমরা সৃষ্টির মূলমর্ম্ম ও অন্তরতম সুরটি ধরতে পেরেছি। শোনা যায়, ঈশ্বর নাকি নিজেকে নিজে উপলব্ধি ও উপভোগ করবার জন্য নিজেকে বহুতে উৎসৃষ্ট করেছেন। তাই, অহৈতুক ভক্তিতে, অস্খলিত নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগে যদি আমরা নিজেদের নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিতে পারি তাঁর চরণে—সক্রিয় অনুসরণে ও সেবায়, তখনই আত্মিক উপলব্ধি ও উপভোগের চরম হয় আমাদের জীবনে। আত্মিকতা মানে নিরন্তর গতিশীলতা।

প্রেম

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা, তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা, ধরে প্রেম নাম।"

এই প্রেমই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য। তখন সমগ্র অস্তিত্ব সচেতনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তাঁতেই। তিনিই হ'য়ে ওঠেন অহং-এর কেন্দ্র ও ভূমি। তাঁর

প্রীতির জন্য ছাড়া মানুষ তখন একটা নিঃশ্বাসও ফেলে না। মানুষ যখন এইভাবে ঈশ্বরগতপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, সে তখন ঈশ্বরেরই যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে তাঁরই ইচ্ছা পূরণ ক'রে চলে, অর্থাৎ প্রতিটি সত্তার ধারণ-পালনে অতন্দ্র কর্ম্মমুখর হ'য়ে ওঠে। এর মধ্যে ক্ষুদ্রস্বার্থ, অহমিকা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার বালাই থাকে না। আর, মানুষ যখন এমনতরভাবে মালিন্যমুক্ত, রিক্ত, শূন্য ও পবিত্র হয়, তখন ঈশ্বরের অফুরন্ত শক্তি লোক-কল্যাণে লীলায়িত হ'য়ে ওঠে তার মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্য ও আধার অনুযায়ী। বলা বাহুল্য, এমনতর কল্যাণ-কল্পতরু যে তার নিজের উচ্ছলতাও বাদ পড়ে না। মানুষ এইভাবেই নিষ্কাম ঈশ্বরপ্রেমের ভিতর-দিয়েই সপরিবেশ পূর্ণকাম হ'য়ে ওঠে। তাহ'লেই বোঝা যাচ্ছে যে, বাস্তবজীবনে মানুষের ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কত গভীর ও অকাট্য।

যুগপুরুষোত্তমের অনুসরণ

তার জন্য প্রয়োজন ধারণ-পালনী সম্বেগের মূর্ত্ত বিগ্রহে নিষ্ঠানন্দিত অনুরাগ। কারণ, অমূর্ত্ত ধারণ-পালনী সম্বেগকে আমরা ভালভাবে বোধের মধ্যেই আনতে পারি না। তাই, সেখানে বাস্তব ভালবাসার সম্পর্কও গ'ড়ে ওঠে না। ধারণ-পালনী সম্বেগের মূর্ত্ত বিগ্রহকে অবতার, পুরুষোত্তম, প্রেরিত পুরুষ, আদর্শ, আচার্য্য, ইষ্ট ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হ'য়ে থাকে। অধুনাতম (latest) অবতার-পুরুষই আমাদের উপাস্য। তিনি যদি জীবন্ত হন, তাহ'লে তো কথাই নেই। তাঁকেই বলা যায় ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি। তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন অবতার-পুরুষগণও জীয়ন্ত থাকেন। তাঁকে অনুসরণ করলে সবাইকেই অনুসরণ করা হয়। পূর্ব্বতন কোন অবতারপুরুষকে অনুসরণ করতে গেলে তাঁর মাধ্যমে করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, বর্ত্তমান অবতার যিনি, তিনি পূর্ব্বতনেরই নবকলেবর। তাঁর মধ্যে তাঁদের প্রত্যেককেই আরো ভাল ক'রে পাওয়া যায়, আরো ক'রে পাওয়া যায়। কারণ, যুগপুরুষোত্তমের মধ্যে পূর্ব্বের প্রত্যেককে তো পাওয়াই যায়, আরো পাওয়া যায় তাঁদের যুগোপযোগী পরিপূরণ। তিনি হলেন বিবর্ত্তনের মন্থনধন। চরমবিকাশ যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে তাঁকে ধরাই চাই। তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্রবে, তাঁর প্রতিটি আচরণ ও অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ভজমানতা অর্থাৎ সেবাপ্রাণতা ও ধারণ-পালনী সম্বেগের বাস্তব ও স্থূল দ্যোতনা অনুভব করতে পারি। তাঁর প্রতি প্রত্যাশারহিত অকপট অনুরাগ

থাকলে ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে আলোড়িত ক'রে আমাদিগকেও তদনুগ আচরণে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। আমাদের বোধও যে সূক্ষ্মতর সমৃদ্ধতর হ'য়ে ওঠে, সে-বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই।

চরম বিবর্ত্তনের পথ

প্রকৃত প্রস্তাবে, ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ একবার্ত্তাবাহী। আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তমে অস্খলিত নিষ্ঠানন্দিত সক্রিয় অনুরাগই আত্মবিকাশের মূল মেরুদণ্ড। তিনি হলেন তত্ত্বমূর্ত্তি। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা চরমতত্ত্বে পৌঁছাতে পারি না। তাঁকে না ধরলে ঈশ্বর বা বিগত কোন অবতারপুরুষকে আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না। প্রত্যেকের জীবনেই তিনি অপরিহার্য্য। জলছাড়া হ'য়ে মাছ যেমন সুস্থ, স্বস্থ, স্বচ্ছন্দ, সার্থক ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না, জীবনপ্রবাহের উৎস-স্বরূপ এই যুগ-পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়েও আমরা তেমনি অব্যাহত, অফুরন্ত, সার্থক, সুসম্পূর্ণ সাত্বত-জীবনের অধিকারী হ'তে পারি না। জীবন সলীলস্রোতা হ'য়ে ওঠে তখনই যখন আমরা তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত থাকি। এই যোগহারা হ'লেই ক্রমে-ক্রমে আমরা বিশুষ্ক, বিশীর্ণ ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। মানব-জীবনের পরমতম প্রাপ্তি যা' তা' আমাদের অধিগত হয় না। আমাদের বিকাশের সম্ভাব্যতার তুলনায় অনেক নিম্নতর স্তরেই আমাদের সাধনা খতম হ'য়ে যায়।

প্রেরিতপুরুষগণ এক

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অবতার বা প্রেরিতপুরুষগণ বাঁচা-বাড়ার বিজ্ঞানকেই প্রকট করেন। তাঁদের মধ্যে মৌলিক ও সার্ব্বজনীন সত্য ও নীতি সম্বন্ধে কোন প্রভেদ নেই। দেশ-কাল ও পাত্রানুযায়ী যে বিশেষ নির্দ্দেশগুলি তাঁরা দেন, তার মধ্যে বাহ্যতঃ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হ'লেও, প্রত্যেকটিই সাত্বতসূত্রে গ্রথিত। তাই, প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে পার্থক্য করা কিছুতেই ঠিক নয়। আমরা যদি তাঁদের একজনকে মানি, আর একজনকে না মানি, কিংবা যদি পূর্ব্বতন প্রত্যেককে মানি কিন্তু বর্ত্তমান প্রেরিতকে না মানি, অথবা যদি বর্ত্তমানকে মানি, অথচ পূর্ব্বতনদের না মানি, তাহ'লে সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট হব ও ধর্ম্মচ্যুত হব। অবতারপারম্পর্য্য যেমন মানা চাই, প্রত্যেকটি মানুষের বংশপারম্পর্য্যও তেমনি মানা চাই। ধর্ম্ম

আচরণ করতে যেয়ে পিতৃপুরুষ ও সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে অস্বীকার করা এক পরম অধর্ম্মাচরণবিশেষ। ধর্ম্মের অভিন্নতা ও বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে যদি আমাদের প্রকৃত বোধ গজায়, তাহ'লে লাখ সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও আমরা সারা পৃথিবীর লোক যুগপুরুষোত্তমকে কেন্দ্র ক'রে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারি। পূর্ব্বেই বলেছি, শ্রীশ্রীঠাকুর এই পরমসত্যগুলিকে চুম্বকে ব্যক্ত করেছেন—

"ধর্ম্মে সবাই বাঁচে বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম না রে।"
"ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম্ম জানিস্ একই হয়।"
"পূর্ব্বতনে মানে না যারা
জানিস্ নিছক ম্লেচ্ছ তারা।"
"প্রেরিত যে প্রভেদ করে
অন্ধতমোয় সাবাড় করে।"
"না ধরে প্রেরিতে বর্ত্তমান
অন্ধতমোয় হয় প্রয়াণ।"

ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ

তাই রক্তমাংসসঙ্কুল পুরুষোত্তমকে পেলে তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে নেই। তাঁকে পাওয়া মহাভাগ্যের কথা। তাঁকে সামনে পেলেও সংস্কারবশে যারা তাঁকে ধরতে না পারে, তারা সত্যই হতভাগ্য। জীবনের মূল উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ তা' থেকে তারা অনেক দূরে স'রে থাকে। মনগড়া রকমে তারা যতই সাধনা করুক না কেন, সেই বিধিবহির্ভূত সাধনা কখনও বিহিত ফল প্রসব করতে পারে না। বিধিবহির্ভূত এই জন্য বলছি যে, পুরুষোত্তম যখন আসেন তখন তিনিই গ্রহণীয়, তিনিই অনুসরণীয়, কারণ তিনিই ঈশ্বর তথা পূর্ব্বতনদের জীয়ন্ত বেদী ও মানবসমাজের তৎকালীন বিবর্ত্তনী কেন্দ্রকীলক। তাঁকে উপেক্ষা করলে ঈশ্বর তথা পূর্ব্বতন প্রেরিতপুরুষদেরও উপেক্ষা করা হয়। উপেক্ষা করা হয় সব দেব-দেবীকে। দেবতা হলেন তিনি, যিনি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্য্যে উদ্দীপ্ত ক'রে প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান। যুগপুরুষোত্তমের প্রতি বিমুখ হ'য়ে

আপন খুশিমত অন্য সাধনায় রত থাকা বঞ্চিত হওয়ারই পথ। অবশ্য, সিদ্ধগুরুর নির্দ্দেশ-অনুযায়ী নিষ্ঠাসহকারে সাধনা করলে তার ফল ফলেই। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, পরমগুরুর আগমনে সব গুরুর গুরুত্ব ব'র্ত্তে তাঁতে। ভগবানই লব্ধব্য, তাই তিনি স্বয়ং যখন নরদেহে আবির্ভূত হন, তখন তিনিই ভজনীয়। পূর্ব্বের অন্য গুরু গ্রহণ করলেও তাঁকে গ্রহণ করায় গুরুত্যাগ হয় না। তাতে পূর্ব্বের দীক্ষা পূর্ণতর সার্থকতাই লাভ করে। বরং তাঁকে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে গ্রহণ না করলে গুরুত্যাগ হয়। তাছাড়া সাধনা ও সিদ্ধির বিভিন্ন স্তর আছে। সম্ভাব্য চরমস্তরে পৌঁছাতে গেলে চাই যুগপুরুষোত্তমে অকাট্য আনতি। তাতেই পরমপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়। পুরুষোত্তমকে তত্ত্বতঃ জানাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আবার, যুগপুরুষোত্তম যদি স্বদেহে বর্ত্তমান না থাকেন, তিনি যদি বিগত হন, তবু তাঁর পথে চলাই আমাদের পরম কর্ত্তব্য। আর, তন্মুখী হ'য়ে চলার প্রেরণা আমরা পেতে পারি তাঁতে অচ্যুত বৃত্তিভেদী অনুরাগসম্পন্ন তন্নিষ্ঠ ভক্তের মাধ্যমে। তাঁর সন্ততিধারার মধ্যে এমনতর ভক্ত পাওয়া গেলে খুবই ভাল হয়। ফলকথা, তাঁতে বৃত্তিভেদী-টানসম্পন্ন ভক্ত-পরম্পরার ভিতর-দিয়েই তিনি জগতে সঞ্জীবিত থাকেন। তাছাড়া থাকে তাঁর দেওয়া নাম ও সাধন-পদ্ধতি, তাঁর প্রতিকৃতি, তাঁর জীবনেতিহাস ও বাণী, তাঁর পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এগুলিই হয় মানুষের পরম পথের পাথেয়।

নাম, নামী ও সৃষ্টি

তাঁকে তত্ত্বতঃ জানার জন্যই প্রয়োজন তৎপ্রবর্ত্তিত দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া। তিনি জীবের প্রতি করুণাবশে কারণভূমি থেকে নেমে আসেন রক্তমাংসসঙ্কুল নরদেহে আদিম উৎসলোকের সম্যক স্মৃতি, চেতনা ও সংস্কার অব্যাহতভাবে বহন ক'রে। তিনি নামী অর্থাৎ নামেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ। আর, নামের মধ্যেই আছে সৃষ্টির আদি বীজ। তা' থেকেই জগৎ উদ্ভুত। জগতের যা'-কিছু শব্দেরই বিবর্ত্তন। তাই বলে শব্দব্রহ্ম। শব্দের মূলে আছে স্পন্দন। আর, স্পন্দনের মরকোচ নিহিত থাকে চরম নামে। গোড়ায় ছিলেন বিরাট বা মহাশূন্য তাঁর দুটি প্রান্ত নিয়ে। একটি প্রান্ত 'পজিটিভ্' আর একটি প্রাপ্ত 'নেগেটিভ্'। এই দুইয়ের মধ্যে আকর্ষণ, বিকর্ষণ চিরন্তন। তা' থেকেই হয় গতি ও শক্তি। এই সতত-গতিশীল শক্তিই আত্মা। অত্-ধাতু মানে সতত গমন। স্পন্দনের মূলেও আছে

ঐ আকর্ষণ, বিকর্ষণ। তা' থেকেই শব্দের আবির্ভাব। তা' থেকেই ক্রমে-ক্রমে সৃষ্টি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন—

"স্পন্দন
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল
শব্দে;
আর, শব্দই স্বর বা বাক্;
আর, ঐ বাক্ই হচ্ছে—
পরমপুরুষের মূর্ত্তন বিভা;
আর, ঐ বিভাতেই অন্তঃস্যূত হ'য়ে আছে—
স্পন্দদ্যুতি;
আর, তা' হ'তেই আসল—
ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্য;
এমনি ক'রেই
গোটা ব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টি হ'য়ে উঠল—
নানারকমে
নানাছন্দে,
সঙ্ঘাত-সঞ্জিত
সিঞ্চিত-স্রোতা
অনুকম্পনের ভিতর-দিয়ে;
বাস্তবতার—
বিস্তৃত বিশাল বিধানে
বিধায়িত হ'য়ে;
আর, তিনিই আদিপুরুষ,
তিনিই পরমপুরুষ,
তিনিই পুরাণপুরুষ;
অভিধায়না নিয়ে
নিবিষ্ট বিশাসনে
বিধায়িত বিদীপনায়

তাঁরই আরাধনা কর,
অস্তিত্বকে
সহজ ক'রে তোল,
সতেজ ক'রে তোল;
আর, শাতন হ'চ্ছে—
ঐ স্পন্দনার ছেদ নিয়ে আসে যা'তে,
ব্যভিচার-ব্যতিক্রম নিয়ে আসে যা'তে—
দুষ্ট অলৌকিকতার সৃষ্টি ক'রে;
ওঠ,
জাগো,—
তপঃ-কৃতিতে
ঐ অনুস্পন্দনকে অনুভব ক'রে
বিধাতা-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে;
আর, ঐ পথেই নিয়ে এস—
অমৃতস্রোত।"

ফলকথা, আদি নাম বা বাকই হ'চ্ছে সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ। আর, তারই সচেতন মূর্ত্ত বিগ্রহ হলেন পুরুষোত্তম। নামকে বলে তাঁর বাচক অর্থাৎ বোধক। নাম দিয়েই পাওয়া যায় তাঁর মূল ঠিকানা, অর্থাৎ তিনি কোথা থেকে দয়াপরবশ হ'য়ে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং পথহারা ও চেতনাহারা আমাদের নিয়ে যেতে চান কোথায়। সেই পরম-উৎসে অধিষ্ঠিত হ'য়ে চলতে না পারলে আমাদের সব চলাটাই যে নিরর্থক ও অজ্ঞতাপ্রসূ। তা' কেবল ব্যর্থতার জঞ্জালই বাড়িয়ে তোলে।

আমরা পূর্ব্বেই জেনেছি ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ধারণ-পালনী সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব লাভের উপায় হ'চ্ছে পুরুষোত্তম বা আচার্য্যে সক্রিয় অনুরতি। এই অনুরতি কিভাবে সম্যক পোষণ পেতে পারে তারই আলোচনা করব আমরা এখানে। দীক্ষা নিয়ে যা'-যা' করণীয় সেই সম্বন্ধে আমরা এখানে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করব এবং দেখাতে চেষ্টা করব কিভাবে তার ভিতর-দিয়ে ইষ্টানুরাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। দীক্ষাগ্রহণান্তর প্রথম করণীয় হ'ল যজন।

যজন

যজনের অর্থ

যজন-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—

"নিজে ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ,
ইষ্টার্থ পরিচর্য্যায়
তোমার জীবনকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল—
আগ্রহ-উচ্ছল একবুদ্ধি হ'য়ে,
তোমাকে ও তোমার যা'-কিছুকে
সব দিক দিয়ে
সাত্বতদীপনায় যোগ্য ক'রে তোল,
জীবন, জীবনীয় কর্ম্ম ও যা'-কিছুকে
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তোল,
এমনি ক'রে নিজে সংবর্দ্ধিত হও,—
যজনের যুতরহস্য তো এই-ই।"

তাই, যজন একটি ব্যাপক ব্যাপার। এর মধ্যে নিহিত আছে ইষ্টার্থী জপ, ধ্যান, ভজন, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সদাচার, স্বাধ্যায়, ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, পূজা, প্রার্থনা প্রভৃতি। নিজেকে সামগ্রিকভাবে ইষ্টের ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হবে। তঁদ্ভাবভাবিত ও তঁদাকারাকারিত হ'য়ে ওঠাই যজনের তাৎপর্য্য।

বিভিন্ন প্রকারের নাম

পূর্ব্বে আলোচিত কতকগুলি বিষয় স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তাই, সংক্ষেপে আমরা সেগুলির পুনরুল্লেখ করছি। ইষ্ট ব'লে গ্রহণ করতে হবে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইদানীন্তন যুগপুরুষ যিনি-তাঁকে। তিনিই ঈশ্বর তথা পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি মহাপুরুষের সাকার বিগ্রহ। সৃষ্টির আদ্যন্ত তাঁর নখদর্পণে। সসীম ও অসীমের মূর্ত্ত সমাবেশ তিনি। যে আদিকারণ থেকে যা'-কিছু উদ্ভূত

হয়েছে, তিনি সেই কারণস্বরূপ। আর, সেই কারণকে অধিগত করবার কৌশলও জানিয়ে দেন তিনি। ঐ কৌশল জ্ঞাপনই দীক্ষা। একে দীক্ষা বলা হয় এই জন্য যে এর অনুশীলনে দক্ষতার সঞ্চার হয়। দীক্ষার মধ্যে থাকে নাম। নাম বিভিন্ন প্রকারের। যথা—ধ্বনাত্মক, ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক। ধ্বনাত্মক নামই শ্রেষ্ঠ নাম। কারণ, জগতের যা'-কিছু স্পন্দন থেকেই সৃষ্ট এবং স্পন্দনের মূল প্রাণ ও মরকোচ যা' তাই-ই নিহিত থাকে ধ্বনাত্মক নামে। ইষ্ট অর্থাৎ নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে ঐ নাম সাধনে আমরা কারণে যেয়ে পৌঁছাতে পারি।

জপ-ধ্যান

তাই, চাই জপ আর ধ্যান। মনে-মনে নাম করতে হবে আর সেই সঙ্গে ইষ্টের চিন্তা করতে হবে। ইষ্টমূর্ত্তি কারণস্বরূপ বা নামেরই সচেতন বিগ্রহ। তাই, ইষ্টচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চাই ইষ্টমূর্ত্তির স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এর ভিতর-দিয়ে আমরা সহজেই পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যুগপুরুষোত্তমই মানুষের আরাধ্য ও ধ্যেয়। তিনি যদি বিগত হন, তখনও তিনিই আরাধ্য ও ধ্যেয়। কারণ, স্বয়ং নামী ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য বা ধ্যেয় হ'তে পারেন না। তাতে আমরা নামের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি না। ধ্যেয় যে স্তরের, আমরা বড় জোর সেই স্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'তে পারি। তারপর আমাদের গতি রুদ্ধ হ'য়ে আসে। তা'ছাড়া, অভ্রান্ত পরমপুরুষ ছাড়া অন্য কাউকে ধ্যান করলে, তাঁর চরিত্রগত ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা যদি কিছু থাকে, তা' আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে। তাতে হিতে বিপরীত হয়। এক কথায়, পরমপুরুষের পুনরাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত অধুনাতন (latest) পরমপুরুষই আরাধ্য ও ধ্যেয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই যে, নামধ্যানের সময় বহু অবান্তর চিন্তা এসে আমাদের বিক্ষিপ্ত ক'রে তুলতে চায়। সেই চিন্তাগুলি চাপা দিতে বা তাড়াতে চাইলে কিন্তু ফল ভাল হয় না। তাই, ওগুলিকে ইষ্টে অর্থান্বিত অর্থাৎ যুক্ত ক'রে তুলতে হবে। ওকেই বলে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান। আমাদের যদি কোন খারাপ প্রবৃত্তিও থাকে এবং তাকেও যদি ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার অনুকূলে নিয়োজিত করতে পারি, তাহ'লে তা' আর খারাপ ফল প্রসব করতে পারে না। খারাপটাই তখন মহাকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভালমন্দ যা'-কিছুরই

এমনতর সমাবেশ ও বিনিয়োগ না ক'রে যদি তাকে নিরুদ্ধ ক'রে দেওয়া যায়, তবে তা কোন্ সময় যে কোন্ বিপর্য্যয় ঘটাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেইকো। তাতে সঙ্গতিশীল অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা দুরূহ হ'য়ে উঠবে। তাই, আমাদের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ অর্থাৎ জীবন-আকূতিকে নিঃশেষে ন্যস্ত করতে হবে ইষ্টে, যিনি কিনা সত্তা সম্বর্দ্ধনার জীবন্ত প্রতীক। আর, নামধ্যানের ফলে চেতন, অবচেতন ও অচেতন মনের যত যা'-কিছুর সঙ্গেই সাক্ষাৎকার হোক না কেন, তাতে সুসঙ্গতভাবে গ্রথিত ক'রে তুলতে হবে ইষ্টে।

অতীতের ছাপ

আমাদের প্রত্যেকের র'য়ে গেছে অনন্ত অতীত। বিবর্ত্তনের ধারায় কত পথ ভ্রমণ ক'রে, কত অবস্থা অতিক্রম ক'রে, কত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে আজ যে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছি, তার বিপুলত্বের পরিমাপ করা সুকঠিন। সেই যে সুবিশাল অতীত তা' আমাদের বিস্মৃতির অতলে ডুবে আছে। কিন্তু সে অতীত মুছে যায়নি, ম'রে যায়নি। জান্তে-অজান্তে তা' আজও আমাদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করছে। কিন্তু সেগুলি হ'য়ে আছে স্ব-স্ব প্রধান। ইষ্ট বা মঙ্গলে যুক্ত বা বিন্যস্ত হ'য়ে ওঠেনি তারা। ঐ সবকিছুকে যদি ইষ্টের সঙ্গে সুযুক্ত ও ইষ্টার্থসঙ্গতিশীল ক'রে তুলতে না পারি, তাহ'লে তো হবে না। এখন ওগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে কি ক'রে? সন্ধান পাওয়ার উপায়ই হ'ল জপ-ধ্যানের ভিতর-দিয়ে মস্তিষ্ককোষগুলিকে জাগ্রত ক'রে তোলা। নাম ও নামীর সঙ্গে রয়েছে যা'-কিছুর মূলের সঙ্গে যোগ। তাই, জপ-ধ্যান করতে-করতে যা'-কিছুর গোড়ার টান পড়ে। মস্তিষ্ককোষগুলির মধ্যে যে-সব ছাপ ও সংস্কার অন্তর্লীন হ'য়ে আছে, সেগুলি তাই ভেসে ওঠে। যেমন-যেমন যা' ভেসে ওঠে, সেগুলিকে তখন-তখনই ইষ্টের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ক'রে তুলতে হয়। এমনি ক'রে আমরা নিজেদেরকে সমস্ত অতীত নিয়ে সমগ্রতায় আবিষ্কার করি। এই অতীতটা যতদিন অনাবিষ্কৃত ও ইষ্টযোগরহিত থাকে ততদিন আমাদের যোগ সুসম্পূর্ণ হয় না। কারণ, অবচেতন মনের নানা নিরুদ্ধ সংস্কার আমাদের যোগভ্রষ্ট ক'রে তুলতে পারে। এইখানেই নাম-ধ্যানের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

তপস্যা

নাম-ধ্যানের ভিতর দিয়ে একটা তাপ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তাপের সৃষ্টি করে, তাই একে বলে তপস্যা। তপস্যা নিয়ে আসে একটা সম্বেগ। কিন্তু ঐ সম্বেগকে যদি কর্ম্মে প্রযুক্ত করা না হয়, তাহ'লে তা' শুধু নিষ্ফল হয় না, তা' নিয়ে আসে অবসাদ। তাই, নামধ্যানের সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টানুপূরক তীব্র কর্ম্ম চাই-ই। অতন্দ্র কর্ম্মব্যাপৃতি না থাকলে নামধ্যান একঘেয়ে হ'য়ে যায়, তাতে কোন রস পাওয়া যায় না। অগ্রগতিও রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আবার, কর্ম্মপ্রচেষ্টা আছে কিন্তু নামধ্যান নেই, তার ভিতর-দিয়ে নানা প্রবৃত্তির আবিলতা এসে জোটে, আর কর্ম্মের মধ্যেও থাকে না ইষ্টচেতনা, সরসতা ও উপভোগ।

ধ্যানের রীতি

ধ্যান জিনিসটা একটা আড়ষ্ট ব্যাপার নয়। প্রিয়জনের কথা আমরা যেমন সহজ আগ্রহ ও আকুলতা নিয়ে চিন্তা করি, ইষ্টের সম্বন্ধেও তেমনি চিন্তা করতে হবে। তাঁর চলা, বলা, করা, ভাবভঙ্গী, হাসিখেলা, চাহিদা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি নিয়ে অনুধ্যান করতে-করতে সহজেই মন তন্ময় ও নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে। তাঁর ভুবনভোলানো রূপ তখন আপনিই অন্তরে জাগ্রত হয়। যান্ত্রিকভাবে কসরত করতে হয় না।

'ইষ্ট আর ইষ্টস্বার্থে মনের আনাগোনা,
এমনি ক'রে ধ্যানে আসে চিত্ত-সংযোজনা।"

প্রাণে একটা ব্যাকুলতা চাই, কেমন ক'রে আমার জীবনটাকে ইষ্টের সেবায় লাগাব। সেই ব্যাকুলতা নিয়ে চিন্তা করতে হয় ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি বাস্তবে কেমনভাবে কী করব। এই ধান্দাই ধ্যানকে সহজ ও স্বাভাবিক ক'রে তোলে। সেইজন্য ইষ্টের ইচ্ছাপূরণের চিন্তা ও দায়িত্ব মাথায় নিয়ে চলতে হয়। তাতে ধ্যান লেগেই থাকে।

"প্রেষ্ঠ চিন্তা, তাঁর চাহিদা
প্রাণটি ভ'রে থাকে
পূরণ-প্রয়াস আবেগ নিয়ে—
যজন বলে তাকে।"

ধ্যানসিদ্ধ যে যত, বাস্তবজীবনে কৃতকার্য্যতার পথও তার তত উন্মুক্ত। ধ্যান

করতে-করতে চিন্তা, মনন ও পরিকল্পনা করার শক্তি এতখানি বৃদ্ধি পায় যে, তাকে যে-কোন কাজে প্রয়োগ ক'রে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করা যায়।

"সূক্ষ্ম সার্থক বিভেদ বিচার
সফল অনুভব,
ক্ষিপ্র চিন্তা স্মৃতি কর্ম্ম
ধ্যানেরই বিভব।"

চরিত্রে এই সম্পদগুলি থাকলে তার ভাবনা কী? নাম, ধ্যান ও কর্ম্ম মানুষের মহত্তর বিকাশকে সহজ ক'রে তোলে—

"নাম কর আর মনন কর
ইষ্টের যত গুণাবলী,
ভাবে কাজে মক্স কর
জ্ঞানে গুণে হবে বলী।"

এর ভিতর-দিয়েই ইষ্টানুগ চারিত্রিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে।

একাগ্রতা

ধ্যানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একাগ্রতা। অর্থাৎ, এককে সামনে রেখে চলা। আমরা যতই ধ্যান-অভ্যস্ত হই, ততই একমুখী হই। একটা জিনিসকে সব দিক দিয়ে ভেবে, সব-কিছুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ক'রে, চিন্তা ক'রে আমার ও আমার ইষ্টের তথা পারিপার্শ্বিকের কাছে তার উপযোগিতা কী সেইটে আবিষ্কার করাই ধ্যানের কাজ। এতে যাবতীয় বৈচিত্র্যনিচয়ের মধ্যে যে একটা গভীর একসূত্রসঙ্গতি আছে, তা' ধরা পড়ে। এইভাবে আমরা প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটার পরিপূরক ক'রে জীবনটাকে মহা-ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারি। আমাদের সমগ্র শক্তি সংহত হ'য়ে ওঠে এবং সেই সংহত শক্তির বলে অসাধ্যসাধন করা সম্ভব হয়।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

নাম করতে-করতে আমাদের মস্তিষ্ককোষ, স্নায়ুমণ্ডলী ও ইন্দ্রিয়গ্রামের তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। ইন্দ্রিয়গ্রামের অনুভবশক্তি যখন নিরতিশয় বৃদ্ধি পায়, তাকেই বলে অতীন্দ্রিয়-শক্তির অধিকারী হওয়া। তখন হয়তো সাদা চোখে এমন জিনিস দেখা যায়, যা' মাইক্রোস্কোপ

দিয়েও দেখা সম্ভব নয়। তার ভিতর-দিয়ে জগৎটা আমাদের কাছে আরও বিস্তৃত হ'য়ে ওঠে। যেসব জিনিস আগে আমরা বোধ করতে পারতাম না, তা' আমাদের বোধের কাছে ধরা দেয়। নামের প্রেরণায় বিশেষ ক'রে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করে। স্তরে-স্তরে নানাপ্রকার শব্দাদি শ্রবণ ও জ্যোতিদর্শনাদি হ'তে থাকে। এইভাবে আস্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরাজ্য পর্য্যন্ত সৃজন-পরিক্রমার নানা স্তর আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হ'তে থাকে। রহস্যের যবনিকা অপসৃত হ'য়ে যায়। সরাসরি আমরা তত্ত্ব-বস্তুকে অনুভব করতে পারি। কিন্তু এখানে প্রধান জিনিস হ'ল নামীতে সুনিষ্ঠ অনুরাগ, আর নাম মানেও ইষ্টানতি।

ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাহীন নামপরায়ণতার বিপদ

সেই অনুরাগ, তাঁর ধ্যান ও প্রীতিকর্ম্ম যদি না থাকে তবে শুধু নামের ফলে প্রবৃত্তিপরায়ণতাও বেড়ে যেতে পারে। কারণ, শুধু সম্বেগ ও শক্তিবৃদ্ধি করলেই চলবে না, চাই তার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। আর, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখনই তা' ইষ্টসেবায় লাগে। সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়াই মূল কথা। রাবণ তপস্যার বলে অসাধারণ শক্তি লাভ করেছিল। কিন্তু ঐ শক্তি প্রবৃত্তিস্বার্থসাধনে নিয়োজিত হওয়ায় তা-ই তার পতনের কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। এ-সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল পুরোপুরি ইষ্টের হওয়া, যা'-কিছুকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা। তখনই আমাদের জীবনটা ভাগবত হ'য়ে ওঠে এবং জীবনের প্রকৃত মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারি আমরা তখনই।

নাম ও ধ্যান দুই-ই চাই

নামের সঙ্গে যেমন ধ্যানের প্রয়োজন, ধ্যানের সঙ্গে আবার তেমনি নামের প্রয়োজন। কারণ, নাম যদি সম্বেগ না যোগায় তবে ধ্যানটা স্তিমিত হ'য়ে আসতে চায়। নামে করে আমাদের সাড়াপ্রবণ, ধ্যানে করে গ্রহণক্ষম। এই দুইয়ের সংযোগ না হ'লে সাম্য থাকে না। আবার, এর সঙ্গে যদি করা-বলার সংযোগ না থাকে, তাহলেও অসঙ্গতি দেখা দেয়।

নাম সর্ব্বক্ষণ করতে হয়।

"ঊষা-নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসম্ভব ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ।"

নাম ও আত্মসংশোধন

চেষ্টা ক'রে সর্ব্বদা নাম করার অভ্যাসটা পাকা ক'রে ফেলতে পারলে মনের একটা নিশানা ও চেতনা ঠিক থাকে। কোন বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি বা আকর্ষণ আমাদের অন্য দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা তখন-তখনই তা ধ'রে ফেলতে পারি। জাগা ঘরে চুরি হ'তে পারে কম। এমনতর অবস্থায় আত্ম-বিশ্লেষণ ও নিরখ-পরখ সহজভাবেই চলতে থাকে। ভুল ক'রে পরে পস্তাই না, ভুল হ'তে যাবার পূর্ব্ব মুহুর্ত্তেই সামাল হ'তে পারি। তাও ভুল হয়। কিন্তু ঐ চলন থাকলে ভুল সংশোধন করতে দেরী লাগে না। কারণ, ভুল পুষে রাখা বা সমর্থন করার ইচ্ছা থাকে না, ভুল ধরা পড়া মাত্র তাকে নির্ম্মূল করতে ইচ্ছা করে। অনেক সময় আপনা থেকে ভুল ধরা পড়ে না। কিন্তু নামধ্যান করতে বসলে, তখন টের পাওয়া যায়। তারপরে আবার ওগুলিকে সংশোধন করতে হয়। নামধ্যানের সময় হয়তো বুঝতে পারলাম কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। সে-অবস্থায় যথাসত্বর সদ্ব্যবহারে তাকে তুষ্ট করা প্রয়োজন। এইভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে থাকলে গলদ জমতে পারে না। মনটা স্বচ্ছ ও ভার মুক্ত থাকে। জীবনটা একটা ফুরফুরে দখিনা হাওয়ার মতো নিরাবিলভাবে ব'য়ে চলে।

আত্মস্থতার আনন্দ

আবার, নামধ্যান করতে-করতে আমাদের মনের একটা অন্তর্মুখী ভাব লেগেই থাকে। চেতনার শিকড় নিনড় নিষ্ঠায় প্রোথিত থাকে সত্তার গভীরে—ইষ্টে; তাই সংসারের শত ঝঞ্ঝাও তখন আমাদের দিশেহারা করতে পারে না। সমস্ত চাঞ্চল্যের মধ্যেও একটা গভীর স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি বিরাজ করে। এই আত্মস্থতা, ইষ্টস্থিতি বা ব্রহ্মবিহারই জীবনে একান্তভাবে কাম্য। ব্রহ্মবিহার মানে বৃদ্ধিতে বসবাস ও বিচরণ। প্রকৃতপক্ষে, সক্রিয় ইষ্টতন্ময়তায় যে কী সুখ, তা' আমরা জানি না। তাই, অকিঞ্চিৎকর প্রবৃত্তিসুখের জন্য লালায়িত হ'য়ে ঘুরি।

তাঁতে মত্ত হ'তে পারলে, তখন দুঃখ ব'লে আর কিছু থাকে না, অভাববোধ ব'লে কিছু থাকে না। মানুষ তখন চিরপূর্ণতা ও চিরনবীনতার বোধে সমাসীন হয়। জীবন ও জগৎ তার কাছে মধুমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। অন্তরের সুষমা ও সামঞ্জস্য দিয়ে, ইষ্টৈকলক্ষ্য প্রীতি দিয়ে সে সব অসামঞ্জস্যের বুকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ভজন

নামধ্যান করতে-করতে যখন শব্দ জাগে তখন বিধিমাফিক ঐ শব্দের অনুসরণ ও অনুসন্ধান করতে হয়। একেই বলে ভজন। সাধন-জীবনে ভজনের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তাই, গুরুর নির্দ্দেশ-অনুযায়ী গভীর নিষ্ঠাসহকারে নিত্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘ সময় ভজন করতে হয়।

আহার, বিহার ও আচার

ইষ্টানুচলনে ঠিক-ঠিক ভাবে চলতে গেলে আহার-বিহার, আচার-আচরণ ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। এগুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে শরীর-মন সুস্থ থাকে, ভাব-ভক্তি পুষ্ট হয়, অযথা বিক্ষেপের সৃষ্টি না হয়। এইগুলিকে বলে সদাচার। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—তিন প্রকারের সদাচার আছে। আধ্যাত্মিক মানে তাই যাকে অবলম্বন ক'রে সমুন্নত গতিশীলতা নিরন্তর ও অবাধ হয়। সুনিষ্ঠ ইষ্টীচলনই মানসিক ও আধ্যাত্মিক সদাচারের অঙ্গীভূত। এক কথায়, পূর্ণাঙ্গ সদাচার পালন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হ'তে হবে। সাধনজীবনে এটা অপরিহার্য্য। এর ব্যত্যয় হ'লে সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

স্বাধ্যায়

নিত্য সদ্‌গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নও আমাদের অবশ্য করণীয়। অধ্যয়নের মধ্যে আছে অধিগমন বা আয়ত্ত করার পথে চলা। তাই, শুধু পড়লে হবে না, জীবনবৃদ্ধিদ নীতিগুলি আয়ত্ত করতে হবে জীবনে। প্রয়োজনীয় সদভ্যাসগুলি অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করতে হবে। আবার, বদভ্যাসগুলিও প্রত্যাহার অর্থাৎ ত্যাগ করতে হবে।

ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত

বিশেষ-বিশেষ অপরাধের জন্য শাস্ত্রে বিশেষ-বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। তেমনতর অপরাধ কেউ ক'রে থাকলে বিহিত প্রায়শ্চিত্তে পরিশুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রায়শ্চিত্ত মানে বিহিত পন্থায় পুনরায় চিৎত্বে অর্থাৎ সাড়া-প্রাণতায় গমন করা। কদাচারের ফলে স্নায়ুর সূক্ষ্ম বোধশক্তি হ্রাস পায়। আত্মবিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে মানসিক দুষ্টির কারণ অনুধাবন ও আবিষ্কার ক'রে বিহিত সংযম-নিয়মাদির পালনে তাকে অপনোদন ক'রে লুপ্ত চিৎশক্তিকে জাগিয়ে তোলাই প্রায়শ্চিত্তের তাৎপর্য্য। আবার, ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন এবং মানসিক পবিত্রতা ও সন্তোষ সাধনের জন্য বিশেষ-বিশেষ ব্রতের বিধান আছে। প্রয়োজনমত সেগুলিরও অনুষ্ঠান করা ভাল।

প্রার্থনা, ইষ্টপ্রসঙ্গ ও ইষ্টসঙ্গ

প্রার্থনা সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় অনেককিছুর জন্য প্রার্থনা ক'রে থাকি। কিন্তু প্রার্থনাগুলি আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক না হ'য়ে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক হওয়াই ভাল। কারণ, আত্মস্বার্থপ্রতিষ্ঠামূলক চাহিদা ইষ্টের সঙ্গে বিচ্ছেদ রচনা করে। তাঁকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে চলতে হয়। এতে যোগটা স্বতঃ ও স্বাভাবিক হয়। আবার, প্রার্থনাগুলি বিহিত বাস্তবচলন ও করণ-সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই সেগুলি অমোঘ হ'য়ে ওঠে। প্রার্থনা কথার তাৎপর্য্যও হ'ল প্রকৃষ্ট চলন। পারিবারিক ও সঙ্ঘগত জীবনে সমবেত প্রার্থনা ও ইষ্টপ্রসঙ্গাদিও মনকে বিশেষভাবে ইষ্টের ভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। এগুলির অনুষ্ঠান বিশেষ কল্যাণকর। ইষ্টের জীয়ন্ত বেদীতলে উপনীত হয়ে সশ্রদ্ধ অনুধাবনায় বাস্তবভাবে তাঁর ও তঁদ্গতচিত্ত ভক্তের সঙ্গ করাও একান্ত প্রয়োজন। এর ভিতর-দিয়ে জীবনীয় অনেক-কিছু মালমসল্লাই আহরণ করা যায়।

এ সব-কিছুই যজনের অঙ্গীভূত। ফলকথা, যজনের উদ্দেশ্য হ'ল অনুসরণ ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে ইষ্টের চলনচরিত্রকে নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আত্মীকৃত করা। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁর ছন্দানুবর্ত্তী ক'রে তোলা বাস্তব কর্ম্মতৎপরতায়।

যাজন

যাজনের লক্ষ্য

যজনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজন যাজন। যাজন মানে সঞ্চারণা। যজন, যাজন দুটি কথাই এসেছে যজ্-ধাতু থেকে। যজ্-ধাতুর একটি অর্থ সঙ্গতিকরণ। তাই, যজন মানে ইষ্টের সঙ্গে নিজ অন্তর্জগতের সঙ্গতিকরণ আর যাজন মানে ইষ্টকে পরিবেশের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে পরিবেশকে ইষ্টানুগ সঙ্গতিতে সমুন্নত ক'রে তোলা। এর ভিতর দিয়েই হয় ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন। আর, তাই-ই হ'ল ধর্ম্মের লক্ষ্য। কারণ, এর ভিতর দিয়েই সমষ্টিসহ প্রতিটি ব্যষ্টি সমসূত্রতায় অখণ্ড জীবনবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে পারে।

যাজন কাকে বলে

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—"যাজন মানেই হচ্ছে মানুষের সংসর্গে গিয়ে বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, সাহচর্য্যে ও সাহায্যে বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে সেবাপটু দক্ষতার অনুপ্রাণনে এমনতরভাবে তাদের ভিতর চারিয়ে দেওয়া, যাতে তারা তোমার ইষ্টপ্রাণতায় আকৃষ্ট, উদ্বুদ্ধ ও অনুরঞ্জিত হ'য়ে তোমার ইষ্টে এমনতর অটুট ও আপ্রাণভাবে যুক্ত ও অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে, যার ফলে স্বতঃ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উৎসারণে তারা পূজায়, যজ্ঞে, দানে, তৎসঙ্গমে, অস্তিবৃদ্ধির অমৃতকৃষ্টিতে সহজ আলিঙ্গনে নিরন্তর হয়ে ওঠে।"

এখানে আমরা মূল জিনিসটি দেখছি, নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে অন্যের ভিতর চারিয়ে দেওয়া। তাই, যে-জিনিসটি আমরা চারিয়ে দিতে চাই, সেই জিনিসটি আমাদের থাকা চাই। ইষ্টপ্রাণতা একটি বাস্তব জিনিস। আমরা নিজেরা যতটা তার অধিকারী হব, অন্যের ভিতর তা' চারাতেও পারব ততখানি। এখন এই ইষ্টপ্রাণতা জিনিসটি কী?

তাঁর কথাতেই বলি—

"বুকফাটান টান যেখানে
প্রাণ সেখানে ধায়,
তাহারই মন পেতে গিয়ে
তার ভাবই সে পায়।"

ইষ্টপ্রাণতা কী

ইষ্টের প্রতি আকূল টানে, তাঁর মনোজ্ঞ হবার প্রলোভনে আমরা নিজেদের যতখানি নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাঁর ভাবে ভাবিত ক'রে তুলি, ততই আমরা ইষ্টপ্রাণতার অধিকারী হই। তখন মনে একটা রং ধরে। আমাদের সব-কিছু দিয়ে চাই তাঁর পরিপূরণ, তাঁর প্রতিষ্ঠা। যে সত্যই ইষ্টকে নিয়ে মসগুল হয়েছে, যে রস পেয়েছে তাঁতে, যার সত্তা নিবদ্ধ হয়েছে সেই প্রেমস্বরূপে, তার চোখ, মুখ, নাক, কান, হাঁটা, চলা, বলা, ব্যবহার সব কিছুই নিরন্তর তাঁকেই ঘোষণা করে। যে নিজে মজেছে, সেই পারে অন্যকে মজাতে। অন্যকে যা' ক'রে তুলতে চাই, নিজে তা হ'য়ে ওঠা চাই।

যজন ও যাজনের নিত্য সম্বন্ধ

এই হ'য়ে ওঠার প্রধান উপায় যজন। যজনে আমরা যত গভীর নিষ্ঠায় অবগাহন করব, ততই আমরা তাঁর ভাবে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠব। বাস্তব মনন ও করণের ভিতর-দিয়ে তাঁর জ্ঞান, গুণ আমাদের মধ্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে আমাদের আধার ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী, একটা আনন্দদীপ্ত তদ্গতচিত্ত সম্বেগ নিয়ে। ঐ আনন্দ-উদ্দাম রসসিক্ত তন্ময়তাই যাজনকে অমোঘ ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে। তা'ছাড়া, যাজন মানে মানুষের সত্তার মূলদেশ পর্য্যন্ত নাড়া দেওয়া, সদনুপ্রাণনায় আন্দোলিত ক'রে তোলা, নিজের চিৎশক্তির প্রেরণায় মানুষের জড়তা ও অসাড়তাকে অপসৃত ক'রে, তাকে জীবনীয় চেতনায় অভিদীপ্ত ক'রে তোলা। এ করতে হ'লে সাধনার সাহায্যে বিপুল শক্তিধারাকে উন্মোচিত ক'রে আত্মস্থ করতে হবে। নিত্যদিন বহন করতে হবে চরিত্রে। আবার, কঠোর তপস্বীর মত বিরুদ্ধ চিন্তা, চলন, বাক্য ও ব্যবহারকে সযত্নে পরিহার ক'রে চলতে হবে। নইলে ভাবজীবনে ছেদ এসে পড়বে। ব্যক্তিত্বের দ্যুতি মলিন হ'য়ে উঠবে, তাতে যাজন ফলবান হবে না।

তাই আমরা দেখতে পাই যজন ও যাজন অবিচ্ছেদ্য। যজন ছাড়া যাজন হয় না, যাজন ছাড়া যজন হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—"যাজন যখনই যজনকে অনুসরণ করে না, তখন তার উপসংহারে ব্যষ্টি, সমাজ ও জাতির ধ্বংসকেই নিমন্ত্রণ ক'রে আনে; কারণ, মানুষকে যা' উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে, তা' যদি অনাচরণজনিত দোষে ক্লিষ্ট হ'য়ে অবসন্ন হ'য়ে থাকে, সেই অবসন্নতার ভিতর-দিয়ে ignorance (অজ্ঞতা) তাকে অধিকার ক'রে বিকট বিক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অনবরত প্রয়াস পায়। তাই যিনি যাজক, তিনি যদি Ideal-এ (আদর্শে) thoroughly interested (পরিপূর্ণভাবে অন্তরাসী) ও আচারবান না হ'য়ে যাজন করতে যান, তবে তা' সমূহ বিপদেরই কথা।"

আবার, যাজন বাদ দিলে যজন ও ইষ্টপ্রাণতাও খিন্ন হ'য়ে ওঠে। তাই, তিনি বলেছেন—"যাজন মানুষকে সপারিপার্শ্বিক অস্তিবৃদ্ধির সেবায় উন্মুখ ও অভ্যস্ত করিয়া, ইষ্টপ্রাণনে অটুট করিয়া তুলিয়া, মননকে আরোতর সম্বেগশালিতায় উদ্দীপ্ত করিয়া বাস্তব কর্ম্মে আপ্রাণ বেগে নিয়ে যেতে পারে—আর এমনই করিয়াই মানুষকে অনুভূতি-সম্পদে নিয়তই সম্পৎশালী করিতে থাকে; তুমি যদি তোমার প্রাত্যহিক জীবন হইতে তাহাকে প্রতারিত কর, তোমার ধ্যান ও মনন যে ক্রম-অবসাদে নিমজ্জিতই হইতে থাকিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই;—যদি ধ্যানী ও যজনশীল হইয়া অমৃতযাত্রীই হইতে চাও, তবে ইষ্টপ্রাণ-সেবাপটু হইয়া তোমার প্রাত্যহিক জীবনে নিত্য-করণীয় ইষ্ট-যাজনকে কিছুতেই ত্যাগ করিও না।"

যাজকের মনোভাব

যাজন তাই আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন। কারণ, যাজন আমাদের ইষ্টপ্রাণতাকে সঞ্জীবিত রাখে ও বাড়িয়ে তোলে। তাই, যাজকের যাজিতের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন যে, তার সান্নিধ্যে সে ইষ্টযাজনের সুযোগ পেল, যেটা কিনা তার জীবনের চরম উপভোগ। ভক্তিমান যাজকের যাজিতের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ, প্রতিক্রিয়ায় যাজিতের অন্তরে তার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক ক'রে তোলে। মোটপর, যাজকের মনে যেন এইভাব না থাকে যে সে কাউকে উপদেশ দিতে যাচ্ছে বা উপকার করতে যাচ্ছে। সে উপকার করছে নিজেরই। কারণ, তার প্রত্যয়কে সে অন্যের মধ্যে

যত সঞ্চারিত করতে পারবে, তার নিজের প্রত্যয় তত পরিপুষ্ট হবে, আর তার পরিবেশ যতখানি ইষ্টমুখী ও উন্নত হবে, তার জীবনচলনাও তত সুন্দর ও সুগম হ'য়ে উঠবে। আর, পরিবেশকে যদি সে উন্নত ক'রে তুলতে না পারে, পরিবেশই তাকে টেনে নামাবে। যাজন তাই নিত্যকর্ম্ম। একটা দিন যাজন না করা মানে নিজের ভিতরে ও বাইরে অস্তিত্বের বিরোধী যা' তাকে পরোক্ষে পোষণপুষ্ট হ'তে সুযোগ দেওয়া। এককথায়, এর অর্থ দাঁড়ায় গাফিলতি ক'রে নিজের বিপদ নিজে ঘরে ডেকে আনা। তাই, সামর্থ্য থাকতে দৈনন্দিন যাজন কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। সপরিবেশ উদ্দীপ্ত ও আবিলতামুক্ত থাকতে গেলে অবিশ্রান্ত যাজনের সম্মার্জ্জন চাই-ই কি চাই, নইলে ভিতরে-বাইরে এত গলদ জমে যাবে যে তা' সাফ করা মুশকিল হবে। আজ যে পৃথিবীতে এত বিকৃত বোধনা ও বিকৃত চলনার আধিপত্য, তার প্রধান কারণ হ'ল ব্যক্তিগত জীবনে আচরণসমন্বিত যাজন ও সঞ্চারণার অনভ্যাস। কোথাও আচার অর্থাৎ আচরণ আছে, প্রচার নেই, আবার কোথাও প্রচার আছে কিন্তু আচার অর্থাৎ আচরণ নেই। তাই, সৎদীপনা সম্বেগশালী হ'য়ে উঠতে পারছে না সমাজে। যাজনের প্রাণ হ'ল সুসঙ্গত চলনদীপ্ত ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামুখর প্রীতি ও সেবাবুদ্ধি। ঐ আকূতিই আমাদের সবার প্রতি স্বার্থান্বিত ক'রে তোলে। আমরা যখন অন্যের প্রতি ইষ্টানুগ ছন্দে স্বার্থান্বিত হই, তারাও আমাদের প্রতি ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ইষ্টের প্রতি অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে থাকে।

শ্রদ্ধার্হ চলন

যাজনের যে সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আলোচনা সুরু করেছি, সে সম্পর্কে আরও অনেক কথা তলিয়ে বুঝতে হবে। যাজনের প্রধান জিনিস হ'ল নিজের ইষ্টপ্রাণতাকে অন্যের ভিতর চারিয়ে দিয়ে তাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ ক'রে ইষ্টে যুক্ত ক'রে তোলা। সাধারণতঃ এই ব্যাপারে আমরা বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করি প্রধানতঃ, এবং মনে করি ভাল ক'রে কথা বললেই যাজন ভাল হ'ল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে, সাহচর্য্যে ও সাহায্যে বাস্তবকরণের ভিতর-দিয়ে সেবাপটু দক্ষতার অনুপ্রাণনে এটা চারাতে হবে। এই সবগুলি যদি যথাসম্ভব সুসমন্বিত না হয়, তাহ'লে শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। আদত কথা হ'ল, আমরা যদি মানুষের প্রতি দরদী হই, তাদের মঙ্গললিপ্সু হই,

তখন কায়মনোবাক্যে লেগে যাই তাদের ভাল যাতে হয় তাই করতে। তখন ঐ সবগুলিই আপ্‌সে আপ এসে পড়ে। এতে মানুষ স্বতঃই আমাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধা যদি ইষ্টলগ্ন থাকে, তখন তখনই তাদের ঐ শ্রদ্ধাকে আমরা ইষ্টের চরণে উপনীত ক'রে দিতে পারি। আর, বাস্তবে করিও তাই। কারণ, আমরা জানি মানুষের মঙ্গল নিহিত ঐ ইষ্টে। তাতে যে যেমন কেন্দ্রায়িত হয়, সে তেমনি সার্থকতা লাভ করে জীবনে। এইভাবে মানুষকে ইষ্টে যুক্ত ক'রে তুলে শুধু তাদেরই যোগ্যতর ক'রে তুলি না, এই করার পথে আমরাও অধিকতর যোগ্যতা অর্জ্জন করি। এমনি ক'রে যাজন অর্থাৎ ধর্ম্মদান মানুষকে সপরিবেশ উন্নত ক'রে তোলে।

যাজন সর্ব্বোত্তম জনসেবা

এইদিক দিয়ে যাজন হ'ল সর্ব্বোত্তম জনসেবা। কারণ, মানুষ পৃথিবীতে যত কষ্ট পায়, তার মূলে আছে প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা। আর, যাজন মানে হচ্ছে প্রবৃত্তিঝোঁকা মানুষকে ইষ্টঝোঁকা অর্থাৎ সত্তাঝোঁকা ক'রে তোলা। তাকে বিনাশের পথ থেকে সরিয়ে এনে বিকাশের পথে চলন্ত ক'রে দেওয়া। আর, এই জিনিসটি তখনই সংঘটিত হ'তে পারে, যখন যাজক নিজে ইষ্টৈকলক্ষ্য, ধারণ-পালনী সেবা-সম্বুদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, শ্রদ্ধার্হ চলন-চরিত্রের অধিকারী হয়। তাছাড়া, তার কাছে এসে মানুষ যেন প্রাণ পায়, প্রেরণা পায়, শান্তির সুশীতল নিরাপদ আশ্রয় পায়। তাকে পেয়ে যেন মানুষ তৃপ্ত হয়, নন্দিত হয়, আপনজন ব'লে ভাবতে পারে। তার সুগভীর প্রীতিস্পর্শে যেন মানুষের বাঁচার প্রলোভন বেড়ে যায়।

যাজন ও সমাজের ঊর্দ্ধগতি

যাজকের ব্যক্তিত্বে যদি এই সুকেন্দ্রিক সত্তাসম্বর্দ্ধনী দরদী দ্যোতনা না থাকে, তবে কিন্তু সে মানুষকে মাতিয়ে তুলতে পারবে না, নাচিয়ে তুলতে পারবে না— উন্নত চলনের অভিগমনে। যে ইষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে যত বেশী আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলবে, তার আকর্ষণী ও নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাবে। আবার, পরিবেশকে টেনে তোলার চেষ্টায় মানুষ নিজেও ঊর্দ্ধগামী হবে। এইভাবে সমাজ অবিরাম ঊর্দ্ধগ অভিযানে ছুটে চলবে।

সমাজের রূপান্তর

যাজকের কাজ হ'ল সমাজকে একাদর্শে সংহত ক'রে পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক ক'রে তোলা—আদানে, প্রদানে, সেবায়, সহযোগিতায়, সম্বর্দ্ধনায়। তার জন্য তাকে মানুষের পেছনে লেগে থেকে ক্রমাগত প্রবোধনা যোগাতে হবে একটা প্রাণতপ্ত আবেগ নিয়ে। যাজক হ'ল সমাজে দেবভাবের দূত। সে নিজের প্রেরণা ও দৃষ্টান্তে মানুষের সুপ্ত মহত্তর গুণগুলিকে উদ্দীপিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। এইভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব যত পরিপুষ্ট ও বিকশিত হবে, সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধঃপতনও তত নিরাকৃত হবে। যাজক মানুষের মনে সঞ্চারিত ক'রে দেবে জীবনের একটা নূতন মূল্যবোধ, একটা গভীর দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্ত হীনতা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের জন্য একটা ক্ষুধা আছে। সেই ক্ষুধাকে, সেই আগ্রহকে দাউদহনী ক'রে তুলতে হবে ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের রসঘন আনন্দময় পরিবেশনের ভিতর দিয়ে। তখন সেই আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে। এইভাবেই হবে মানব সমাজের রূপান্তর।

যাজনের সুফল

যাজনের বাস্তব সুফল অনন্ত। এর ভিতর দিয়ে আমাদের লোক-সম্পদ বাড়ে। তাতে আমাদের জাগতিক জীবনে সবদিক দিয়েই সুবিধা হয়। যাজন শরীর-মনকে সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে, এমন-কি আয়ু পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। আবার, যাজনের মধ্যে যে বিহিতভাবে লিপ্ত থাকে, তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা গজায়। এর ভিতর-দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। যাজনের ভিতর-দিয়ে লোক নিয়ে চলার কৌশল, অনুসন্ধিৎসু সেবাপ্রাণতা, নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ইত্যাদি উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। এইগুলি যদি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তবে সে যে-কোন দুরূহ অবস্থার মধ্যেই পড়ুক না কেন, সে তার ভিতর-দিয়েই পথ ক'রে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। এক কথায়, সে হয় দুর্জ্জয়। অবস্থার দাস হয় না সে। সে হয় অবস্থার প্রভু। ইষ্টানুগ অধীনতা, সেবা ও যোগ্যতার দৌলতে সে হয় স্বরাট, স্বাধীন। দৈবী প্রভুত্বের রাজটিকা ললাটে প'রে সে ঘোরে দুনিয়ায়।

যাজন ও উপলব্ধি

যাজক নিত্য নূতনভাবে আবিষ্কার করে নিজেকে, দুনিয়াকে ও মানুষকে। যাজন-প্রসঙ্গে অভাবনীয়ভাবে নিত্যই নব-নব বোধ, জ্ঞান, অনুভূতি ও উপভোগের সমাবেশে, চেতনার বিশাল বিস্তারে, উদ্দীপনার অফুরন্ত উল্লাসে মানুষের দেহ-মন-প্রাণ মধুময় হ'য়ে ওঠে। "স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ, বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।" যাজনের ধান্ধা যদি আমাদের পেয়ে বসে, আমরা স্বতঃই বৃহৎ জগতের প্রতি উন্মুখ ও অন্তরাসী হ'য়ে উঠি, সমাজ-সচেতন হ'য়ে উঠি সুকেন্দ্রিক সমবেদনা নিয়ে; তাই আত্মপ্রদক্ষিণের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পাই, আরও মুক্তি পাই প্রবৃত্তির অভিভূতি থেকে। এই মুক্তি যে কত বড় মুক্তি, এতে যে জীবন কতখানি সফল হ'য়ে ওঠে, তা ব'লে বোঝাবার নয়। প্রত্যেকটা মানুষই এক-একটা জগৎ, এক-একটা বিশ্ব। এক-একটা মানুষকে যাজনের ভিতর দিয়ে আমরা এক-একটা নূতন বিশ্বের সন্ধান পাই ও তার অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করি। এতে জীবন প্রতিদিন ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করতে থাকে। প্রতিটি দিন নূতন অভিজ্ঞতার অবদান বহন ক'রে আনে জীবনে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রেষ্ঠ-যাজী হ'লে, আমাদের অভিজ্ঞতার সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি পায়।

যাজন ও যোগ

তারপর যাজন আমাদের ইষ্টে যোগযুক্ত ক'রে রাখে। নিরন্তর তাঁর সঙ্গে যোগে থাকাই তো বড় কথা। তা' আমরা থাকব কি ক'রে? আমরা সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সঙ্গে আদানে, প্রদানে, দায়দায়িত্বে আমরা কতভাবে জড়িত। মানুষের সঙ্গেই কাটাতে হয় আমাদের বেশীর ভাগ সময় নানা কর্ম্মব্যপদেশে। লোক-সংশ্রবের এই অনিবার্য্য প্রয়োজনকেই আমরা জীবনের চরম চরিতার্থতার সহায়ক ক'রে নিতে পারি, যদি আমরা যাজনমুখর থাকি। মানুষের সঙ্গে যত কিছু সংশ্রব ও সম্পর্ক তখন হ'য়ে ওঠে আনন্দের ও অভ্যুদয়ের। আনন্দমুখর মানসিক অবস্থা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকটি কাজও হ'য়ে ওঠে তখন সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, সুচারু ও ক্ষিপ্র। আবার, নিজেদের মধ্যে ইষ্টপ্রসঙ্গ পারিবারিক জীবন ও আড্ডা-মজলিসকে যে কতখানি উপভোগ্য, উচ্চেতনী ও উদাত্ত ক'রে তোলে, তাও ব'লে শেষ করা যায় না। একটা কর্ম্মময় মাতাল ইষ্টনেশা আমাদের চতুর্দ্দিকে একটা শক্তি-সম্বুদ্ধ আনন্দের ব্যূহ রচনা

ক'রে রাখে। শাতনের শত প্রলোভন বা নির্য্যাতনও তখন তা' ভেদ ক'রে আমাদের পরাভূত করতে পারে না। আমাদের সাধনার ধারা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে অখণ্ডিতভাবে প্রবাহিত হ'য়ে চলে। এতে আমরা বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে লিপ্ত থেকেও তার ঊর্দ্ধে থাকি, পরম সুন্দরকে প্রতিনিয়ত উপভোগ করি দৈনন্দিন জীবনচলনার আঁকে-বাঁকে বিচিত্র মাধুর্য্যে। তুরীয় আনন্দের উপলব্ধি জাগে এই ধূলিমলিন জগতের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে। আর, সেটা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধিতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে না, যাজনের ভিতর দিয়ে পরিবেশ, বাস্তব দুনিয়া ও তার নানা বিষয় ও ব্যাপারকেও আমরা রূপান্তরিত ক'রে চলি ভাগবত ছন্দে। এইভাবে যাজন মানুষের ভিতর-বাহির সব-কিছুকেই অমৃতায়িত ক'রে তোলে।

যাজন ও চারিত্রিক বিকাশ

এই যে অমৃতায়নের তপস্যা, এতে লাগে অশেষ সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়। মানুষকে স'য়ে-ব'য়ে, ভালবেসে, সেবায়, যত্নে, স্নেহে, মমতায়, প্রেমে, ধারণে, পালনে, পোষণে জীবনবৃদ্ধিতে অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে হয়। নীলকণ্ঠের মত হলাহল পান ক'রে দুনিয়াকে নির্ব্বিষ ক'রে তুলতে হয়। এই দৈবী আকৃতি মানুষের চরিত্রকে অশেষ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী ক'রে তোলে। মানুষের মঙ্গল নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে কোন ফাঁকির খেলা চলে না। মানুষকে ষোল আনা খাঁটি হ'য়ে উঠতে হয়, সব ক্লেশ স্বীকার ক'রে, সব দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সুকেন্দ্রিক ধারণ-পালনী সম্বেগসিদ্ধ হ'য়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে চির অতন্দ্রভাবে নিরত থাকতে হয়। এতেই তো নরদেহ ধারণের সার্থকতা, বাস্তব জীবনে ঈশ্বরীয় চলনচর্য্যা ও অনুভূতির স্ফুরণা। তাই তো গীতায় শ্রীভগবান সংক্ষেপে বলেছেন, "যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্।" শ্রীশ্রীঠাকুরও বলেছেন—

"যাজন আনে যুক্তবুদ্ধি
সমাহার নিয়ে সাথে,
ধী-এর সাথে দক্ষতা আনে
প্রজ্ঞা মুকুট মাথে।"

এমনতর সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়ক যাজন আমাদের নেশার মত পেয়ে বসুক। দেশ ও জাতি গঠনে, মানবতার নব-রূপায়ণে ইষ্ট-যাজনই হ'য়ে উঠুক আমাদের অক্ষয়-তূণ।

ইষ্টভৃতি

ইষ্টভৃতি কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি

দৈনন্দিন যজন-যাজনের সঙ্গে চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে নিত্য ইষ্টভৃতি পরিপালন। আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঈশ্বর, মানবসমাজ তথা বিশ্বপ্রকৃতির কাছে ঋণী, সবার সেবা ও সহযোগিতার উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অস্তিত্ব। সব চাইতে বড় কথা হ'চ্ছে এই যে আমাদের সৃজনের মূলে আছে ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ। সেই পরম সত্তার দয়াতেই আমরা সত্তায় সত্তায়মান হ'য়ে আছি। এই সত্য যদি আমাদের বোধে জাগ্রত থাকে, তাহ'লে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না। সেই কৃতজ্ঞতার সক্রিয় অভিব্যক্তি হ'চ্ছে ইষ্টভৃতি অর্থাৎ ইষ্টের ভরণ, পূরণ, পালন, পোষণ। ইষ্ট হ'লেন নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবন-উৎসস্বরূপ। তাই তাঁকে ভরণ-পূরণ করা মানে আমার ও সবার প্রাণাধার যিনি তাঁকেই পুষ্ট ক'রে তোলা। এতে আমার জীবনমূলকেই তাজা রাখা হয়। আমাদের জীবনে পরিবেশের অবদান অপরিসীম। কিন্তু সেই পরিবেশের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলেও আছেন সেই পরমকারুণিক পরমপিতা, যাঁর মূর্ত্ত বিগ্রহ হলেন ইষ্ট। তাই, আমার বা আমার পরিবার-পরিবেশের ভরণ-পোষণের আগে ভাবতে হবে আমাকে আমার ইষ্টের ভরণের কথা। কারণ, তাঁ' থেকেই সব। তাই, ইষ্টের ভরণার্থে শ্রদ্ধার ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য অন্নজল গ্রহণের পূর্ব্বে বিধিমাফিক ভোজ্য বা তদনুকল্পে অর্ঘ্য উৎসর্গ বা নিবেদন করতে হবে।

ইষ্টভৃতি সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে

এই বাস্তব করার ভিতর-দিয়ে ইষ্টই আমাদের কাছে প্রথম ও প্রধান হ'য়ে উঠতে থাকেন জীবনে। এই ইষ্টভৃতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'ল আবার ভ্রাতৃভোজ্য, ভূত-ভোজ্য নিবেদন, যার ভিতর-দিয়ে আসে পারস্পরিকতা, সহযোগিতা ও সংহতি। তাহ'লে ইষ্ট এবং পরিবেশের সেবা আমাদের অবশ্য পালনীয় ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত। এই অভ্যাস যদি মানুষের ভিতর গজায়, তাহ'লে তার

যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। কারণ, ঐ সেবার সম্বেগই তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলে। মানুষ যদি স্বার্থ-অভিভূত হয়, তাহ'লে সে নিজের ভারে নিজে তলিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সক্রিয় ইষ্টার্থপরতা ও পরার্থপরতা যদি তার জাগে তাহ'লে একটা সাত্বত উদ্দীপনা তাকে নিত্যনূতন বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি জুগিয়ে চলে। ধীরে-ধীরে সে হ'য়ে ওঠে একটা মহৎ মানুষ।

ইষ্টভৃতি ও ইষ্টানুরাগ

একটা অকাট্য মনোবৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, আমরা যার জন্য বাস্তবে যতখানি ভাবি, বলি ও করি, তার প্রতি আমাদের ততখানি টান গজিয়ে ওঠে। ভাবা বলায় যতটা হয়, তার চাইতে বেশী হয় করায়। যার জন্য আবেগ-সমন্বিত করাটা যত বেশী হয়, সে আমাদের মনে, মস্তিষ্ককোষে ও স্নায়ুমণ্ডলীতে তত বেশী ঠাঁই ক'রে নেয়। অর্থাৎ, সে ততখানি আপন হ'য়ে ওঠে। কেউ যদি আপন হয়, তার গুণগুলিও জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে আমাদের আয়ত্ত হ'তে থাকে। তাই, ইষ্টভৃতির সব চাইতে বড় সুফল এই যে, এর ভিতর-দিয়ে ইষ্টের প্রতি ভক্তি ভালবাসা বাড়তে থাকে। আর, তাঁর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা যত বাড়তে থাকে, মানুষের চারিত্রিক পরিবর্ত্তনও হ'তে তাকে সেই পরিমাণে। পৃথিবীতে দুর্লভ জিনিস হ'চ্ছে অকৃত্রিম ইষ্টানুরাগ। সেই ইষ্টানুরাগের উদ্বোধনে সহায়তা করে যা', তার মত উপাদেয় জিনিস আর কী হ'তে পারে? তাই ইষ্টকে তনু, মন, ধন দিয়ে সেবা করতে হবে। তবে ইষ্টকে যে সেবা বা ভরণ করতে হবে, তা' করতে হবে স্বার্থপ্রত্যাশাশূন্য হ'য়ে। প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে ইষ্টভৃতি করলে, মনটা কেন্দ্রীভূত থাকবে প্রত্যাশায়, তা' ইষ্টের দিকে ধাবিত হবে না। তাই, প্রবৃত্তি-মলিন কামনা-বাসনার ঘূর্ণিঘোর থেকে মনের ত্রাণ হবে না, যা' কিনা সার্থকতামণ্ডিত বৃহৎ বৃদ্ধির মূল বুনিয়াদ।

কর্ম্মজীবনের রূপান্তর

ইষ্টভৃতির ধান্দা যদি মানুষের মাথায় মজুত থাকে তাহ'লে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সে যে-কোন কর্ম্মই করুক না কেন, তার মধ্যেও ইষ্টের স্মৃতিই জ্বলজ্বল করতে থাকে তার অন্তরে। কারণ, আগে তার কাছে ইষ্টভরণ, পরে আর যা'-কিছু। ইষ্টভরণই কর্ম্মের মুখ্য অনুপ্রেরক। তাহ'লে তার উদরান্ন-সংস্থানী

কর্ম্মটাও রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে ইষ্টপূজার উপকরণ সংগ্রহে। এইভাবে তার কর্ম্মজীবন ধর্ম্মজীবনেরই পরিপোষক হ'য়ে ওঠে। কর্ম্ম তাকে যোগচ্যুত করে না বরং যোগমগ্ন ক'রে তোলে স্থূল বাস্তবতায়। আর, সবসময় তার লক্ষ্য থাকে যাতে প্রতিটি কর্ম্ম হয় সৎ, সুনিষ্পন্ন, দক্ষতাদীপ্ত ও ক্ষিপ্র। কোনরকম অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কারণ, যে কর্ম্মার্জ্জিত ফলের অগ্রভাগ ইষ্টকে নিবেদন করতে হবে, তা যদি কলুষবিদ্ধ হয়, তার চাইতে অপবিত্র আর কী হ'তে পারে? অপবিত্র যা' তা' কি তাঁর ভোগে নিবেদন করা যায়? মানুষ এতে আপনিই সৎ হ'য়ে ওঠে। সৎ মানে তাই, যা' অস্তিত্বের পরিপোষক। তখন মানুষের বুদ্ধিই হয় তার আহরণমূলক প্রতিটি কর্ম্মই যাতে পরিবেশের অস্তিত্বপোষণী হয়। ধর্ম্মবোধ যখন মানুষের কর্ম্মজীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এমন ক'রে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখনই আসে জগতে জীবনবৃদ্ধির প্লাবন। তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে পর্য্যন্ত তখন কল্যাণ বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে।

নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ

একেই বলে জীবনকে স্বতঃই যজ্ঞময় ক'রে তোলা। যজ্ঞ মানে লোকবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা। অতীত ও বর্ত্তমানের বিশ্বপরিবেশের নানা অবদানে সঞ্জীবিত ও সম্পুষ্ট হ'য়ে চলেছি আমরা—দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায়। এদের সেবা-সম্পোষণাও তাই আমাদের নিত্য করণীয়। এই হিসাবে শাস্ত্রে আছে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ (ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ) পরিপালনের বিধি। এর অর্থ হ'ল বিশ্বপরিবেশের প্রতি আমাদের করণীয় করা। আমরা নেব, দেব না, এমনতর একতরফা ব্যাপার বিশ্ববিধানে দীর্ঘদিন চলে না। তাতে অস্তিত্বের তলা শূন্য হ'য়ে যায়। তাই, অস্তিত্বের পরিপোষণী যা' তাকে পরিপোষণ ক'রে চলতে হবে নিত্যদিন। এই-ই জীবনের বিধি। তাই, দাবীদাওয়ার দিকে নজর না দিয়ে কর্ত্তব্যের দিকেই নজর দিতে হবে বেশী ক'রে। আমরা কী পাইনি, সে হিসাব না ক'রে ভেবে দেখতে হবে আমরা কত কী পেয়েছি। সেই চিন্তা যদি একবার আমাদের পেয়ে বসে, তাহ'লে কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নুয়ে আসে। তখন বুঝতে পারি স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি আমাদের করণীয় কী। নিঃসর্ত্তে, নিঃস্বার্থভাবে, নিরভিমান হ'য়ে যথাশক্তি সবার বাস্তব পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া তখন আমাদের গত্যন্তর থাকে না। এমনতর যজ্ঞময় ও সেবাময়

কর্ম্মব্যাপৃতি হ'তেই আসে সন্তোষ, আত্মপ্রসাদ ও আত্মপ্রসার। তখন বুঝতে পারি "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এইভাবে গোটা জীবনটাই উৎসর্গীকৃত হ'য়ে ওঠে পরম মঙ্গলময়ের চরণে। এই সুকেন্দ্রিক, সক্রিয় আত্মোৎসর্গের নেশা যখন পেয়ে বসে, তখন আত্মকেন্দ্রিক লোলুপতা ও লালসার হয় নিরসন। তাতেই আসে শান্তি, তৃপ্তি ও প্রাপ্তি। ইষ্ট ও পরিবেশের স্বার্থকেই যখন আমরা স্বার্থ ক'রে নিয়ে চলি সক্রিয়ভাবে, তখন বিধির বিধানেই আমাদের স্বার্থ পরিপূরিত হয় সর্ব্বতোভাবে। অথচ তার মধ্যে কোন উগ্র, অশান্ত, অতৃপ্ত লোভ ও প্রত্যাশার কণ্ডুয়ন থাকে না। এই যে প্রীতিমণ্ডিত, প্রত্যাশাহীন, উৎসসেবী ভরণপূরণী প্রচেষ্টা, তাই-ই মানুষকে তুলে ধরে সব প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে। জীবনে নেমে আসে তখন ভাগবত ছন্দ। কর্ম্মময় ভজমানতা অর্থাৎ সেবানিরতি আমাদের সার্থক ক'রে তোলে সব দিক দিয়ে—ব্যাপনে, বর্দ্ধনে, আনন্দে। পঞ্চমহাযজ্ঞ বা ইষ্টভৃতি পরিপালনের গূঢ় তাৎপর্য্য এইখানে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ইষ্টভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞেরই যুগোপযোগী রূপ। আর, এই পঞ্চমহাযজ্ঞের স্থগিতিতেই দেশে আজ দারিদ্র্যাদির এত প্রকোপ।

দারিদ্র্যব্যাধির নিরসন

দারিদ্র্য মানুষের একটা বড় রকমের সমস্যা। এর সমাধানের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের দিক থেকে প্রচেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে যে মানুষের চরিত্রের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা যদি বিশ্লেষণ ক'রে দেখি—তাহ'লে দেখতে পাব দারিদ্র্যের সহচর হিসাবে সাধারণতঃ থাকে আলস্য, অকৃতজ্ঞতা, আত্মম্ভরিতা, আত্ম-অবিশ্বাস ও ঠুনকো মান। এই দোষগুলির যদি নিরসন না হয়, তাহ'লে দারিদ্র্যের দূরীকরণ প্রায় অসম্ভব। ঐ দোষগুলির গায়ে যদি হাত না পড়ে, অর্থাৎ ঐগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রিত না করা হয়, তবে মানুষকে যতই সুযোগ, সুবিধা দেওয়া যাক না কেন, সে কিছুতেই কৃতী হ'য়ে উঠতে পারে না। ঐ দোষগুলির নিরাকরণ আবার বাইরে থেকে কেউ কাউকে করিয়ে দিতে পারে না। তার তাগিদ জাগা চাই তার ভিতরে। অবশ্য, ঐ তাগিদ জাগাবার ব্যাপারে বাইরে থেকে প্রবোধনা যোগান যেতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে নিজে উদ্ধার না করে, অন্ততঃ যদি ইচ্ছুক ও সচেষ্ট না হয়, তাহ'লে বাইরে থেকে করা যায় খুব কমই। হয়তো অলস মানুষকে শাস্তির ভয়

দেখিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তার পিছনে যদি তার প্রাণ না থাকে, তাহ'লে সে কাজে কতটুকু শক্তি সে নিয়োগ করতে পারে? অন্যান্য দোষগুলির গায়ে বাইরে থেকে হাত দেওয়া তো প্রায় অসম্ভব।

তাই, অমনতর মানুষকে রক্ষা করা যেতে পারে যদি তার ভিতর সক্রিয় ইষ্টানুরাগ সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া যায়। ইষ্টানুরাগকে সক্রিয় ও বলবান ক'রে তোলার একটা প্রধান উপায় হল দৈনন্দিন জীবনে ইষ্টভৃতি পরিপালন। ওতেই দীক্ষা অনেকখানি চেতন থাকে। তার সঙ্গে যজন, যাজন তো থাকবেই। যে-মানুষ আপন ধান্দায় ব্যস্ত, বিব্রত ও অভিভূত, সে ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কৃতজ্ঞতাবোধ যাকে সক্রিয় ক'রে তোলেনি, যে না ক'রে-ক'রে আত্ম-অবিশ্বাসটাকেই পাকা ক'রে তুলেছে, পদে-পদে যার মান যায়, এমনতর সঙ্কীর্ণতার নরকে যে আবদ্ধ—তার দৃষ্টিটাকে যদি একবার ইষ্ট ও পরিবেশের দিকে ফেরান যায়, সে যদি দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব সেবায় লাগে ইষ্ট ও পরিবেশের, তবে তার ঘুমন্ত সত্তাটা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। সে একটা নূতন রস পায়, আনন্দ পায় জীবনে। নিঃস্বার্থ দেওয়া ও করার আনন্দ, উৎসর্গের আনন্দ পেয়ে বসে তাকে। সে টের পায় সত্তার সঞ্জীবনী রসায়ন লুকিয়ে আছে কোথায়। তখন সে অন্তরে একটা সুগভীর তাগিদ অনুভব করে—সব দুর্ব্বলতা ও বাঁধাকে ঝেড়ে ফেলে কেন্দ্রায়িত বৃহৎ জীবনের অভিসারে উদ্দাম হ'য়ে ছুটে চলবার। প্রেমস্বরূপ ঐ কেন্দ্রটি চাই যাঁর ভরণ-পূরণের ধান্দায় সে দুনিয়ার বুকে ঢ'লে পড়বে প্লাবনের বেগে তার সম্ভাব্য সেবাসম্ভার নিয়ে। ইষ্টকে খুশি করবার উন্মাদনায় সে পরিবেশের সেবা না ক'রেও পারবে না। কারণ, সে জানে ইষ্ট সবার স্বার্থেই স্বার্থান্বিত। তাই, কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না, উপেক্ষা করা চলবে না কাউকে। তাছাড়া, ইষ্ট ও পরিবেশকে দিতে গেলে তো অর্জ্জন করতে হবে। সে অর্জ্জনের মূলেও তো আছে পরিবেশের প্রয়োজন-পূরণী সেবা। এই সম্বেগে তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম্মশক্তি সবই বিকশিত হ'য়ে উঠবে। সে হ'য়ে উঠবে নূতন মানুষ, সোনার মানুষ। এইখানে আমরা দেখতে পাই দারিদ্র্যব্যাধির নিরাকরণে ইষ্টভৃতির কী অমোঘ প্রভাব। এই প্রসঙ্গে এটা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে ইষ্টভৃতি-পরিপালনই যথেষ্ট নয়। ইষ্টের প্রতিটি চাহিদা পরিপূরণও ইষ্টভৃতির অঙ্গীভূত। তাছাড়া, ইষ্টভৃতি ক্রমবৃদ্ধিপর ক'রে রাখতে হবে। ঐ আকূলতাই যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তুলে চলবে।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন

এই কথাটা ভুললে চলবে না যে আমরা জীবনীয় যা'-কিছু ভোগ করি তা' ঈশ্বরের তথা ঈশ্বরসৃষ্ট মানবের দান। আমরা শ্রম ক'রে পেতে পারি। কিন্তু শ্রম ক'রে পাওয়ার সম্ভাবনাটাও সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন পরমপিতা। তাই, বিশ্বেশ্বর তথা বিশ্বের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও করণীয়ের অন্ত নেই। সেই করণীয়ের অন্যতম হ'ল ইষ্টভৃতি পরিপালন। এর ভিতর-দিয়ে বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সচেতন যোগসূত্র রচিত হয়। সে যোগসূত্র সক্রিয় প্রীতির যোগসূত্র, হৃদয়ের যোগসূত্র। এই যোগসূত্র রক্ষা ক'রে চলতে-চলতে আমরা ক্রমে-ক্রমে বোধ করতে পারি যে আমরা আমাদের সব-কিছু নিয়ে বিশ্বেশ্বর তথা বিশ্বের সেবার প্রতিভূ। আমরা এতটুকু নই, আমরা নিখিল বিশ্বের, নিখিল বিশ্ব আমাদের। "সকলেতে আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।" আমার আমি'কে যখন সকলের মধ্যে খুঁজে পাই, সকলে যখন তাদের আমিকে আমার মধ্যে খুঁজে পায়, তখনই হয় বৃদ্ধির অর্থাৎ আনন্দের চরম। তাই আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল। তাই গীতায় আছে, যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনের কথা। আগে ইষ্টভৃতি নিবেদন, তারপর নিজের অন্নজল গ্রহণ। এ বাদ দিয়ে আত্মোপভোগ চৌর্য্য ও পাপভক্ষণের সমান। কারণ, তাতে উৎসকে বাস্তবে অস্বীকার করা হয়, বাদ দেওয়া হয়, ভুলে যাওয়া হয়। এই বিস্মৃতি-প্রসূত, সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্ন চলনের অপনোদন ঘটিয়ে স্মৃতিচেতন, বিস্তারমুখী, সুযুক্ত চলনের আবাহন করতে হবে। যুক্ত হ'তে হবে ইষ্ট ও পরিবেশের বিপুল জীবনধারার সঙ্গে। আর, তারই বাস্তব সূত্রপাত হয় ইষ্টভৃতির মাধ্যমে।

ইষ্টভৃতি ও বিপদ-অতিক্রমণী শক্তি

ইষ্টভৃতির নৈষ্ঠিক পরিপালন মানুষের শরীর-বিধান ও মনোজগতে এমন একটি প্রধান সত্তা-সংরক্ষণী শক্তি ও বুদ্ধির সমাবেশ ঘটায় যে, আপদ-বিপদ ও দৈব-দুর্ব্বিপাকের সময় সে তার সাহায্যে অনায়াসেই তরে যেতে পারে। ইষ্টধান্দায় যে ব্যাপৃত, অনিষ্টকে ঘায়েল করার কৌশল, ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল তার স্বতঃই আয়ত্ত হ'য়ে থাকে। তাই সে প্রলয়েও নষ্ট পায় না। বিপর্য্যয়ের মুখে অন্য মানুষ যেখানে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায়, সেখানে সে স্তম্ভের মত অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে অটল গৌরবে। মস্তিষ্কের একমুখী সুবিন্যস্ত সূক্ষ্মশক্তির দরুণ অনেক সময়

সে বিপদ-আপদের পূর্ব্বাহ্নেই সঙ্কেত পেয়ে সাবধান হ'য়ে বিপদ এড়িয়ে যায়। এর মধ্যে অলৌকিকতার কিছু নেই। এ হ'ল বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। মঙ্গলের ভরণে সর্ব্বদা যে উদগ্র ও অতন্দ্র হ'য়ে থাকে, অমঙ্গল-নিরোধী প্রেরণা ও পাথেয় তার নিত্য সহচর হওয়াই স্বাভাবিক।

অনাসক্তি

ইষ্টভৃতি সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। আমরা বিস্তারের মধ্যে না গিয়ে এখানেই উপসংহার টানব। শুধু এই কথাটিই বিশেষভাবে বলবার যে আমরা জীবনে যা'-কিছুরই অধিকারী হই তার সার্থকতা ইষ্টসেবায়। নইলে আমরা পেয়েও পাই না। নিজেদের সঞ্চয় নিয়ে আসক্ত, আবদ্ধ, ভারাক্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত হ'য়ে নিজেদেরই কবর খুঁড়ি। উৎসের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগহারা হ'য়ে হারিয়ে ফেলি জীবনের বৃদ্ধিমুখী স্রোতল দীপনা। সঙ্কীর্ণ বদ্ধ জলাশয়ের মত দিন-দিন শুকিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু প্রত্যাশাশূন্য হয়ে তাঁর সেবায় যা' বিনিয়োগ করি, উৎসর্গ করি, ত্যাগ করি, প্রাকৃতিক বিধানে তাই আমাদের বেড়ে উঠতে থাকে। তাই-ই আমাদের বাঁচায় ক্ষুদ্রতা থেকে, মোহ থেকে। তাই-ই আমাদের বিরাট ক'রে তোলে, বিশাল ক'রে তোলে, অনন্তের বাহন ক'রে তোলে। তাঁর অনন্ত শক্তির লীলা চলে তখন আমাদের মাধ্যমে। অথচ অহঙ্কার বা আসক্তির বালাই থাকে না তা' নিয়ে।

"যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি
সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই
তাই তুমি পবিত্র সদাই।"

পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি আমাদের যা'-কিছু ইষ্টার্থে ও ইষ্টার্থী লোকসেবায় নিয়োজিত হ'য়ে আমাদের শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ক'রে তুলুক। আমরা নিরবসান অমৃত-অভিসারে এগিয়ে চলি।

ব্যক্তিজীবনের নিয়ন্ত্রণ

ভক্তির বিকাশ

ইষ্ট বা আচার্য্যের কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর নিষ্ঠাসহকারে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পরিপালন করার ভিতর-দিয়ে তাঁর প্রতি কেমনভাবে অনুরাগ জাগে এবং সেই অনুরাগের ফলে কেমনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্ভব হয়, তা' পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হ'তে সহজেই বোঝা যায়। এ-কথা আবার স্মরণ করা প্রয়োজন যে, অনুরাগ থাকলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির পরিপালন অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। আবার, অনুরাগ যতটা যা' থাক বা না থাক, আগ্রহসহকারে বিধিমত যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যদি নিয়মিতভাবে পালন ক'রে চলা যায়, তবে তার ফলে অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষের হাতে আছে এই অভ্যাসযোগ অর্থাৎ বৈধীভক্তির সাধনা। মানুষ যদি এই অনুশীলন নিয়ে লেগে থাকে, তাহ'লে কোন শুভক্ষণে রাগানুগা বা অহৈতুকী ভক্তির আবির্ভাবে তার জীবন ধন্য হ'য়ে যেতে পারে।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক

ইষ্টানুরাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হ'তে গেলে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যুগপৎ সমান তালে পালন করা চাই। একটা করলাম, আর একটা করলাম না তাতে কিন্তু হবে না। তাতে সামঞ্জস্য ও সমতা নষ্ট হ'য়ে যাবে। সবটা মিলে যেন একটা গোটা জিনিস। এর একটা নষ্ট হ'লে তার প্রভাব অন্যটার উপর গিয়েও পড়বে। ভাবা, বলা, করা, মন, বাক্য, শরীর—এগুলির সমান্তরাল বিনিয়োগ চাই। নইলে একপেশে হ'য়ে পড়বে। যাই-ই একপেশে হ'য়ে ওঠে, তাই-ই পরিণামে নিয়ে আসে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া। একটি তিনপায়া টেবিলের একটি পায়া যদি ভেঙ্গে যায়, তাহ'লে টেবিলটা যেমন খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে

পারে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কোন একটি উপেক্ষিত হ'লেও কিন্তু সাধনজীবনে তেমনি বিপর্য্যয় নেমে আসে। তাই এদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তবেই আত্মনিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু ও সাবুদ হবে।

সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিজীবনই সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি

ব্যক্তিজীবন সুনিয়ন্ত্রিত হ'লে, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনও ধীরে-ধীরে সুবিন্যস্ত হ'য়ে উঠবে। কারণ, ব্যক্তির সমবায়েই এগুলি গঠিত। কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা করতে গেলে তদুপযোগী কতকগুলি নীতি-বিধিকেও পালন ক'রে চলা প্রয়োজন। আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি, তাহ'লে দেখতে পাব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালনীয় সাত্বত নীতিগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং ঈশ্বরীয় তত্ত্ব ও বিশ্ববিধানের সঙ্গেও আছে সেগুলির এক পরম ঐক্যসঙ্গতি। কোথাও যেন কোন ছেদ নেই, কোথাও যেন কোন বিরোধ নেই। একই ধারণ-পালনী সূত্রকে অবলম্বন ক'রে ঈশ্বর ও জীবজগতের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হ'য়ে চলেছে এক পরম মধুর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ঐক্যরাগিনী। আর, এসবটা মিলে যেন একাধারে এক পরম বিজ্ঞান ও শিল্প। বিশ্বময় যেন একটা গাণিতিক নিয়মতন্ত্র চারুশিল্পের লীলায়িত সৌন্দর্য্য, সুষমা, ঐশ্বর্য্য ও বিচিত্র বিভঙ্গ নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে চলেছে। এই মহাসত্য, ঐক্যবিধৃত এই অনন্তলীলা অনুধাবন করেও সুখ আছে। পূর্ব্বের আলোচনার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা এখন বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করব।

বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন

বিবাহের উদ্দেশ্য

বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন। উদ্বর্দ্ধন মানে উন্নতির দিকে বেড়ে ওঠা। আর, সুপ্রজনন মানে সুসন্তানের জন্ম। বিবাহের ভিতর দিয়ে উদ্বর্দ্ধন কি ক'রে হয়, তাই-ই প্রথমে বিচার্য্য। এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখা প্রয়োজন, পুরুষ বিবাহের যোগ্যতা লাভ করে কিসের ভিতর দিয়ে। কারণ, যোগ্যতা অর্জ্জন না ক'রে বিবাহ করা উন্নতির কারণ না হ'য়ে অবনতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

আগে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, তারপর গার্হস্থ্য আশ্রম। ইষ্টনিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অর্থাৎ ছাত্রজীবনে বিহিত অনুশীলনে সুস্থ সুপটু দেহ-মন, ধীশক্তি, সেবামুখর কর্ম্মদক্ষতা, জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি লাভ করার পর তবেই পুরুষ বিবাহ করার যোগ্য হয়। সুকেন্দ্রিকতা নেই, সংযম নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, কর্ম্মশক্তি নেই,—এমনতর পুরুষ বিবাহের অযোগ্য। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—

> "ইষ্ট নাই করে বিয়ে
> আগুন ওঠে ফিনিক দিয়ে।"

বিবাহের যোগ্যতা

তাই, যে-সে অবস্থায় বিয়ে করলে কিন্তু উদ্বর্দ্ধন হবে না। বিয়ে করার আগে চাই ইষ্টনিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। পুরুষের মেয়েমুখীনতা ব'লে দেয় যে, সে বিয়ে করার উপযুক্ত নয়। মেয়েমুখী পুরুষকে মেয়েরা কখনও শ্রদ্ধা করতে পারে না। তাই, ঐ অবস্থায় বিয়ে করলে সে-বিয়ে উদ্বর্দ্ধনের উৎস হ'য়ে উঠতে পারে না। কিন্তু পুরুষ যদি ইষ্টনিষ্ঠ হয় এবং তার বিয়ে যদি ঠিকমত হয় তবে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী সহধর্ম্মিণীর উদ্দীপনা ও প্রেরণায় পুরুষ তার জীবনে সব দিক দিয়েই বেড়ে উঠতে পারে। আবার, ঐ উন্নত স্বামীর প্রতি সক্রিয় অনুরাগে স্ত্রীও সার্থক হ'য়ে ওঠে জীবনে। এই হ'ল উদ্বর্দ্ধনের প্রাথমিক কথা, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে সুপ্রজনন।

বর-মনোনয়ন

এখন বিয়ে ঠিকমত হয় কিসে বুঝতে হবে। নারীর শ্রদ্ধাই হ'ল বিবাহের ঘটক। মেয়েরা বড় হ'লে তাদের মত নিয়ে বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। মেয়েদের মত নিয়ে বিয়ে দিলে স্বামীকে সইবার, বইবার আগ্রহ তাদের ভিতর জাগবে বেশী ক'রে। অবশ্য, মেয়েদের গোড়া থেকেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বর মনোনয়নে বিচার্য্য কোন্‌গুলি। পুরুষ বর্ণ, বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, চরিত্র, ইষ্টপ্রাণতা, কর্ম্মদক্ষতা, বয়স ইত্যাদি সব দিক দিয়ে বরেণ্য হওয়া চাই। নিকৃষ্টের কাছে আত্মদান কখনও সমীচীন নয়। মেয়েকে জানতে হবে যে, সে তার রক্তধারার মধ্যে তার পূর্ব্বপুরুষকে বহন ক'রে চলেছে। সুতরাং তাকে বরণ করতে হবে এমন বংশের এমন পুরুষকে যাকে বরণ করায় তার অন্তর্নিহিত পিতৃপুরুষগণ অবনমিত না হ'য়ে সার্থকতায় নন্দিত হ'য়ে ওঠেন। এককথায়, পুরুষের জৈবী-সংস্থিতি, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি নারীর জৈবী-সংস্থিতি, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির পরিপূরক হওয়া চাই, এবং নারীর জৈবী-সংস্থিতি, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতি পুরুষের জৈবী-সংস্থিতি, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির পরিপোষক হওয়া চাই। শুভসঙ্গতিসম্পন্ন এমনতর সদৃশ বিবাহই শ্রেয়। এতে পুরুষ-নারী উভয়ই উভয়ের কাছে সত্তাপোষী আরাম ও আনন্দের আশ্রয় পায়। তবে বর-মনোনয়নের কথায় কেউ যেন মনে না করেন যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বাঞ্ছনীয়। নারী-পুরুষের মধ্যে সর্ব্বদাই সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় থাকা প্রয়োজন। অতি-নৈকট্যের প্রশ্রয় দিলে কামানতির সম্ভাবনা থাকে। তাতে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশী। হৃদয়বান, বিচক্ষণ অভিভাবকদের এ-সব ব্যাপারে মেয়েদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

সমাজের উদ্বর্দ্ধন

মেয়েদের মত নিয়ে যদি বিয়ে দেওয়া হয় এবং পুরুষের চারিত্রিক মান সম্বন্ধে মেয়েদের চাহিদা যদি উন্নত হয়, তাহ'লে পুরুষজনসাধারণ অজ্ঞাতসারে উন্নত হ'য়ে ওঠে। কারণ, পুরুষ স্বভাবতঃই মেয়েদের কাছে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে চায়। মেয়েদের মধ্যে যদি এমনতর একটা মনোভাব সৃষ্টি ক'রে তোলা যায় যে তারা ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ইষ্ট ও পিতা-মাতার উপর

শ্রদ্ধাহারা কোন পুরুষকে বিবাহের ব্যাপারে গণনাই করবে না, তাহ'লে পুরুষের মধ্যে তার একটা শুভ প্রভাব হ'তে বাধ্য। সমাজ তাতে বিবর্ত্তনমুখর ও মহামহিমান্বিত হ'য়ে চলে। এও বিবাহ-ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রে পরোক্ষভাবে সামাজিক উদ্বর্দ্ধনার একটা দিক।

নারীর অবদান

বিবাহিত জীবনে সহধর্ম্মিণীর নিষ্ঠা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রেরণা, সেবা, যত্ন, প্রীতি, মমতা, উৎসাহ ও সন্দীপনা পুরুষকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। ক'রে তোলে জীবনসংগ্রামে অপরাজেয়। পুরুষের দেহ, মন, বল, বীর্য্য, আয়ু, আনন্দ ও কর্ম্মশক্তির উজ্জীবনে নারীর অবদান অপরিসীম। ঘরে-ঘরে নারী সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী জগদ্ধাত্রীরই প্রতিমূর্ত্তি। তারই গুণবৈভবে আমাদের ধূলিমলিন গৃহাঙ্গন শুচিশুভ্র মঞ্জুলমধুর মঙ্গলতীর্থে রূপান্তরিত হয়, সংসার হ'য়ে ওঠে শান্তির স্বর্গ—যেখান থেকে উৎসারিত হ'য়ে চলে সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ-মণ্ডিত অভ্যুদয়ের ধারা। সংসারের আতপতাপে দগ্ধ হ'য়ে, ঝড়ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পুরুষ যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহমন নিয়ে গৃহে ফিরে আসে, নারীই তো তখন তার মমতা-মধুর প্রাণকাড়া সেবায় তার দেহমন জুড়িয়ে দেয়; সুখসন্দীপী আদরে, সোহাগে, মধুবর্ষী প্রেরণায়, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার অগ্নিমন্ত্রে তার স্তিমিত প্রাণে নূতন জীবনসম্বেগ ঢেলে দেয়। সে আবার ঊর্জ্জনদীপনায় উৎসৃজনী কর্ম্মে প্লাবনের মত ঢ'লে পড়ে ব্যাপ্তি ও বিস্তারের শুভ আবাহনে। এমনি ক'রেই তো নারী সবার অলক্ষ্যে প্রতিদিন পুরুষের ব্যথাদীর্ণ জীবনে শক্তি-সংবৃদ্ধ নব-জীবনের অরুণোদয় ঘটায়। সুকেন্দ্রিক প্রীতি-সিদ্ধা তপস্বিনী সতী নারী সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত অনন্ত সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ে, প্রত্যাশাহীন সেবায় নিয়ত আমাদের পোষণ, পালন ও বহন ক'রে চলে, তাইতো আমরা টিকে থাকি। দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মত পদে-পদে তারা আমাদের দুর্গতিনাশে নিরত থাকে। তাইতো আমাদের অস্তিত্ব অটুট, অক্ষত ও বর্দ্ধন-মুখর থাকে।

দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা

এই চলনে চলতে গিয়ে নারী নিজেও পরম বিকাশ, বিবর্দ্ধন, আত্মপ্রসাদ ও সার্থকতার অধিকারী হয়। তার বুক ভ'রে ওঠে তৃপ্তিতে। ধীরে-ধীরে তার

সর্ব্ববৃত্তি স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে সৎ-এ অর্থাৎ ইষ্টে একায়িত, ন্যস্ত ও নিবেদিত হ'য়ে ওঠে। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্বই নারীর ভূষণ। পুরুষ যেখানে ইষ্টনিষ্ঠ, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর ও মমতাদীপ্ত, বিবাহ-সম্মিলন যেখানে শিষ্ট এবং নারী যেখানে স্বামিগতপ্রাণা, স্বামীর উত্তর-সাধিকা, স্বামীসুখ-সুখিত্বের সাধনায় নিত্য অতন্দ্র, তদনুগ আত্মবিনায়নে সতত রত, সেখানে সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, আলোকে-আঁধারে সেই শ্রেয়সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, একায়িত, সংগ্রথিত যুগলসত্তা সমস্ত প্রলোভন ও বাধাকে পরাভূত ক'রে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সমন্বিত অমৃতমণ্ডিত মহাজীবনের পথে অগ্রসর হয়—পরিবার-পরিবেশকেও তদ্ভাবভাবিত ক'রে। এই চলনেই নারী-পুরুষের মিলিত জীবনে আসে ভাব-সংশুদ্ধি, দেবদীপ্ত দক্ষতা, পরাভক্তি ও পরমপ্রজ্ঞা—যা' কিনা মানবজীবনের মহালব্ধব্য। বিবাহের অন্যতম উদ্দিষ্ট পরিবার-পরিবেশসহ দাম্পত্যজীবনে এমনতর দিব্য উদ্বর্দ্ধন ও বিবর্ত্তনলাভ।

সুসন্তানের আবির্ভাব

এমনতর সমাবেশ যেখানে হয়, সেখানেই আবির্ভাব হয় সুসন্তানের। মানুষ তার পূর্ব্বপুরুষের বীজসম্পদ তথা গুণসম্পদের ধারক, বাহক ও অছিস্বরূপ। এককথায়, সে তার পিতৃপুরুষের রেতঃ-শরীর। মনুষ্য-দেহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী নয়। তাই পিতৃ-পরম্পরাগত বীজবৈভব অর্থাৎ রেতঃসত্তা ও তদনুস্যূত গুণৈশ্বর্য্যকে স্বীয় সাধনায় আরো সমুন্নত ক'রে অবিকৃতভাবে তা' সন্তানে সঞ্চারিত ক'রে যাওয়া বিধিদত্ত দায়-বিশেষ। এমনি ক'রেই বংশধারা ও মানববিবর্ত্তন ক্রমপদক্ষেপে এগিয়ে চলে। সন্ততিধারাকে ছিন্ন করলে পূর্ব্বপুরুষের বীজবৈভব ও গুণৈশ্বর্য্য মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়। সমাজ বঞ্চিত হয় তা' থেকে। সমাজকে এইভাবে বঞ্চিত করা সাধারণতঃ সমীচীন নয়। তাই, বিহিত পরিণয় ও প্রজনন ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনবৃদ্ধির মূল স্তম্ভস্বরূপ।

পিতৃঋণ পরিশোধ

এতেই বংশপরম্পরায় জীবনীয় শুভ সংস্কার ও গুণগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। আর, তা' দিয়েই মানবসমাজ উপকৃত হ'য়ে চলে। ভবিষ্যৎ

সমাজের প্রতিও আমাদের দায়িত্ব আছে। সেইদিক দিয়ে শুভবাহী পরিণয় ও প্রজননের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। তাই বলা হয় যে, বিহিত পরিণয় ও প্রজননান্তে সন্তানকে মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলার ভিতর দিয়ে পিতৃঋণের কথঞ্চিৎ শোধ হয়। তার মানে, পিতার কাছ থেকে আমরা যা' পেলাম তার ক্রমাগতি অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা ক'রে গেলাম।

সকলের বিবাহ করার অধিকার থাকা উচিত নয়

এটা যেমন একদিক দিয়ে সত্য, সেই সঙ্গে-সঙ্গে এটাও সত্য যে, কেউ যদি ব্যত্যয়ী বিবাহ-সঞ্জাত পরিধ্বংসী সংস্কার ও প্রকৃতিসম্পন্ন হয়, যাকে দিয়ে প্রধানতঃ সমাজ ও কৃষ্টির অকল্যাণ বই কল্যাণ হয় না, তার বিবাহ করার অধিকার না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, অকল্যাণকে সম্প্রসারিত করা কোন দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত নয়।

আদর্শ বিবাহ

যা' হোক, যেমন উদ্বর্দ্ধন তেমনি সুপ্রজননের জন্যও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের বৈধানিক সংস্থিতি, কুলসংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে সুগভীর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি। তার সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের চাই প্রবৃত্তি-পরভেদী শ্রেয়নিষ্ঠা যা' কিনা তার ব্যক্তিত্বকে অখণ্ডতা দান করে, আর নারীর চাই অকাট্য ইষ্টানুগ স্বামী-অনুরক্তি, যা' কিনা তাকে যোগ্যা মনোবৃত্ত্যনুসারিণী, সতী, সাধ্বী, সহধর্ম্মিণী ক'রে তোলে। এমনতর ঊর্দ্ধগ তপোরত, শিষ্ট, পবিত্র, একাত্মতাপ্রবুদ্ধ দাম্পত্য মিলনের মাধ্যমেই ঘরে-ঘরে আবির্ভাব হয় ধীমান, বীর্য্যবান, বিশালহৃদয়, প্রতিভাদীপ্ত, শ্রদ্ধাবান, সুকেন্দ্রিক, সেবাপ্রাণ, সংযত, কুশলকর্ম্মা, পরাক্রমী, পরার্থপর দেবসন্তানের, যারা বংশ, সমাজ, দেশ ও জগতের গৌরবস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। উপরোক্ত নীতিগুলির ব্যত্যয় যেখানে যত, সন্তানও সেখানে তত খারাপ হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—

> "অভ্যাস-ব্যবহার যেমনতর
> সন্তানও পাবি তেমনতর।"

পিতামাতার তপস্যাপরায়ণতা ও সন্তানের ভবিষ্যৎ

তাই, বিয়ে যত মিল ক'রেই দেওয়া হোক না কেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী গভীরভাবে তপোনিরত হ'য়ে চলার অভ্যাস ও আচরণে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত না থাকে, তাহ'লে সন্তান পিতামাতার শুভসংস্কার পেলেও তপস্যাপরায়ণতা অর্থাৎ উদগ্র সুকেন্দ্রিক প্রচেষ্টাপরায়ণতার সম্বেগ নিয়ে জন্মাতে পারে না। ঐ তনু-মন-প্রাণ-ঢালা তপস্যার ধাঁজ যদি জন্মগতভাবে না থাকে, মানুষ যদি ঢিলে ও অলস প্রকৃতির হয়, অসম্বদ্ধ, অকেন্দ্রায়িত গুণাবলীর অধিকারী হয়, তাহ'লে তার বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে সে বিকাশ লাভ করে অল্পই এবং সমাজও পায় তার কাছ থেকে সামান্যই। এইখানেই উভয়ের এককেন্দ্রিক নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার প্রয়োজনীয়তা। এতে পিতার রেতঃসত্তা সুকেন্দ্রিক পূতসম্বেগী হ'য়ে ওঠে, এবং মায়ের অন্তর্নিহিত বৈধানিক শক্তিও ঐ রেতঃসত্তাকে সুষ্ঠুভাবে ধারণ, বহন ও পোষণ ক'রে উচ্ছলতায় মূর্ত্ত ক'রে তোলার উপযোগী হ'য়ে ওঠে, যার ফলে সন্তান পায় পিতামাতার উৎকৃষ্টতম অবদান।

মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সুবিবাহ ও সুজননের উপর

তাই, সুসন্তান লাভ চারটিখানি কথা নয়। অনেক কিছুর সচেতন সমবায়ে এটা সংঘটিত হয়। তবে এটা হাতের বাইরের ব্যাপারও নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগের সুসমন্বিত ব্যবহারিক প্রয়োগের ভিতর-দিয়ে, এটা বাস্তবায়িত ক'রে তোলা অবশ্যই সম্ভব। আর, তারই কথঞ্চিৎ আভাস আমরা এখানে দিলাম। এর ভিতরই প্রোথিত আছে মানুষের আশার ধ্বজা। এইটে বাদ দিয়ে কিছুতেই কিছু হবার নয়। কারণ, বিবাহ যদি ঠিকমত না হয়, এবং মানুষ জন্মসূত্রে যদি বিশুদ্ধ জৈবীবিধান ও শুভসংস্কারের অধিকারী না হয়, তবে দীক্ষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারিবেশিক সম্পোষণায় সে লাভবান হ'তে পারে কমই। ওগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে গেলে, জৈবী-সংস্থিতির ভিতর তদনুগ উন্মুখতা ও পদার্থটুকু থাকা চাই। তাই বংশ, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ও জগতের সর্ব্বতোমুখী উন্নয়ন যাঁরা চান, তাঁদের শ্যেনদৃষ্টি রাখতে হবে উন্নতির এই ভিত্তিপ্রস্তরের দিকে। গোড়া কেটে আগায়

জল ঢাললে কিছুই হবে না। মানবসমাজ আজ চায় মানুষ, মানুষের মত মানুষ। মানুষ চাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করলে, মানুষের সব প্রচেষ্টা একটা মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। তাই পরিণয় ও প্রজনন-পরিশুদ্ধির উপর আজ সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনমত অযোগ্যদের বিবাহ ও অসাত্বত বিবাহ নিরুদ্ধ করতে হবে। অন্ততঃ সত্তাসংক্ষোভী ও সমাজকল্যাণবিরোধী জনন যাতে না হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা' করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে মানব-ইতিহাসে এমন এক অধ্যায়ের আবির্ভাব হবে, যখন মানুষের অযোগ্যতা, অপরাধপ্রবণতা, বিকেন্দ্রিকতা, স্বল্প আয়ু, শারীরিক ও মানসিক অপটুতা, বংশানুক্রমিক রোগ, ব্যাধি, নির্ব্বুদ্ধিতা, মেধাহীনতা, চেতনার জড়তা, অস্থিরমতিত্ব, স্বার্থান্ধতা, প্রবৃত্তি-অভিভূতি, দ্বেষ, হিংসা, অশ্রদ্ধা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি বহুল পরিমাণে নিরাকৃত হ'য়ে পৃথিবীতে মানুষের জীবন অনেক বেশী সুস্থ, সুন্দর, সমৃদ্ধ, সুসমঞ্জস, সুখকর ও আনন্দ-মধুর হ'য়ে উঠবে।

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, সুপ্রজনন ও সমাজ-সংহতি

সবর্ণে সদৃশ ঘরে সঙ্গতিশীল বিবাহ যেমন শ্রেয়স্কর, বিহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহও তেমনি সবদিক দিয়ে কল্যাণকর। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ মানে উচ্চ-বর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর মিলন। শাস্ত্রে এর ভূয়সী প্রশংসা ও সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়। বিবাহের মূল সূত্রগুলি এখানেও প্রযোজ্য। তাই, বিধিমাফিক অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হ'লে বিবাহের মূল দুটি উদ্দেশ্য উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন সুষ্ঠুভাবেই সিদ্ধ হ'তে পারে। তাছাড়া, এর আরো অনেক সুফল আছে। একাদর্শ যেমন সমগ্র সমাজের মধ্যে একটা ভাগবত ঐক্যের সৃষ্টি করে, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ তেমনি বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ সৃষ্টি ক'রে পরস্পরকে গভীর আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ক'রে তোলে। তাই, একাদর্শ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হ'ল সমাজ-সংহতির অগ্রদূত।

সমাজের আত্মীকরণ ক্ষমতা ও উদ্বর্দ্ধনশীল বিস্তার

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, সবর্ণে এবং অনুলোমক্রমে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহও প্রবর্ত্তনীয়। তাতে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। তাছাড়া, বিবাহের মূল নীতিবিধিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাইরের সমাজ ও জাতির সঙ্গেও যদি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাতেও কোন বাধা নেই। তাতে সমাজ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। সমাজের আত্মীকরণ-ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহ'লে সমাজ দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া, সমাজ যদি উদ্বর্দ্ধনশীল বিস্তারের পথে না চলে, তাহ'লে তা' বিরুদ্ধ, বিজাতীয় শক্তির দ্বারা শোষিত হ'য়ে, তার খোরাকে পর্য্যবসিত হ'য়ে আত্মবিলয়ের পথে চলে। বৃদ্ধির পথে না চললে ক্ষয়ের পথ অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। এইদিক দিয়ে আমাদের তলিয়ে বুঝে দেখতে হবে। নিষ্ঠা, সাত্বত গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতাকে বজায় রেখে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলতে হবে। উদারতার নামে ইষ্ট,

কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে আত্মক্ষয়ী সর্ব্বনাশা প্রবৃত্তি-স্রোতে গা ঢেলে দিলে চলবে না। লক্ষ-লক্ষ বৎসরের সাধনায় গড়া জীবনের বুনিয়াদকে ভেঙ্গে দেওয়া চলবে না, তাকে আরো সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে চারিদিক থেকে জীবনীয় উপাদান আহরণ ক'রে ও তাকে আত্মীকৃত ক'রে। তাতে আমরাও উপকৃত হব অন্যকে দিয়ে, অন্যেও উপকৃত হবে আমাদের দিয়ে। আর, তাই-ই তো ধর্ম্মদ।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রভাব

উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের শ্রদ্ধা এবং নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের দায়িত্বপূর্ণ দরদ ও মমত্ববোধ সমাজজীবনকে ক'রে তোলে প্রীতিসম্বদ্ধ ও শ্রেয়মুখী। সেখানে কারও কাউকে উপেক্ষা করার বুদ্ধি থাকে না। হীনম্মন্যতার বালাই থাকে না। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সেবার সঙ্কর্ষণের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকেই ঊর্দ্ধমুখী অভিযানে এগিয়ে চলে। সাধনার ধারা হয় সম্পুষ্ট। জোরের দাবীর পরিবর্ত্তে আসে বৈশিষ্ট্যসম্মত পারস্পরিক সেবা, সহযোগিতা। অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন থাকলে সহজেই এই জিনিসগুলি এসে পড়ে। তাতে সমাজ যে কত উপকৃত হয়, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। স্ব-স্ব প্রধান ভাবের পরিবর্ত্তে আসে পরস্পরের পরস্পরকে মর্য্যাদা দিয়ে চলার বুদ্ধি। বিরোধ-ও-সংগ্রামমুখরতার স্থানে আসে মিলন ও একাত্মতাবোধ। সমস্ত সমাজটাই স্ফটিক-সংগঠনে দৃঢ় হ'য়ে সংগ্রথিত হ'য়ে ওঠে। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুর্ব্বলতার দরুণ কাউকে বিধ্বস্ত হ'তে হয় না। একের বিপদে সকলে এসে বুক দিয়ে পড়ে। বিপ্রের তপোবল ও মস্তিষ্কশক্তি, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ও কূটনীতি, বৈশ্যের ধনবল ও আহরণপটুতা, শূদ্রের শ্রমশক্তি ও সেবামুখরতা একাদর্শ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে সুসম্বদ্ধ হ'য়ে প্রত্যেকের পালন-পোষণ ও রক্ষণে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সামাজিক বিবর্ত্তন হ'য়ে ওঠে স্বতঃ।

অনুলোম বিবাহের শুভ পরিণতি

তাছাড়া, বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিচিত্রতর ও সমৃদ্ধতর সংস্কার-সম্পন্ন জাতকের সৃষ্টি হয়, যা' কিনা জাতির পক্ষে অমূল্য সম্পদবিশেষ। আমরা জানি বীজেরই প্রাধান্য। পিতা দেন বীজ। আর, মা তাকেই গ্রহণ ক'রে পরিমাপিত

ক'রে, পোষণ দিয়ে মূর্ত্ত ক'রে তোলেন। তাই মায়ের জৈবী-সংস্থিতি-সম্মত গ্রহণ, পরিমাপন ও পোষণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ঐ বীজসত্তার মূর্ত্তনারও বিভিন্নতা হ'য়ে থাকে। এমনি ক'রে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে মাতৃবর্ণ-অনুযায়ী বিভিন্ন থাকের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। আর, প্রত্যেক থাকের মধ্যেই দেখা যায় ঐ পিতৃ-সংস্কারেরই এক-এক বিশেষ রূপ। যেমন, বিপ্রের মধ্যে আছে সবর্ণসঞ্জাত বিপ্র, বিপ্র ও ক্ষত্রিয়াসঞ্জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত বিপ্র, বিপ্র ও বৈশ্য-সঞ্জাত অম্বষ্ঠ বিপ্র, বিপ্র ও শূদ্রাসঞ্জাত পারশব বিপ্র। এদের প্রত্যেকেরই কিন্তু বিশিষ্টতা আছে। আর, সেই বিশিষ্টতার বিশেষ উপযোগিতা ও অবদান আছে সমাজে। প্রত্যেক বর্ণের বেলায়ই এমনতর। তাই, সমাজ এতে কত ঋদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা' ভেবে দেখতে হবে। আবার, অনুলোম বিবাহের ফলে সম্পোষণী নূতন রক্তের সংমিশ্রণে জাতির মধ্যে তেজ, বীর্য্য, পরাক্রম ও উজ্জীবনী শক্তি গর্জ্জে ওঠে। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—

"সমান বিয়ের সাম্য ধাঁজ
অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁজ।"

নিম্নবর্ণের কন্যার উচ্চবর্ণের উপযুক্ত স্বামীর প্রতি একটা তুখোড় ও তরতরে শ্রদ্ধা গজিয়ে ওঠে। সেই সত্তাপ্লাবী শ্রদ্ধাও সন্তানকে ক'রে তোলে জীবন-প্রাচুর্য্যে বিভান্বিত। একটা সশ্রদ্ধ সম্বেগ তাদের সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে ওঠে। আবার, ঐ উন্নত বীজকে পোষণ দিতে গিয়ে মায়ের বৈধানিক বিবর্ত্তনও সংঘটিত হয় কিছু পরিমাণে। আবার, উন্নত বর্ণের উন্নত-কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবার-পরিবেশের নিবিড় সংস্পর্শে মেয়েরা স্বতঃই উন্নত হ'য়ে ওঠে। এ হেন অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যে পরম কল্যাণকর সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

পুরুষের বহুবিবাহ

সবর্ণ বিবাহ না হ'লে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হ'তে পারে না

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন করতে গেলে স্বতঃই এসে পড়ে পুরুষের বহুবিবাহ। কারণ, শাস্ত্রের নির্দেশ এই যে, প্রথমে পুরুষের সবর্ণ বিবাহ না হ'লে তার অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হ'তে পারে না। সবর্ণ বিবাহ না হ'য়ে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হ'লে মৌলিক বর্ণ ছন্দগুলি ব্যাহত ও লুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে। তা' কিন্তু সমাজের পক্ষে আদৌ হিতকর নয়। সবর্ণসঞ্জাত সাম্য ধাঁজওয়ালা মানুষগুলি সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য। সেই ধারা যদি ছিন্ন হ'য়ে যায়, তবে তা' পরিতাপেরই কথা। সমাজ হারাবে তা' চিরতরে। তখন কেঁদেও কুল পাওয়া যাবে না। তার কাজ আর কাউকে দিয়ে পাওয়া যাবে না। তার ফলে সমাজ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই, আগে চাই সবর্ণ বিবাহ, পরে বিশেষ ক্ষেত্রে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ হ'তে পারে।

বহুবিবাহের যোগ্যতা

যে-সে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ বা বহুবিবাহের যোগ্য নয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—"আমি বলি, পুরুষ যদি উপযুক্ত হয়, ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট ও আপ্রাণ থাকে,—জীবনটা যার একটা incessant (নিরবচ্ছিন্ন) বিজলীরেখার মতন দীপ্তি দিতে-দিতে ব'য়ে যায়, তারই বহুবিবাহ সমীচীন, সমীচীন কেন নিতান্তই দরকার। আর, যারা স্ত্রীতে inclined (আনত) হ'য়ে পড়ে, স্ত্রী-নিষ্ঠা ভূতের মতন যাদের ঘাড়ে চেপে বসে, তাদের একটা বিয়ে তো দূরের কথা, মেয়েদের মুল্লুকেই যাওয়া উচিত নয়। তাদের নিজেদের—sexual satisfaction-এর (যৌনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির) জন্য জাতিটাকে—বর্ণ ও জীবনগুলিকে কি জাহান্নমে দেওয়া উচিত?"

বহুবিবাহের পদ্ধতি

তাহ'লে পুরুষকে হ'তে হবে ইষ্টনিষ্ঠ, সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। সে ইষ্ট ও বৃহত্তর পরিবেশের সেবা নিয়ে কর্ম্মঠভাবে বিভোর হ'য়ে থাকবে। তার জীবন হবে সক্রিয় যোগমগ্ন সাধকের জীবন। নারীলিপ্সুতার ঊর্দ্ধে উঠবে সে। বিবাহের কথা সে ভাববেই না। সে থাকবে তার সাধনা ও কাজ নিয়ে তন্ময় হ'য়ে। আর, গ্রহণযোগ্য কোন নারী, যদি তার প্রতি মুগ্ধ হ'য়ে, তার ইষ্টকাজে সহায়তা করবার জন্য, তার সহধর্ম্মিণী হ'তে চায়, সেখানে ঐ পুরুষ সমীচীন বিবেচনা করলে তাকে গ্রহণ করবে। তাই, বিবাহ ব্যাপারটা নারীর। নারী স্বেচ্ছায় সাত্বত শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে পুরুষকে করবে বরণ। পুরুষ যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সহায়ক মনে করে, তবে তাকে করবে গ্রহণ। এই তো বিবাহের বিহিত পরিক্রমা। অমনতর বিবাহিত পুরুষকে যদি কোন নারী বরণ করে—সপত্নী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, তবে উপযুক্ত বিবেচনা করলে ঐ পুরুষ প্রথমা পত্নীর সম্মতিক্রমে তাকেও গ্রহণ করতে পারে। এই তো বহুবিবাহের ধারা। এ-কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অটুট ও কঠোরভাবে আদর্শপরায়ণ না হ'লে সে কিন্তু বহুবিবাহের যোগ্য নয়।

"এককে নিয়েই ডুবে থাকা
এই তো নারীর ধাঁচ,
বহু-স্ত্রীতে সম-মমতা
মুখ্য পুরুষ ছাঁচ।"

বহুবিবাহ পুরুষ ও নারী উভয়েরই পরীক্ষাস্বরূপ

পুরুষ যদি অটুট ও কঠোরভাবে আদর্শপরায়ণ না হয়, তাহ'লে সে কখনও একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমমমতা-সম্পন্ন হ'য়ে তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে তার একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাই ঠিক নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, বহুবিবাহের উপযুক্ত পুরুষ কোটিকে গোটিক। আবার, কোন নারী যদি বিহিত ক্ষেত্রেও সপত্নীকে সহ্য করতে না পারে, তাহ'লে বুঝতে হবে তার স্বামী-প্রীতির মধ্যে গলদ আছে। সপত্নী-প্রীতিই স্বামী-প্রীতির কষ্টিপাথর। এটা একটা সাধনার ব্যাপার। এই সাধনা নারীকে ক'রে তোলে মহনীয়া। এই ক্ষেত্রে মাৎসর্য্যহীনতা নারীকে দেবীপদবাচ্যা ক'রে তোলে। আমাদের সবকিছুর লক্ষ্যই তো ঐ চারিত্রিক

বিবর্ত্তন। শুধু স্থূল ভোগসুখের জন্যই জীবন নয়। জীবনের লক্ষ্যই হ'চ্ছে পরমপিতার দিকে এগিয়ে যাওয়া, স্বরূপ উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হওয়া। গার্হস্থ্য আশ্রম হ'ল সেই পূর্ণতা-অভিসারী জীবনযাগের পূত যজ্ঞভূমি।

শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহু-বিবাহ জাতি ও জগতের পক্ষে কল্যাণকর

এ-কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে দেবদুর্লভ চরিত্রসম্পন্ন নানা গুণভূষিত কোন পুরুষের যদি বহু-বিবাহ হয় এবং তার বিভিন্ন স্ত্রীর বিশিষ্ট গুণগ্রহণমুখরতা ও প্রেরণাধারার ভিতর-দিয়ে যদি নানা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন সন্ততির আবির্ভাব হয়, তা' জাতি ও জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

নারীর বহু-বিবাহ কেন নিষিদ্ধ?

কেউ-কেউ এ প্রশ্ন ক'রে থাকেন যে, পুরুষের যদি বহু-বিবাহ হয় তাহ'লে নারীর বহু-বিবাহ হ'তে দোষ কী? কিন্তু নারীর দেহবিধান ও মানসিক গঠন এমনতর যে, সে যদি একাধিক পুরুষে আসক্ত হয়, তাহ'লে তার মানসিক স্বস্থতা এবং সুসন্তানের মাতা হওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়ে। নারীর একগামিনীত্ব ও পুরুষের বহুগামিত্বের মূল নিহিত আছে জীববিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, ভ্রূণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও সুপ্রজননবিদ্যার মর্ম্মকন্দরে। তাই, রিরংসার প্ররোচনায় এই প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে কলহ করা বৃথা। এই কথা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে পুরুষ বড়, নারী ছোট, কিংবা নারী বড়, পুরুষ ছোট। ও কথা ওঠেই না। যে যেমন, সে তেমন। প্রকৃতি যাকে যা' ক'রে সৃষ্টি করেছে, সে তাই। ফলকথা, সৃজনধারায় উভয়েই অপরিহার্য্য, একে অপরের অভাবপূরক।

নারীজীবনের সার্থকতা যে মাতৃত্বে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বহুচারিণী নারীর মস্তিষ্ক এবং ডিম্বকোষে এমন একটা অসংলগ্ন বহুমুখিনতার বিশৃঙ্খল ছাপ পড়ে যে তার গর্ভের সন্তান সাধারণতঃ কিছুতেই একমুখী ও সুবিন্যস্ত হ'তে পারে না। অমনতর মেয়েরা প্রায়ই পাগলাটে ঝাঁজের হ'য়ে ওঠে। বুকের মধ্যে তারা একটা জ্বলন্ত নরক ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়। তার আঁচ যার গায়ে লাগে তাকেই ঝলসে দেয়। কোথায় সেখানে উদ্বর্দ্ধন, কোথায় সেখানে সুপ্রজনন? তাই, মেয়েদের বহু বিবাহের কথা ভাবাও পাপ।

বহু-বিবাহের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থনীয় নয়

আবার, বহু-বিবাহের নামে পুরুষের জীবনে কোনমতেই যেন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় না পায়। তাতে আসবে অনাচার, ব্যভিচার। তবে আপদ্ধর্ম্ম ব'লে একটা জিনিস আছে, যেটা মন্দের ভাল হিসাবে বিশেষ ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনার সহিত প্রযোজ্য। কিন্তু আদর্শচ্যুতি আদর্শচ্যুতিই। আদর্শানুসরণের ক্ষেত্রে আমরা যেন কোন গোঁজামিল, ফাঁকিবাজী বা আপোসরফার আশ্রয় গ্রহণ না করি। তবেই মঙ্গলমাল্যে পরিশোভিত হ'তে পারব আমরা।

প্রতিলোম-বিবাহ

প্রতিলোম সংমিশ্রণের কুফল

উচ্চতর বর্ণ বা বংশোদ্ভুত কন্যার যদি নিম্নতর বর্ণ বা বংশোদ্ভুত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়, তাকেই বলে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্রে এই বিবাহকে আর্য্য-বিগর্হিত ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। জীব-জন্তুর প্রজননের বেলায় দেখা যায় যে, সেখানে পুরুষজাতি যদি স্ত্রীজাতির থেকে নিকৃষ্ট হয়, তাহ'লে সেই সংযোগ-সঞ্জাত জীব অতি নিকৃষ্ট স্তরের হয়। এমনকি সেই গর্ভধারিণীও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার উন্নত জননক্ষমতা অনেকাংশে ব্যাহত হয়। আর, এর বিপরীতক্রমে ফল সবদিক দিয়েই শুভ হয়। উদ্ভিদ জগতেও ঠিক এই একই নিয়মই ক্রিয়া করে। উৎকৃষ্ট স্ত্রী-পুষ্পের সঙ্গে যদি নিকৃষ্টজাতীয় পরাগরেণুর সংযোগ হয়, তাহ'লে গাছের ফল খারাপ হয়। তাই ভাল ফলের জাত ঠিক রাখার জন্য, ঐ-জাতীয় ফলের নিকৃষ্ট ধরণের ফলপ্রসবকারী গাছগুলিকে আশপাশ থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সেখানকার নিকৃষ্ট পরাগ-রেণুর সংযোগে উক্ত গাছের ফল খারাপ না হ'তে পারে। শুনেছি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী বা কুকুরীকে নিকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড় বা কুকুর দিয়ে সঙ্গর্ভিত করা দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হয়। এর কারণ হচ্ছে এতে সুপ্রজনন ব্যাহত হয়।

মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে সবচাইতে বেশী সতর্ক হ'তে হবে

জীবজন্তু বা শস্যফলাদির প্রজনন-সম্বন্ধে যদি এতখানি কঠোরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়, তবে মানুষের ক্ষেত্রে যে আরো অনেক বেশী হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে হিন্দুসমাজের বাইরে বর্ণবিধানের ব্যবস্থা না থাকলেও সেখানেও সাধারণতঃ বিবাহের ব্যাপারে কতকগুলি সঙ্গতির উপরে নজর দেওয়া হয়। আবার, বহু অজান মানুষ আছে, যারা প্রবৃত্তি-তাড়িত হ'য়ে যদৃচ্ছা বিবাহ করে। তবে সব দেশেই, সব সমাজেই বিবাহ-সম্বন্ধে কতকগুলি

রীতি, প্রথা ও পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে তা' অনুসৃত হয়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্য হিন্দুদের মত অন্য কোথাও বিবাহের এমনতর সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক বিধান উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে ব'লে আমাদের জানা নেই। বিধান এক জিনিস আর তার অনুসরণ আর এক জিনিস। কোন সুষ্ঠু বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি তা' অনুসরণ করা না হয়, কিংবা তাকে যদি বিকৃত ক'রে তোলা হয়, তবে তার ফল যা' ফলার, তা' ফলেই। বিবাহের বৈজ্ঞানিক বিধান অবহেলা করার ফলেই, জাতি আজ নানাদিক দিয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। বিশিষ্ট মহানদের জন্মের সংখ্যা যাচ্ছে ক'মে এবং জনবাহুল্য ঘটলেও সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক যোগ্যতার মান যাচ্ছে নেমে।

মানবজাতির বহুবিধ সমস্যার মূল কারণ

এর প্রতিকার করতে গেলে চাই বিবাহকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ মানুষের মান যাচ্ছে নেমে। সত্তাবিরোধী ও সমাজ-বিরোধী প্রবণতাগুলি সর্ব্বত্রই আজ উত্তাল হ'য়ে উঠছে। অশ্রদ্ধা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, উদ্দেশ্যহীনতা, অসঙ্গতি, অনৈক্য, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, যোগ্যতাহীন দাবীদাওয়া, কর্ত্তব্যবিমুখতা, দায়িত্বহীন চলন, অস্থিরমতিত্ব, অব্যবস্থতা, মানসিক বিকৃতি ও ব্যাধি, অশান্তি, উত্তেজনা, ধ্বংসাত্মক মনোভাব, ক্ষয়িষ্ণুতা, দরদহীনতা, স্বার্থান্ধতা, ভোগলিপ্সা, আসুরিকতা ইত্যাদি মানবসমাজকে আজ অন্তঃসারশূন্য ক'রে তুলেছে। বাইরের সব চাকচিক্যের আড়ালে মানুষ আজ ভিতরে-ভিতরে ক্ষত-বিক্ষত, দগ্ধ-বিদগ্ধ, যন্ত্রণাকাতর। বহু ঋদ্ধিমান সভ্য দেশে আজ মস্তিষ্কবিকৃতি, মানসিক ব্যাধি, অপরাধপ্রবণতা ও আত্মহত্যার সংখ্যা হু হু ক'রে বেড়ে চলেছে। এর একটা প্রধান কারণ যৌনজীবন ও প্রজননে গোলমাল। মানুষের জৈবী-সংস্থিতি যদি বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হয়, তাহ'লে জীবনটাই তার কাছে একটা বিড়ম্বনা হ'য়ে ওঠে। জীবনটাকে সে উপভোগই করতে পারে না। উপভোগ করবে যে শরীর-মন দিয়ে, তাই-ই যে দিশেহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত। সে যে কী জ্বালা তা' ভুক্তভোগীই জানে।

মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবণতা

মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে শ্রেয়ের কাছে আত্মনিবেদন করা। কোন প্রলোভনে প'ড়ে বা বিভ্রান্ত হ'য়ে সে যদি হীন-পুরুষকে স্বামীত্বে বরণও করে, তার অন্তর্নিহিত সত্তা কিন্তু তার প্রতি বিমুখ হ'য়েই থাকে। জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার অন্তর্জগতে। আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—

"আমার কাছে অনেক পুরুষও খুলে কয়, অনেক মেয়েও কয় তাদের জীবনের কাহিনী। কতকগুলি মেয়ের কাছে শুনেছি হয়তো নীচু পুরুষের সঙ্গে ভাব হয়েছে। পুরুষ খুব আদর-যত্ন করে, কিন্তু উপগতির সময় হঠাৎ সেই মেয়ে পুরুষটাকে লাথি মারে। তার প্রাণের মধ্যে তখন হাহাকার ক'রে ওঠে। তার অন্তরাত্মা আঁৎকে ওঠে। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ ডোবার সময় জাহাজের মানুষগুলির যে অবস্থা হয়, মেয়েটারও সেই অবস্থা হয়। এইভাবেই চলতে-চলতে মাস ছয়েক পরে নাকি sentiment (ভাবানুকম্পিতা)-টা blunt (নিস্তেজ) হ'য়ে ওঠে। তখন আর অত কষ্ট হয় না। তবু কষ্টের ভাব থেকেই যায়। পুরুষটা অতো আদর-সোহাগ করে, তবু কেন এমন হয়? তার মানে তার পূর্ব্বপুরুষরা একযোগে চীৎকার ক'রে ওঠে। সবাই যেন ব'লে ওঠে—'বাঁচাও! বাঁচাও! আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রো না।' তুমি এসেছ তোমার বাবা থেকে, তোমার বাবা তার বাবা থেকে। এইভাবে পারম্পর্য্যানুযায়ী তুমি হ'লে তোমার পূর্ব্বপুরুষের result (পরিণতি)। তাই নীচুর কাছে গেলেই মেয়ের প্রাণ আঁকু-পাঁকু করতে থাকে। বুকে ধড়ফড়ি লেগেই থাকে। শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই। তবু হয়তো অন্য লোভ এড়াতে পারে না, কিংবা উপায় থাকে না, তাই টিকে থাকে। মহান পূজনীয়ের কাছে প'ড়ে কিন্তু মেয়েদের কখনও এমন হয় না—যদি কিনা স্বামী সত্তাপূরণী হয়। অন্য যত অসুবিধাই থাক, তখন সে কত সুখী! কাজকর্ম্ম করছে, গল্প করছে, বেড়াতে যাচ্ছে, বাবুগিরিও একটু-আধটু করছে—হাতে যেন যষ্ঠি পেয়েছে। এই তফাৎ হয় কেন? স্বামীর ঢলাঢলি নেই, হয়তো কঠোরও, তবু প্রাণ ঠাণ্ডা। পুরুষ হয়তো তরকারিও কোটে না, ছেলেও ধরে না, বরং চাপই দেয়। খাটতে হয়, ছুটতে হয় কত, তবু বুক ভরা। কত সময় শাশুড়ী-ননদের কত গঞ্জনা সইতে হয়। কিন্তু শত অত্যাচারেও সে খুশি। কারণ, তার inner being (অন্তর্নিহিত সত্তা) অর্থাৎ অন্তর্নিহিত পূর্ব্বপুরুষ তৃপ্ত। মনে কোন সময় বিরক্তির

ভাব আসলেও, স্বামীর মুখ চেয়ে সব সহ্য করে। কেন সে টানে? কেন সে সয়? কারণ, স্বামীকে নিয়ে তার বুক জোড়া।"

মানসিক সংস্কারের প্রভাব

অনেকেই বলবেন, প্রতিলোম সম্মিলনে স্ত্রীর মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তার কারণ মনস্তাত্ত্বিক। প্রচলিত শিক্ষা, ধারণা ও সংস্কারের ছাপ অন্তরে থাকায় অমনতর হ'য়ে থাকে। ঐ সংস্কারগুলি উড়িয়ে দিলে ঐ সব বালাই থাকবে না। তাছাড়া, নিম্নবর্ণ বা বংশোদ্ভুত পুরুষ যদি শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র, গুণপনা ও যোগ্যতা সব দিক দিয়ে উন্নত হয়, তবে সেখানে সুপ্রজনন ব্যাহত হবে কেন? যা' হোক, প্রচলিত সংস্কারগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে না হয় মনের বাঘের থেকে ত্রাণ পাওয়া গেল। কিন্তু বাস্তব বাঘের বাস্তবতার থেকে ত্রাণ পাওয়া যাবে কি ক'রে?

জনন-বিজ্ঞানের বাস্তব সত্য

কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলি—জননকর্ত্তা হ'ল কিন্তু পুরুষের বীজসত্তা—যা' তার পূর্ব্বপুরুষ থেকে তার ভিতর সংক্রামিত হ'য়ে এসেছে। সে তার ধারক, বাহক ও অছিমাত্র। সে তার উৎপাদয়িতা নয়। তার ব্যক্তিগত সাধনা ঐ বীজসত্তার কাঠামো বদলে দিতে পারে না। ঐ বীজসত্তা-অনুস্যূত জনি-বিন্যাস (gene) যদি রজঃসত্তা-অনুস্যূত জনি-বিন্যাসের (gene) তুলনায় স্বল্প-বিবর্ত্তিত বা স্বল্প-কৃষ্ট হয়, তাহ'লে তার ফলেই আসে জনন-ব্যাপারে বিপর্য্যয়। পুরুষের শুক্রকীট হ'ল গর্ভাধানকারী উপাদান আর তা' আহিত করে নারীর ডিম্বকোষকে। আধানকারী যে, সে যদি আহিত যে তার তুলনায় বিবর্ত্তন-পরিক্রমায় নিম্নতর ও দুর্ব্বলতর হয়, তবে ঐ বিধিবিরুদ্ধ সংযোগ-সঞ্জাত জাতক বিক্ষুব্ধ, অস্থির, বিকৃতিসম্পন্ন ও পরিধ্বংসী হ'য়ে ওঠে। এই হ'ল ঋষির দর্শন। তাই, পুরুষের জৈবী-সংস্থিতি নারীর জৈবী-সংস্থিতি থেকে যেন কোন প্রকারে হীন না হয়। তা' অন্ততঃ সদৃশ বা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর উল্টো হ'লে অন্যান্য জীবজন্তুর বেলায় প্রতিলোম সংমিশ্রণে যে কুফল ফলে, মানুষের বেলায়ও তা' ফলতে বাধ্য। বিজ্ঞানকে মানতে হ'লে এ-কথা না মেনে উপায় নেই।

ঋষির দর্শন ও বিজ্ঞান

তবে সাধারণভাবে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিবর্ত্তনধারায় কার জৈবী-সংস্থিতি ও বীজসত্তা কতখানি উন্নত তা' বোঝা যাবে কী ক'রে? বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় আমরা এ বিষয়ের উপর সাধ্যমত আলোকপাত করতে চেষ্টা করব। জীববিজ্ঞান, বংশগতি, সুপ্রজননবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞান আজও সম্যক পরিপুষ্ট হয়নি। যতটুকু যা' হয়েছে তাও মানুষের ক্ষেত্রে সম্যক প্রযুক্ত হয়নি। এইসব বিজ্ঞানের যা' সিদ্ধান্ত তা' ঋষির দর্শনের অনুকূল বই প্রতিকূল নয়। এইসব বিজ্ঞানের বিহিত উন্নতি যখন হবে এবং তা' যখন মানুষের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হবে, তখন হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পারব ঋষিদের দর্শন কতখানি অভ্রান্ত বিজ্ঞান-ভিত্তিক।

প্রতিলোম জাতকের দেহ, মন ও চরিত্র

প্রতিলোম বিবাহের একটা মস্ত কুফল এই যে, অবিহিত সংযোগের ফলে পিতার গুণ, প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রামিত হ'তে পারে না। শুক্রকীট ও ডিম্বকোষ সমঞ্জসা ও সঙ্গতিশীল না হওয়ায় বীজবৈশিষ্ট্য ও মাতৃধাতু বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে। সন্তানের অন্তর্নিহিত বৈধানিক স্থিতিস্থাপক সংহতিও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে অনেকখানি। দেহবিধানের ঔপাদানিক সমাবেশের অসঙ্গতি ও অসংহতির দরুণ প্রতিলোম জাতক নির্ভর ও বিশ্বাসযোগ্য হয় কমই। তার নিজের মনকে সে নিজে জানেই না। কোন্ প্রলোভনে বা কোন্ চাপের মধ্যে পড়ে যে সে কোন্দিকে বাঁক নেবে তার ঠিক নেই। তাই প্রতিলোমজ সন্তান সাধারণতঃ হয় দুর্ব্বলমনা, খামখেয়ালী, প্রবৃত্তিপরায়ণ, কৃষ্টিবিমুখ, ঐক্যধ্বংসী, অশ্রদ্ধাপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক। বংশটাই নষ্ট হ'য়ে যায়। জাত, সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনের উপর প্রতিলোম বিবাহের প্রভাব

এতে পুরুষ বা নারী কারও জীবনে উদ্বর্দ্ধনও আসতে পারে না। নিকৃষ্টের সহযোগে নারীর সত্তা নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়। এবং পুরুষ নিজেও নারীর সত্তাপূরণী হ'তে না পারায় এবং নারীর সত্তাপোষণী শ্রদ্ধা ও প্রেরণা না পাওয়ায় দিন-দিন

মিইয়ে যেতে থাকে। বিহিতভাবে পরিণীত দম্পতির শিষ্ট যৌনচর্য্যা উভয়ের পক্ষেই প্রাণদ হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যৌনচর্য্যাও আনে অবসাদ ও অস্বস্তি। তাই, অতৃপ্তি ও ব্যর্থতায় তাদের জীবন ভ'রে ওঠে। কোন দিক দিয়েই তারা পরস্পরের কাছে উপভোগ্য ও জীবনীয় হ'য়ে উঠতে পারে না। সাময়িক নেশার ঘোর কেটে গেলে উভয়েরই জীবন হ'য়ে ওঠে হাহাকারময়। তাই, অমিল, অপ্রণয়, অশ্রদ্ধা, কলহ, সন্দেহপরায়ণতা তাদের মধ্যে লেগেই থাকে। বাইরের লোকের কাছে তারা হয়তো কিছুই প্রকাশ করে না। লোকে হয়তো জানতেও পারে না কী নরকযন্ত্রণা ভোগ করে তা'রা। কিন্তু অনুতপ্ত অনেকেই তাদের মর্ম্মন্তুদ স্বীকারোক্তি রেখে গেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণতলে। আমরা সেই বিবরণের উপর দাঁড়িয়েই এ-সব কথা লিখছি।

বর্ত্তমান আইন ও তার সংশোধন

দেশের আইনে যদিও আজ প্রতিলোম বিবাহ স্বীকৃত, তাহ'লেও বিধাতার দলিলে এর স্বীকৃতি মিলবে না কোন দিন। আমরা গণপ্রতিনিধিরাই আইন করেছি আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও রুচিমত। আমরা অভ্রান্তও নই, প্রবৃত্তিজয়ীও নই, সর্ব্বজ্ঞও নই। অস্তিত্বের পক্ষে এটা কত ক্ষতিকর তা' হৃদয়ঙ্গম করলে একদিন আমরাই হয়তো এ আইন উঠিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে দেশের যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে, তার প্রতিকার করার সামর্থ্য তখন আমাদের থাকবে না।

প্রতিলোম বিবাহ সংঘটিত হ'লে কী করণীয়

সেই পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী প্রতিলোম বিবাহকে অসিদ্ধ জেনে, কোথাও প্রতিলোম বিবাহ সংঘটিত হ'লেও, তা' নাকচ ক'রে, সেই কন্যাকে শ্রেয় বরে যদি অর্পণ করা যায়, তাহ'লে তাই হবে ধর্ম্মদ। আর, যেখানে তা' সম্ভব না হয়, সেখানে এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে তাদের কোন সন্তান-সন্ততি না হ'তে পারে। একটা প্রতিলোম সন্তান তার সত্তাঘাতী, পরিধ্বংসী জলুস নিয়ে মানব-সমাজের যে কী বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই। জননবিধান যদি বিকৃত হ'য়ে যায়, তাহ'লে লোকজীবন জীবনীয় ভিত্তিহারা হ'য়ে পড়বে। আমাদের কোন প্রচেষ্টাই তখন আর কার্য্যকরী হবে না। কথায় বলে 'শিরে করলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধবে কোথা?' প্রতিলোম বিবাহ হ'তে

থাকলে ঠিক অমনতরভাবে জাতির শিরে সর্পাঘাত হ'য়ে যাবে। তার প্রতিকারের আর কোন পথ থাকবে না।

বিধি অলঙ্ঘনীয়

অনেকে বলেন, যেখানে সবর্ণ, অনুলোম, প্রতিলোম ব'লে কোন ভেদ নেই সেখানেও তো কত ভালমানুষ জন্মাচ্ছে। আর, আমাদের দেশে এত মেনে চলেই বা কী হচ্ছে? তার উত্তরে আমরা বলব, যেখানে ভাল যা' হচ্ছে—তা' অজ্ঞাতসারে ভালর বিধান অনুসরণ করার ভিতর-দিয়েই হ'চ্ছে। আবার, মন্দ যেখানে যা' হচ্ছে, তা' বিধিকে আশ্রয় ক'রেই হ'চ্ছে। সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহের বেলায়ও বিবাহ-সম্বন্ধে বিচার্য্য প্রতিটি দিকের প্রতি যদি শ্যেনদৃষ্টি না রাখা হয়, তাহ'লে কিন্তু তার ফল ভাল হবে না। এ-কথা যেন সবার বিশেষভাবে স্মরণ থাকে। বহুদিক দেখে-শুনে সবর্ণ বা অনুলোমক্রমে হয়তো একটি বিবাহ হ'ল, কিন্তু পাত্রপক্ষ বা কন্যাপক্ষের বংশে হয়তো মস্তিষ্কবিকৃতির দোষ আছে, সেটা হয়তো লক্ষ্য করা হ'ল না। অনেকদিকের মিল আছে ব'লে এই দোষটা যে নাকচ হয়ে যাবে তা' কিন্তু নয়। তাই, বিবাহ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে কোন খামখেয়ালী করলে বা অজ্ঞতার পরিচয় দিলে তার ফল ভোগ করতে হবে বংশানুক্রমে।

মানব-বিবর্ত্তনের পথ

আবার বলি, সুজনন ও তপস্যার বিহিত ব্যবস্থা না করলে আমরা কিন্তু উন্নত হ'তে পারব না। তাই-ই ঘরে-ঘরে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহিত্য, শিল্প, কলা, দর্শন, ধ্যান, মনন, জ্ঞানবিজ্ঞান ও কর্ম্মের নানা বিভাগে মহান দিকপালদের আবির্ভাব সম্ভব ক'রে তুলবে। তাই-ই আমাদের কুঁড়েঘরে টেনে আনবে ঋষি, মহাপুরুষ ও দেবতাকে, স্বয়ং নারায়ণকে। আজও যে আমাদের দেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মত মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? এই যে আসেন, তার পিছনে জাতির সুচিরসঞ্চিত তপস্যা ও সুজননধারা গোপনে ক্রিয়া করে। সেইটেকে আরো ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে কুৎসিত-সৃজনী প্রতিলোম চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যায়, এবং সৎ-সৃজনী বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ দেশ

তথা দুনিয়াকে দেবলোকে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে। আমরা চাই সেই জৈবী-সংস্থিতি-উৎসৃজনী বিবাহ যা' মানুষকে ঈশ্বরমুখী অর্থাৎ ধারণ-পালন-সম্বেগ-অভিদীপ্ত ক'রে তোলে। ঐ উদ্দেশ্যই হবে আমাদের সবকিছুর নিয়ন্তা। তার পরিপন্থী যা' তা' আমরা কিছুতেই আমল দেব না—তা' কোন প্রলোভনের বশেও না, ভয়ে কাবু হ'য়েও না। এই-ই আমাদের শাশ্বত, সাত্বত অভিযান।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য

বিবাহ-সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাই, প্রতিটি বিবাহ সব দিক হিসাব ক'রে সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতি দেখে এমনভাবে সংঘটিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন অব্যাহত থাকে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করার কোন অবকাশ না ঘটে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে যুক্তি

এ-কথার উত্তরে অনেকে বলবেন—মানুষের বিচারে ভুল হয়ই। তাই, হিসাব ক'রে বিবাহ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও যদি নানা দিক দিয়ে অসুবিধা ও অসঙ্গতি দেখা দেয়, সেখানে সে-ভুলের জের টেনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনকে নষ্ট হ'তে দেওয়ার চাইতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে উভয়ের জীবনকে রাহুমুক্ত হবার সুযোগ দেওয়াই তো শ্রেয়। তখন তারা পুনরায় বিবাহ ক'রে হয়তো সুখী হ'তে পারে এবং সুসন্তানের জনক-জননী হ'তে পারে। স্বামী-স্ত্রীর যেখানে মিলমিশ হয় না, সেখানে উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন দুই-ই তো অসম্ভব। তাই, সে-বিবাহ নাকচ না করাই তো অন্যায়। কথাটা শুনতে যতই ভালো শোনাক না কেন, এর মধ্যে যে কত কী বিপদ নিহিত আছে, তা' ভেবে দেখতে হবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথার কুফল

বিহিত বিবাহের বন্ধনও ছেদন করা যেতে পারে, এমনতর একটা স্বীকৃতি যদি থাকে, তাহ'লে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন কখনও দানা বেঁধে উঠতে পারে না। জীবনপথে সামান্য অশান্তি, অবনিবনা ও অসুবিধার ক্ষেত্রেও স্বামী-স্ত্রী তখন বিচ্ছেদের পরিকল্পনা করতে উৎসাহিত হয়। এতে সহনশীলতা, সহানুভূতি ও ধৈর্য্যের অনুশীলনে অমঙ্গলকে মঙ্গলে পর্য্যবসিত করার দৃঢ়তা ও মনোবল গজিয়ে উঠতে পারে না। গঠনমূলক মনোভাবের পরিবর্ত্তে জাগে ধ্বংসাত্মক মনোভাব। এতে উভয়েরই চারিত্রিক বল ক্ষুণ্ণ হয়। অপরকে সওয়া-বওয়ার মত

শক্তি তাদের থাকে না। তাই, বিবাহ-বিচ্ছেদ ক'রে পুনরায় তারা যদি অন্যত্র বিবাহ করে, সে-ক্ষেত্রে ঐ একই কারণে পুনরায় বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে ঘর গড়াই তাদের পক্ষে মুশকিল হ'য়ে ওঠে। একটা অস্থিরতা, অশান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদের দিন কাটে। কেউ কাউকে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারে না। উভয়েরই মনে একটা আতঙ্ক ও আশঙ্কা লেগে থাকে—কে কখন কাকে ছেড়ে যাবে, তার ঠিক কী? এইসব কারণে নানাপ্রকার মনোবিকারের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। অনেক সময় সন্দেহ-বাতিক মজ্জাগত হ'য়ে ওঠে। শ্রেয়সন্দীপী কর্ম্মোৎসাহ, ক্লেশসুখপ্রিয়তা এবং আশা-উদ্দীপনাও স্তিমিত হ'য়ে আসে। একটা অজানা ভীতি উভয়ের জীবনকে বিকল ক'রে তোলে। তারা কিছুতেই সুখী হ'তে পারে না।

স্বামী বা স্ত্রীর মন হয়তো অন্য কোথাও আকৃষ্ট হ'ল। সে তখন পূর্ব্বের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য নানাপ্রকার অজুহাত খোঁজে এবং একটা কিছু ছুতোনাতা ধ'রে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। এমনতর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এইভাবে সামাজিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা যায় বেড়ে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব যায় ধূলিসাৎ হ'য়ে। পারিবারিক ঐতিহ্য ও কুল-সংস্কৃতি লোপ পেয়ে যেতে থাকে। কারণ, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। গৃহে সেই গৃহিনীর স্থিতি যদি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত টলটলায়মান হয়, তবে গার্হস্থ্য আশ্রম দাঁড়াবে কার উপর ভর ক'রে? এর ফলে সুপ্রজননের বুনিয়াদ যাবে বিধ্বস্ত হ'য়ে। তার ফলে রাষ্ট্র ও দেশের দশা কী হ'য়ে উঠতে পারে সহজেই অনুমেয়।

সন্তানবতী নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পত্যন্তর গ্রহণে ঐ সন্তান-সন্ততির দূরবস্থা

এ তো গেল এদিককার কথা। তাছাড়া, সন্তানের জননী যে, সে যদি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে অন্যত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহ'লে সে-সন্তানের জীবন যে কেমন বিষময় ও অভিশপ্ত হ'য়ে ওঠে, তা' কি আমরা ভেবে দেখেছি? হয়তো সন্তান মায়ের সঙ্গেই রইলো। মায়ের সেই নূতন স্বামীর পরিবারে সেই সন্তানের স্থানটি কী? তার পিতৃপরিচয় কী? কুলগৌরব কী? তার স্নেহের আশ্রয় কোথায়?

পিতামাতা বেঁচে থাকতেও যে সে পিতৃহারা, মাতৃহারা, সর্ব্বস্বহারা। কারণ, যে মা স্বামীকে ত্যাগ ক'রে অপরের অঙ্কশায়িনী হ'তে পারে, তার সন্তানপ্রীতির শুচিতা ও আন্তরিকতা কতখানি তা' কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আবার, মায়ের ঐ নবলব্ধ স্বামীর ঐ সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা কতটা গজাতে পারে, তাও সহজেই বোঝা যায়। ঐ সন্তান হ'ল তার স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীর স্মারক। কাম বা তথাকথিত ভালবাসা চিরকাল ঈর্ষ্যাকাতর। এ-ক্ষেত্রে ঐ পুরুষের ঐ সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ না হ'য়ে বিদ্বিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

আবার, ঐ সন্তান যদি নিজ পিতার কাছে থাকে, এবং তার পিতা যদি কোন স-সন্তান স্বামী-পরিত্যাগিনী বা স্বামী-বর্জ্জিতা নারীকে বিবাহ করে, তবে সেই অবস্থাও তার পক্ষে আদৌ সুখকর ও স্বস্তিদায়ক হয় না। মোটপর, পিতা-মাতা যদি সুনিষ্ঠ না হয়, প্রীতি-সম্বদ্ধ না হয়, সংযত না হয়, শ্রদ্ধার্হ চরিত্রের অধিকারী না হয়, স্নেহপরায়ণ না হয়, সন্তানের জীবন সেখানে হাহাকারময় হ'য়ে ওঠে। এর ভিতর-দিয়ে তার অন্তরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাই তার মনোজগতে নিয়ে আসে বিকৃতি ও অসুস্থতা। সেও তার জীবনে অমনতর ছন্নছাড়া রকমেরই পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। শান্তির নীড় গড়া তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় বংশপরম্পরায় ঐ ধারা চলতে থাকে। সাধারণতঃ অমনতর মানুষ শুভসঙ্গতিশীল সুনাগরিক হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারে না। অন্তর্নিহিত বিক্ষোভের দরুণ সে পরিবার-পরিবেশকেও বিক্ষুব্ধ ক'রে চলে।

দাম্পত্যজীবনে আদর্শপ্রাণতার ভূমিকা

বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নারীর পত্যন্তর গ্রহণ যদি সমাজে চালু হয়, তাহ'লে সতীত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'তে থাকবে দিন-দিন। প্রকারান্তরে ব্যভিচার প্রশ্রয় পাবে। আদর্শ-দম্পতির সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে উভয়ের সাত্বত একপ্রাণতা ও একাত্মবোধ। এই একাত্মবোধের মূলে আছে আদর্শানতি। উভয়ে একযোগে আদর্শের সেবা করবে, পরিবার-পারিপার্শ্বিকের সেবা করবে। সেই জন্যই তাদের গৃহ-রচনা। স্বামী যদি আদর্শভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে, অসৎপথের পথিক হ'য়ে পড়ে, স্ত্রী সেখানে তার আদর্শপ্রাণ সেবা, ব্যবহার, সহ্য, ধৈর্য্য, সহানুভূতি ও অধ্যবসায়ের অমৃত অভিসিঞ্চনায় তাকে সদ্ভাবে অভিষিক্ত ও উন্নীত ক'রে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনবে—এই তো হ'ল সতীত্বের দীপ্ত ব্যঞ্জনা। সতী-স্ত্রীর কাজ হ'ল

স্বামীর অস্তিত্বপোষণী সেবা। অস্তিত্বের ধারক ও পালক পুরুষ হচ্ছেন ইষ্ট। তাই, ইষ্টপ্রাণতা তথা স্বামীপ্রাণতা সতী-স্ত্রীর সহজাত সম্পদ। সেই সম্পদের বলেই সে স্বামীকে যমের মুখ থেকে, শয়তানের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে অস্তিবৃদ্ধির অক্ষয়ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। স্বামী কথার মানেও অস্তিত্ব। তাকে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের অস্তিত্বের কল্পনা করতে পারে না। আবার, স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি থাকবে গভীর মমতা। তাই স্ত্রীকে বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী। নিজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ জেনে সত্তাসম্বর্দ্ধনী সমাদর, সম্ভ্রম, সম্প্রীতি, স্নেহল হৃদ্য ব্যবহার, প্রয়োজন-পূরণ ও প্রবোধনায় স্ত্রীকে সুখসন্দীপ্ত ও সাত্বত-সম্বেগপ্রবুদ্ধ ক'রে তোলাই স্বামীর কর্ত্তব্য ও স্বার্থ। কারণ, স্ত্রী যত পরিতৃপ্ত ও পূতসম্বেগ-দীপ্ত থাকবে, সংসারকেও সে তত বিভান্বিত, সমুন্নত ও লক্ষ্মীমন্ত ক'রে তোলার সামর্থ্য অর্জ্জন করবে। তার দোষত্রুটি স'য়ে-ব'য়ে শুধরে নেওয়ার দায়িত্ব স্বামীর। তাই, বিচ্ছেদের কথা এখানে আসতেই পারে না। দাম্পত্যজীবন একটা সাধনার ব্যাপার। সে সাধনা পুরুষ-নারী উভয়েরই। সাধারণতঃ কোন মানুষই পূর্ণ নয়। কিন্তু পূর্ণতার পথেই আমাদের অভিযান। স্বামী-স্ত্রী একাত্ম হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরকে স'য়ে-ব'য়ে, পেলে-পুষে মালিন্যমুক্ত ইষ্টানুগ মহাজীবনের অভিগমনে উদাত্ত হ'য়ে চলবে—এই হ'ল দাম্পত্যজীবনের অন্যতর সাত্বত অভিপ্রায়। সেই সাত্বত লক্ষ্য বিভ্রষ্ট হ'য়ে যাবে, যদি কিনা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রশ্রয় পায়। আর, তার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সুজননও ব্যাহত হ'তে বাধ্য।

চাই সব সমস্যার শুভদ সমাধান

তবে অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সাময়িক স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারে। বিরোধ মিলনে পর্য্যবসিত হ'তে পারে, অসহনীয়, সহনীয় এমন-কি পরিপোষণী হ'য়ে উঠতে পারে—এ বিশ্বাস আমরা কখনও হারাব না। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, যেখানে দাম্পত্যজীবনের বিরোধ কিছুতেই ঘুচবে না ব'লে মনে হয়েছে, সেখানে পরে আবার সুগভীর প্রীতির অভ্যুদয় হয়েছে এবং তারা সুসন্তানের জনক-জননী হ'য়ে পরিবার-পরিবেশসহ সুখে কালাতিপাত করছে। তাই, মনে এই বোধটি দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই যে বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য। এই বোধ যদি নারী-পুরুষের মর্ম্মকেন্দ্রে সুপ্রোথিত হয়, তবে সাময়িক বিপর্য্যয় ও ঝড়-

ঝাপটাকে অতিক্রম ক'রে মিলনরাগ মধুরতরই হ'য়ে উঠবে। পরিণয়াবদ্ধ জীবনসমুদ্রে সুধা ও গরল দুই-ই আছে। ক্ষণকালীন সংঘাত-সঞ্জাত গরলের সাক্ষাৎকারে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উত্তেজনার বশে আমরা যদি প্রিয়জনকে বিসর্জ্জন দিতে অভ্যস্ত হই, তবে কেউ থাকবে না আমাদের সইতে-বইতে, দুর্দ্দশার পঙ্ক থেকে টেনে তুলতে, গরলজর্জ্জরিত আমাদেরকে সুধাসিক্ত ক'রে তুলতে। বাস্তব-জীবন অতি জটিল ব্যাপার। তাকে দেখতে হবে সামগ্রিকতায়। অবিমিশ্র ভালয় ভরা মানুষ দুর্লভ। আমরা নিজেরাও তা' নই। দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ। তাই, অবাস্তব ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে মাটির সংসারে আমরা যদি একজন নিখুঁত স্বামী বা স্ত্রী লাভের প্রত্যাশায় বিবাহ-বিচ্ছেদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে চলি, তবে আমরা নির্ব্বোধের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে ত্রাণ পেতে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর গিয়ে পড়ব। শুধু পড়ব না—পুড়ব এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে গৃহ, সংসার, বংশধারা, সমাজ, দেশ ও জাতিকেও পুড়িয়ে মারব। তবে এ-কথা আবার বলব, অসিদ্ধ বা বিধি-বিগর্হিত বিবাহ, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে প্রতিলোম বিবাহ কিন্তু বিবাহ ব'লে গণ্য হবার যোগ্য নয়। তাই, তেমনতর বিবাহ সংঘটিত হলেও তা' নাকচ না করাই অপরাধ।

পারিবারিক জীবন

শ্রেয়োমুখিনতার অবদান

সুষ্ঠু বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের ভিত্তির উপরই গ'ড়ে ওঠে আদর্শ পারিবারিক জীবন। উৎসমুখিনতাই হ'ল জীবনের সর্ব্বস্তরে সর্ব্বোত্তম সম্পদ। পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও এ-কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও ইষ্টনিষ্ঠা হ'ল উন্নতির মূল মন্ত্র। স্ত্রীর যেমন থাকবে স্বামীভক্তি, তেমনি চাই স্বামীর উৎস যাঁরা অর্থাৎ স্বামীর পিতামাতা অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ী ইত্যাদির প্রতি অকাট্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা ও সন্তোষবিধান তাই নারীর একান্ত করণীয়। নারী-পুরুষ উভয়েই যদি শ্রেয়োমুখী হয়, তখন তাদের সন্তান-সন্ততিও শ্রেয়োমুখিনতার সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারা স্বভাবতঃই মাতৃভক্ত হয়, পিতৃভক্ত হয়। মাতৃভক্ত ও পিতৃভক্ত সন্তানই প্রকৃত সুখী, সংযত ও মহৎ হয় জীবনে। এমনতর সন্তান কে না কামনা করে? কিন্তু সন্তানকে এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে গেলে পিতামাতার সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা চাই সন্তানের সম্মুখে। পিতা-মাতা উভয়েই যদি শ্রেয়পরায়ণ হন বাস্তবে, তবে তাই দেখে সন্তানও তদ্ভাবে ভাবিত হ'য়ে ওঠে।

বিবাহ, তপস্যাপরায়ণতা ও পারিবারিক ঐতিহ্য

অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, বিয়ে ঠিকমত হওয়া চাই। বিয়ে ঠিকমত না হ'লে স্ত্রী স্বামীর গুণগুলিকে সন্তানে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে না। তাই, বংশধারা যায় নষ্ট হ'য়ে। একটা গোলমেলে বিয়ের ফলে সহস্র-সহস্র বৎসরের সাধনায় গড়া একটা উন্নত পারিবারিক ধারা ব্যর্থ ও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে যেতে পারে। তাই, পরিবার সংগঠনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হ'ল সঙ্গতিশীল বিবাহ। বিবাহ ও তপস্যাপরায়ণতা এই দুটি জিনিস যদি বংশে ঠিক থাকে, তাহ'লে বংশ দিন-দিন উন্নত হ'য়ে চলে।

সমাজকল্যাণকর গুণাবলীর বিকাশে পরিবার

স্ত্রীর শুধু শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখলে চলবে না, স্বামীর অন্যান্য আপনজন যারা, তাদেরও আপন ক'রে নিতে হবে। এমনি ক'রেই কুলবধূ সংসারে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করে। স্বামী-স্ত্রী সর্ব্বত্রই চায় যে তাদের সন্তান-সন্ততি পরস্পর পরস্পরকে দেখুক। কিন্তু তারা নিজেরা যদি স্বার্থপরের মত চলে, আত্মীয়স্বজন ও একান্ত আপনজন যারা তাদের জন্য কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে নারাজ হয়, তবে সন্তান-সন্ততির মধ্যেও ঐ ভাব সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। তারা প্রত্যেকেই হয় একক, বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল। কারও পিছনে কেউ দাঁড়ায় না। প্রত্যেকেই নিজেকে অসহায় বোধ করে। কিন্তু পারিবারিক জীবনে সবচাইতে বড় জিনিস হচ্ছে শ্রেয়কেন্দ্রিকতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক সেবা, সাহায্য, সহযোগিতা, দরদ ও দায়িত্ববোধ। এতে প্রত্যেকেরই মনোবল, ইচ্ছাশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও সহায়-সম্পদ বেড়ে যায়। কারণ, প্রত্যেকে জানে যে সে একক নয়, তার পিছনে আছে তার পরিবার, সে পরিবারের আর পাঁচজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাস্তববন্ধনে শক্তি-সংবৃদ্ধ। এতে পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকেই বেড়ে ওঠে, পরিবারে যোগ্যতর যারা, তাদের সরাসরি স্বার্থ হ'য়ে ওঠে—অযোগ্য যারা, তাদের যথাসম্ভব যোগ্য ক'রে তুলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে দেখে, পরস্পর পরস্পরের জন্য করে। পারিবারিক স্তরে এই পরার্থপরতার অভ্যাসটা রপ্ত হ'লে তা' সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিস্তারলাভ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণের অনুশীলন সুরু হয় পরিবারে। পরিবারস্থ লোকের প্রতি যদি আন্তরিক টান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি গজায়, তাই-ই ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে বৃহত্তর পরিবেশে। দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি ইত্যাদি মহত্তর গুণের বিকাশ হয় ওখান থেকেই।

কুলবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ

পিতৃপুরুষ ও কুলকৃষ্টি সম্পর্কে গৌরববোধ মানুষের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করে। কুলের মহান বৈশিষ্ট্যের প্রতি নিষ্ঠা মানুষকে ছোট হ'তে দেয় না। কুলমর্য্যাদার পক্ষে হানিকর কোন গর্হিত কাজ করতে গেলে তার মনে খোঁচা লাগে। সেইজন্য কুলের সাত্বত ধারা ও গৌরব সম্পর্কে সন্তান-সন্ততিকে ওয়াকিবহাল ও সচেতন করা প্রত্যেক পিতা-মাতার একান্ত কর্ত্তব্য। এর ভিতর-

দিয়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে প্রকৃত আভিজাত্যবোধ। আভিজাত্যবোধ আর জাত্যভিমান এক কথা নয়। এর মধ্যে হীনম্মন্যতার কোন স্থান নেই, আছে সাত্বত আত্মসম্ভ্রমবোধ। আত্মসম্ভ্রমবোধ যার থাকে, সে সকলকেই যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে চলে। প্রতিটি পরিবারে কুলপঞ্জী ও পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পিতৃপুরুষের তর্পণও একান্ত করণীয়। পিতৃ-ভৃতি ও মাতৃভৃতি অর্থাৎ পিতা-মাতাকে নিত্য অর্ঘ্যদান পরম কল্যাণকর। এতে পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি পোষণ পায়। সাত্বত পারিবারিক ঐতিহ্য, প্রথা, পদ্ধতি ও আচার শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিপালন করা ভাল। এর ভিতর-দিয়ে একটা গভীর ভাবানুকম্পিতার উন্মেষ হয়। মানুষের ভিতর যদি যুক্তিবিচার-সমন্বিত সাত্বত ও শিষ্ট নিষ্ঠা, গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা না থাকে, তবে পরিবেশের নানা প্রবৃত্তিরঙ্গিল পরিবর্ত্তনের স্রোতের মধ্যে তার আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়। তথাকথিত যুগের হাওয়া ও অন্তঃসারশূন্য চাকচিক্যের দুর্ব্বার আকর্ষণ স্বভূমি থেকে সরিয়ে তাকে যে কোন্ ভাগাড়ের দিক টেনে নিয়ে যায়, তা সে ঠাওরই করতে পারে না।

পারিবারিক শান্তি অপরিহার্য্য

পারিবারিক শান্তি মানুষের সুস্থ জীবনবিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। পরিবারে যেখানে শান্তি না থাকে, অশান্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্বই যেখানে প্রবল, সেখানে মানুষের শরীর, মন, স্নায়ু ও কর্ম্মশক্তি ভেঙ্গে পড়ে। পারিবারিক জীবনে যারা অশান্তির আগুনে জ্বলে, তাদের মনমেজাজ সাধারণতঃ ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে। তারা যেখানে যায় সেখানেই অশান্তির আগুন ছড়ায়। সমাজের মধ্যে আজ যে সর্ব্বত্র এত দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও অশান্তি, তার অন্যতম কারণ দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের অভাব। এই অবস্থায় অনেকে নানা অবাঞ্ছিত পন্থায় বাইরে শান্তি ও তৃপ্তির সন্ধান করে। এতে কতজনের জীবন যে বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। অনেক অপরাধীর জীবন বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে, তাদের ঘরে সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, স্নেহপ্রীতির আশ্রয় নেই, কোন পবিত্র বন্ধন বা আকর্ষণ নেই। ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারলেই, ছুটে পালাতে পারলেই, দূরে থাকতে পারলেই তারা বাঁচে। এমনতর ছিন্নমূল অবস্থা যাদের, প্রবৃত্তির হাতছানি ও পরিবেশের কুৎসিত প্রভাব তাদের সহজেই কাবু করে। ধীরে-ধীরে তারা তলিয়ে যেতে থাকে কলুষের অতল গহ্বরে।

চাই শান্তি ও সুকেন্দ্রিক বিস্তারপরায়ণতা

আবার, পারিবারিক স্বার্থ ও শান্তিতে ম'জে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের প্রতি বিমুখ হবার দরুণ অনেকের জীবনে ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধির সাধনা খতম হ'য়ে যায়। তাও কিন্তু কাম্য নয়। তা' মানুষকে সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষয়ের দিকে টেনে নেয়। তাই, পারিবারিক জীবনে প্রথম ও প্রধান হওয়া চাই ধর্ম্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টি, যা' কিনা মানুষকে অনন্ত বিবর্দ্ধনের পথে প্রসারিত ক'রে তোলে। ইষ্টই হ'লেন সেই পরম বস্তু, সেই পূত অগ্নি, যাঁকে সংসারের কেন্দ্রদেশে স্থাপন ক'রে আহিতাগ্নি হ'য়ে আমরা নিরন্তর প্রসারতা ও ক্রমোর্দ্ধগমনের পথে এগিয়ে চলতে পারি। নইলে সংসারের সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি দুই-ই আমাদের অধোগতির পথে টেনে নামায়। আমাদের পারিবারিক জীবন কখনও সার্থক হ'তে পারে না, যদি তা' ব্রহ্মচর্য্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় এবং সুকেন্দ্রিক বিস্তারের প্রণোদনা জুগিয়ে তা' আমাদিগকে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের দিকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে।

গার্হস্থ্য আশ্রম ও সেবাধর্ম্ম

অতিথি-অভ্যাগত ও দুঃস্থ পরিবেশের সেবা প্রতিটি গৃহীর বিশেষ কর্ত্তব্য। মানুষকে সমাদর করতে আমরা যেন কখনও না ভুলি। আমরা যেন নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ হ'য়ে উঠতে পারি। সাধ্যমত নরনারায়ণের সেবা যদি আমরা করতে পারি, তাহ'লেই আমাদের গৃহরচনা ও ধনসম্পদ অর্জ্জন সার্থক। এমনি ক'রেই আমরা বিস্তারমুখী হ'য়ে উঠতে পারি। আর, গৃহী-হিসাবে আমরা যদি পরিবেশ ও সমাজের সেবায় সক্রিয় ও দরদী দায়িত্ব গ্রহণ না করি, তবে পারিবেশিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে পারিবারিক অভ্যুদয়ও বিক্ষুব্ধ হ'তে বাধ্য। এ-কথা ভুললে চলবে না যে পরিবার সমাজেরই অঙ্গ। তাই, সমাজকে সেবায় যত সম্বর্দ্ধিত করা যাবে, পারিবারিক বর্দ্ধনাও তত স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার, পরিবারগুলি সেবা ও সামর্থ্যে উন্নত হ'লে, সামাজিক উন্নতিও অবধারিত। পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের অন্যতম পন্থা হ'ল নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল সকলের পরিপোষণী সেবা।

চতুর্ব্বর্গ-সাধন

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্যই গার্হস্থ্য-আশ্রম। ধর্ম্মকে যদি ভিত্তি না করা হয় এবং মোক্ষ অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও ক্ষুদ্র আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে ব্রাহ্মীচলনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়াই যদি আমাদের লক্ষ্য না হয়, তবে শুধু অর্থোপার্জ্জন ও কামনা পূরণের পিছনে জীবনকে বলি দিলে মানবজীবন হ'য়ে ওঠে পশুত্ব-কবলিত, সমাজ-সংসারও তাতে নিম্নগামী হ'য়ে চলে। নিয়ম, নীতি, আত্মোপলব্ধি ও লোককল্যাণকে বিসর্জ্জন দিয়ে যেনতেন-প্রকারেণ নিজের ভোগলিপ্সা পূরণ করাই হ'য়ে ওঠে তখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য। এই যেখানে মূখ্য হ'য়ে ওঠে, মানুষ সেখানে মানুষকে দুঃখ দিয়ে, ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে, মেরে, কেটে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না। এই অবিবেকী পাশব-চলন পৃথিবীকে মনুষ্য-বাসের অযোগ্য ক'রে তোলে, যা' আজকের সমাজে প্রকট। তাই, গার্হস্থ্য-আশ্রমের পরিকল্পনার মধ্যে যদি ধর্ম্ম ও মোক্ষের পুনর্বাসন না হয়, অর্থাৎ একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনের যদি সমীচীন সংস্থাপনা না হয়, তাহ'লে তা' আত্মহননেরই পথ প্রশস্ত করবে দিন-দিন। কেউ টিকতে পারবে না ঐ অবস্থায়। টিকে থাকলে তবে তো অর্থ ও কামের আহরণ ও উপভোগ।

গৃহ হবে চারিত্র্য ও যোগ্যতাসন্দীপী সাধনপীঠ

গৃহীর গৃহই হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির। ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে গড়ে তুলতে হবে প্রতিটি সংসার। সেখানেই মানুষ বাস্তবভাবে আয়ত্ত করবে সদ্‌গুণ, সদভ্যাস, সদ্ব্যবহার ও সদাচার; অর্জ্জন করবে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের সুমহান সম্পদ। তাছাড়া, পরিবারের প্রত্যেকে পারিবারিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যাতে চৌকস, কর্ম্মপটু ও অর্জ্জনক্ষম হ'য়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। যথাসম্ভব প্রতিটি পরিবারে থাকবে একটু কৃষিক্ষেত্র, পশুপালনের ব্যবস্থা, কোন-না-কোন কুটিরশিল্প, ছোটখাট একটু গবেষণার ব্যবস্থা, একটি পাঠাগার, ঠাকুর-ঘর প্রভৃতি। পরিবারের কর্ণধার যিনি হবেন, তাঁর চাই সর্ব্বতোমুখী সজাগ দৃষ্টি ও চলন, প্রয়োজনের আগে প্রস্তুতি, অশুভ ও আপদ-নিরাকরণী ব্যবস্থিতি, দ্বন্দ্ববিরোধকে মিলনে পর্য্যবসিত করার মত বুদ্ধি, বিবেচনা, সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়। পরিবারের কর্ত্তা যিনি, তিনি দেখবেন পরিবারের সবার মধ্যে কেমন

ক'রে প্রীতিসঙ্গতি, একাত্মবোধ, গুণগ্রহণমুখরতা, প্রশংসাপরায়ণতা, সেবাপটুতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, ত্যাগবুদ্ধি, প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি বৃদ্ধি পায়। নিত্য সমবেত প্রার্থনা, পারিবারিক প্রীতিসঙ্গ ও নিত্যনবীন অভ্যুদয়ী সরস আনন্দদায়ক আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজব ও কৃষ্টিতপা অনুশীলন যাতে পারিবারিক জীবনকে উপভোগ্য ক'রে তোলে তার ব্যবস্থাও সমবেত চেষ্টায় করতে হবে। প্রত্যেকটি গৃহ হওয়া চাই বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক সর্ব্বতোমুখী সুকেন্দ্রিক জীবন-চর্য্যার এক-একটি অমৃততীর্থ-স্বরূপ, যেখান থেকে নিয়ত বিচ্ছুরিত হ'য়ে চলবে দেবদুর্ল্লভ চরিত্র ও চলনার দ্যোতনা ও সঞ্চারণা। তখন অমরার অমরবৃন্দও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবেন আমাদের মাটির ঘরে জন্ম নিতে পেরে। পৃথিবী স্বর্গের থেকেও সুন্দর হ'য়ে উঠবে। মানব-সমাজ হ'য়ে উঠবে দেবলোকের চাইতেও দ্যুতিদীপ্ত।

সমাজ-জীবন

সমাজদেহের প্রাণবস্তু

দাম্পত্য, পারিবারিক ও সমাজ জীবন সবকিছুর মূলেই আছে ব্যক্তি। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সমাজের সহযোগিতা বাদ দিয়ে ব্যক্তির জীবন অচল, আবার ব্যক্তিহীন সমাজ অকল্পনীয়। কারণ, বহুব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ। অবশ্য, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি লোক পাশাপাশি থাকলেই যে তাদের নিয়ে একটি সমাজ গ'ড়ে ওঠে, তা' কিন্তু নয়। তাদের ভিতর থাকা চাই একটি যোগবন্ধন। এই যোগবন্ধনই পরস্পরকে প্রীতির-ডোরে আকর্ষণ ক'রে সংহত ক'রে রাখে। আর, সেইটিই হ'ল সমাজদেহের প্রাণবস্তু। সমাজ কথাটির মূলগত তাৎপর্য্যও হ'ল—একসঙ্গে একই অভিমুখে চলা [সম্ + vঅজ্ (গমন) + অ] এই অভিমুখ্য কিসের? খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—সত্তাসম্বর্দ্ধনার, বাঁচা-বাড়ার। তার কারণ, যে যেমনই হোক, ঐ গূঢ় এষণা কাউকে ছাড়ে না। পরমপিতা জীবনসম্বেগরূপে প্রতিটি সত্তায় নিত্য বিদ্যমান। তবে শুধু উদ্দেশ্যের ঐক্য থাকলে হবে না, এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আপূরণী উৎসবিগ্রহ চাই, যাঁর সঙ্গে প্রতিটি ব্যষ্টির যোগাবেগ সংগ্রথিত হ'য়ে সমগ্র সমষ্টি স্ফটিক সংগঠনে সংগঠিত হ'য়ে ওঠে—মেধা, বল, বীর্য্য ও বান্ধব-বন্ধনের ঊর্জ্জী উজ্জীবনে। ঐ উৎস-বিগ্রহ বা আদর্শই হলেন সমাজের প্রাণপুরুষ—ধারণ-পালনী ধাতা—নিত্যনবায়মান শাশ্বত অমৃত প্রস্রবণ।

সমাজ-জীবনে আত্মিক চেতনার প্রতিষ্ঠা

সমাজ-জীবনের সবচাইতে বড় সমস্যা হ'চ্ছে সমাজের সদস্যদের সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী প্রবণতা, প্রবৃত্তি ও চলন। শুধু বাহ্যিক শাসনের সাহায্যে সেগুলিকে দমিত করলে চলবে না। আর, দমনই বড় কথা নয়। প্রতিটি অসামাজিক, অনিয়ন্ত্রিত পশুসুলভ সম্বেগ ও শক্তিকে রূপান্তরিত করতে হবে সমাজ-কল্যাণমূলক, সুনিয়ন্ত্রিত দেবদুর্লভ অসাধ্য-সাধনী গুণসম্পদে। ঐভাবে

রূপান্তরিত হ'য়ে তা' মানবকল্যাণের হেতু হ'য়ে উঠবে ব'লে বিশ্ববিধাতা তার অস্তিত্বকে নাকচ ক'রে দেননি বিশ্ববিধানে। দুনিয়ায় যত হলাহল আছে, তা' যতই ভয়াবহ হোক, এ-কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, তা' অমৃতে পর্য্যবসিত হবার অপেক্ষায়ই তার ধিক্‌কৃত অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। সবকিছুতে চাই শুধু ইষ্টরূপ সোনার-কাঠির পরশ। ইষ্টার্থী বিনিয়োগ ও বিন্যাসে খারাপ আর খারাপ থাকে না। তখন তা' ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পরিবেশের সাত্বত মঙ্গলসাধনে উদগ্র-উন্মুখ হ'য়ে ওঠে।

মানুষের জীবনের প্রধান শত্রু সঙ্কীর্ণ-আত্মকেন্দ্রিকতা। আত্মকেন্দ্রিকতা ব্যষ্টিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে ইষ্ট ও পরিবেশের থেকে। আত্মকেন্দ্রিক যে, সে না হয় ঈশ্বরের, না হয় নিজ সত্তার, না হয় সমাজ-সংসারের। সে সাত্বত বান্ধব হয় না কা'রও, সে বান্ধব হয় তার প্রবৃত্তির, যা' ব্যষ্টি ও সমষ্টির সত্তা-সম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল। এই সত্তাবিরোধী, সমাজবিরোধী বিপর্য্যয়ী মনোবৃত্তির প্রতিকার করতে না পারলে সমাজ কখনও দানা বেঁধে উঠতে পারে না বা অভ্যুদয়ী পদক্ষেপে চলতে পারে না। তার জন্যই প্রয়োজন ব্যক্তিগত জীবনে ইষ্টগ্রহণ ও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া। ইষ্ট হলেন এমন একজন ব্যক্তি, প্রতিটি সত্তার ধারণ, পালন, পোষণই যাঁর জীবনধর্ম্ম। তাঁকে যদি কেউ ভালবাসে—সবার সাত্বত মঙ্গলসাধনে সর্ব্ববৃত্তি ন্যস্ত করা ছাড়া তার পথই থাকে না। ঐ চলন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাঁকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করা যায় না। তাই, ইষ্টপ্রেমী যারা, ইষ্টসেবী যারা, তারা মানবপ্রেমী, মানবসেবী না হ'য়েই পারে না। এমনি ক'রেই তারা বিপুল প্রীতি-সঙ্গতি ও প্রীতি-সংহতির সৃষ্টি ক'রে তোলে।

এই সুকেন্দ্রিক প্রীতি-সঙ্গতি ও প্রীতি-সংহতিই হ'ল সমাজ-সংস্থিতির মৌলিক উপাদান। এই মৌল ভিত্তি যদি সুগঠিত না হয়, তাহ'লে মানুষ কখনও সেই পরিবেশে জীবনটাকে সম্যক উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারে না। কারণ, সমাজ-জীবনে পারস্পরিক প্রীতি, সেবা, সংবর্দ্ধনা, আদান-প্রদান, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, দরদ, বান্ধবতা, গুণগ্রহণমুখরতা, শুভানুধ্যায়িতা, সহনবহনশীলতা, সাহায্যপ্রাণতা যদি প্রবল হ'য়ে না ওঠে, তাহ'লে সেখানে প্রত্যেকের সৌরত-সন্দীপনা বিহিত অনুশীলন ও পোষণ-পুষ্টির অভাবে মিইয়ে যেতে থাকে। তখন জীবনটা হ'য়ে ওঠে যান্ত্রিক-জীবন। যে-জীবন সুকেন্দ্রিক বিস্তারমুখী ভালবাসার ও ভাল করার অতন্দ্র অনির্ব্বাণ

অনুশীলনে চির-তরুণ, নিত্য-নবীন, ব্যাপ্তি-বিশাল, সদানন্দময় ও অফুরন্ত কল্যাণকলদীপী হ'য়ে উঠতে পারত, তা' হ'য়ে ওঠে নিষ্প্রভ, নীরস, জীর্ণ, ক্ষুদ্র, বদ্ধ, বিশ্ববিচ্ছিন্ন ও সার্থকতারহিত। সেখানে কোথায় সে সম্বেগ—যা' জীবনকে অনন্ত বিস্তার ও গভীরতার সাধনায় নিমগ্ন ক'রে তুলবে? এই সঙ্কট থেকে যদি আমরা ত্রাণ চাই, সমাজ-দেহে আত্মিক-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে যদি আমরা প্রাণবন্ত ও সাত্বত বিবর্ত্তনমুখর ক'রে তুলতে চাই, তা'হলে তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ইষ্টপ্রাণতা সঞ্চারিত ক'রে এক কর্ম্মময় দিব্যবোধনার বান ডাকিয়ে তুলতে হবে দেশে। শুধু এ-দেশে নয়, সব দেশে, সমগ্র জগতে।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ধারাবাহিকতা

মানুষের সমাজ একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে ব'য়ে চলে। অতীতের জঠর থেকে জন্ম নেয় বর্ত্তমান, বর্ত্তমান উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ভবিষ্যতে। তাই, সমাজজীবনে একটা সুষ্ঠু ও সচেতন ধারাবাহিকতা চাই, যাতে অতীতের সাধনার সুফল আত্মগত ক'রে তারই উপর দাঁড়িয়ে বর্ত্তমানের বাধা, বিঘ্ন, সমস্যা ও জটিলতার বিহিত সমাধানে ঋদ্ধতর আয়ুধ-সমন্বিত হ'য়ে অনাগতের আমন্ত্রণে এগিয়ে যাওয়া যায় সম্বর্দ্ধনী পদবিক্ষেপে। আদিম গুহাবাসী মানুষ যুগ-যুগ ধ'রে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, বিপদ-আপদ, সঙ্কট-সমস্যা, উত্থান-পতনের উত্তাল আবর্ত্ত অতিক্রম ক'রে আজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বর্ত্তমান স্তরে এসে উপনীত হয়েছে। বাঁচা-বাড়ার তাগিদে তাকে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে বাইরের ও ভিতরের প্রকৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে। সে সংগ্রাম আজও থামেনি, কোনদিনই থামবে না। মানুষের এই অমৃত-আহব চিরন্তন ও অনন্ত। সংসার-সমরাঙ্গনে তার প্রস্তুতিরও শেষ নেই, জ্ঞানেরও শেষ নেই, বিবর্ত্তন-বিবর্দ্ধনেরও শেষ নেই। সৃষ্টির বুকে স্রষ্টার এই তো অনন্ত অপার লীলা।

কৃষ্টি-বিচ্যুতির কুফল

লক্ষ-লক্ষ বৎসরব্যাপী জীবনবর্দ্ধন-বুভুক্ষু এই অবিরাম সংগ্রামই দিয়েছে মানুষকে বিপুল সাত্বত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঞ্চয়। তাই-ই দিয়েছে তাকে ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য। খচিত ক'রে দিয়েছে অভ্যুদয়ী জীবন-চলনার সুসম্বদ্ধ রীতি, নীতি, পদ্ধতি, প্রণালী ও বিধান। পথ ক'রে দিয়েছে জীবন-

প্রবাহের অনিরুদ্ধ গতির। অতীতের সঙ্গে তাই আমাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অতীতই গ'ড়ে তুলেছে আমাদের। আমাদের অস্তিত্বের সেই মূল ভিতের সঙ্গে যদি আমরা যোগহারা হই, তাহ'লে আমরা কিন্তু আর আমরা থাকব না, হ'য়ে পড়ব কিম্ভূতকিমাকার কিছু। আমাদের সমাজসত্তার হবে অপমৃত্যু, সে হারাবে তার বৈশিষ্ট্য, সে হারাবে তার স্বাতন্ত্র্য, সে হারাবে তার ব্যক্তিত্ব, সে হারাবে তার আত্মপরিচয়, সে বিস্মৃত হবে তার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ও দায়। দুনিয়াকে তার কিছু দেওয়ার থাকবে না। দুনিয়া থেকে ভাল যা'-কিছু আহরণ ক'রে আত্মীকৃত ক'রে সে যে সমৃদ্ধ হবে, সে-সামর্থ্যও তার থাকবে না। জীবন-উৎস-সংযোগ-বিচ্ছিন্ন সেই নিষ্প্রাণ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট সমাজ তখন হবে পচন, গলন, বিশ্লিষ্টতা, বিচ্ছিন্নতা, বিলয়-বিলাস ও ভঙ্গুরতার উর্ব্বর ক্ষেত্র। তা' তখন আহার্য্য হবে অপরের। যে-কোন ভাবের ভাবুক হোক না কেন, নিষ্ঠাবান, বৈশিষ্ট্যবান, প্রাণবান, শক্তিমান অন্য সমাজ তাকে আপন খুশিমত ব্যবহার করবে। যে-সমাজ ছিল সত্তাসম্বর্দ্ধনার পূজারী, যে-সমাজ বাঁচাতে পারত সমগ্র মানব-সমাজকে অমৃতমন্ত্রে অভিষিক্ত ক'রে, সে-সমাজ হয়তো প্রবৃত্তির হাতছানিতে ভুলে মরণ-মহোৎসবে মেতে উঠে আত্মগৌরব বোধ করবে। কৃষ্টিগত পরাভব স্বীকারের এই হ'ল উৎকট পরিণতি।

মহত্তর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রচনা

তাই, আমাদের অতীত সাত্বত ঐতিহ্য, প্রথা, কৃষ্টি, আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য যেন আমরা কখনও না ভুলি। তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যেন আমাদের অস্খলিত ও সক্রিয় থাকে। তবেই যা' থেকে আমাদের উদ্ভব, যে সূত্রবাহিতার ক্রম-পারম্পর্য্যে বিশ্বপটে আমাদের আবির্ভাব, সেই সুচিরপ্রলম্বিত উজ্জীবনী প্রাণনতন্তু অচ্ছিন্ন থাকবে। সমগ্র সত্তা দিয়ে আমরা নিয়ত রসপ্রবাহ আহরণ করতে পারব আমাদের সুসমৃদ্ধ, সুসম্পুষ্ট, সুপ্রাচীন, অক্ষয়, অমৃতক্ষরা জীবনমূল থেকে। আমরা চেতন থাকব যে আমরা ঋষি-মহাপুরুষদের সন্ততি। তাঁদের সঙ্গে আমরা শোণিত-সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। সেই স্মৃতি ও চেতনা এই ডামাডোলের মধ্যেও বার-বার ডাক দেবে আমাদের তাঁদের সাত্বত সাধন-পতাকাকে ঊর্দ্ধে উড্ডীন ক'রে বিশ্ববাসীকে অমৃতের তপস্যায় আহ্বান জানাতে। আমরা তখন দেব আর নেব, মেলাব, মিলব, সবাইকে আপন করব, সবার আপন হব—কিন্তু

নিজত্ব খুইয়ে নয়। বরং তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ও আরো ক'রে। অপর কেউ তার সাত্বত বৈশিষ্ট্য হারাক তাও আমরা চাইব না। আমরা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ঐক্য চাইব। কিন্তু একাকার চাইব না। আর, প্রকৃতির মধ্যেও তা' নেইকো। বিশ্ববিধানের সঙ্গে যে সমাজ-বিধান বা সমাজ-ব্যবস্থার মিল আছে, সেই বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ-ব্যবস্থাই আমরা চাইব। যাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চরম আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়, তাই-ই হবে আমাদের কাম্য। বিদিত বেদকে স্বীকার ক'রে, যুগযুগান্তের অভ্রান্ত সাধনায় অর্জ্জিত সুপরীক্ষিত শাশ্বত জীবনীয়-সম্পদ ও ভিত্তিভূমিকে অটুট রেখে মহত্তর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রচনায় ব্রতী হ'য়ে চলব আমরা।

রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার সমন্বয়

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, আদর্শনিষ্ঠ রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার সমন্বয় যদি না হয় তাহ'লে সমাজ কখনও স্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত উন্নতি ও বিস্তারের পথে চলতে পারে না। জীবন ও জগৎ গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের দৌলতে সারা জগৎ আজ প্রত্যেকের ঘরের কাছে এসে ধরা দিচ্ছে। বহু সমাজ, বহু সভ্যতা, বহু সংস্কৃতি, বহু বাদ ও বহু ভাব-সংঘাতের অমোঘ প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আজ নিয়ত চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও দিশেহারা ক'রে তুলছে মানুষকে। তাই, বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে, বাইরের চাকচিক্যে ভুলে, হ্যাংলা হীনম্মন্যতা ও দাসসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা যদি আমাদের স্বকীয়তা বিসর্জ্জন দিয়ে পরানুকরণপ্রিয়তায় মত্ত হ'য়ে উঠি, তাহ'লে তাতে কিন্তু আমাদের মহতী বিনষ্টি। যা' আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করেছি। আবার, আত্মস্থ থাকার সাধনায় ব্রতী হ'তে গিয়ে আমরা যদি যুগোপযোগী জীবনীয় পরিবর্ত্তন ও গতিশীলতাকে মেনে নিতে না পেরে চলমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি, তাহ'লেও আমাদের অস্তিত্ব হবে বিপদসঙ্কুল। তাই, চাই নিষ্ঠানন্দিত সমন্বয়। সারা জগতের নৈকট্যের দরুণ সমগ্র মানব-সমাজের মনোজগতে আজ যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তিকর ভাব-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে, তাই বোধহয় এক অচিন্তিতপূর্ব্ব মহাসমন্বয়ী সমাধানের অগ্রদূত হিসাবে ক্রিয়া করবে মানব-ইতিহাসে। সঙ্কট যখন প্রকট হয়েছে, তখন সঙ্কটমোচনী শক্তিও প্রত্যক্ষীভূত হবে আমাদের সমক্ষে—এ আমরা অবধারিত ব'লে ধ'রে নিতে পারি।

বর্ণাশ্রম

সামাজিক উত্তরাধিকার ও জৈব উত্তরাধিকার

মানুষের জীবনে আছে দুই রকমের উত্তরাধিকার। একটি হ'ল সামাজিক উত্তরাধিকার অর্থাৎ পূর্ব্বগামীদের প্রচেষ্টা ও প্রতিভাসঞ্জাত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কলা, সমাজব্যবস্থা, জীবনচর্য্যা, রীতি, নীতি, প্রথা, সংস্কৃতি, শিক্ষাধারা প্রভৃতি। আর একটি হল দেহগত, মনোগত ও গুণগত উত্তরাধিকার। আমাদের পিছনে আছেন আমাদের পিতৃপরম্পরা। তাঁদের অবিনশ্বর বীজধারাই পুরুষানুক্রমে বংশের ভিতর-দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। বংশগতির বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ ও বিকাশশীল রাখার জন্য সঙ্গতিশীল বৈধীবিবাহের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। যা' হোক, জীববিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রতিটি মানুষ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এক বিশেষ জনি (gene) বিন্যাসের জীয়ন্তমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অগণিত জনির সমবায়ে গ'ড়ে উঠছে প্রতিটি মানবদেহ। কিন্তু কোন দুটি মানুষের জনি-সমাবেশ অবিকল এক ও অভিন্ন নয়। প্রত্যেকটি সমাবেশই অনন্য ও অদ্বিতীয়। একই পিতা-মাতার বিভিন্ন সন্তানের মধ্যেও তাই কত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ, তাদের শরীর, মন, পারিবেশিক পরিস্থিতি, প্রীতিসঙ্গতি ও ভাবভূমি বিভিন্ন সন্তানের জন্মদানকালে একই স্তরে, একই সুরে ও একই ঘাটে বাঁধা থাকে না। তার দরুণ পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত জনিগুলির পরম্পরাক্রমিক বিন্যাস ও সমাবেশের তারতম্য হয় বিভিন্ন সন্তানের জৈবী সংগঠনে। ঐ জনিগুলিই হ'ল গুণ ও শক্তির বাহক। এবং ওগুলি যার ভিতর যত সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ রকমে সঞ্চারিত হয়, তার উপর দাঁড়িয়ে বিহিত অনুশীলনে গুণ ও শক্তিও হ'য়ে ওঠে তত সুসঙ্গতিশীল অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরণী ও কার্য্যকরী।

জন্মগত সম্ভাব্যতা ও পরিবেশ

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, জন্মগত জনিবিন্যাস অর্থাৎ বৈধানিক সংস্থিতিই হ'ল মানুষের প্রধান সম্পদ। তাই-ই সূচিত করে তার সংস্কার, ঝোঁক-সম্বেগ, গুণপণা ও কর্ম্মশক্তির সম্ভাব্যতা। অবশ্য পারিবেশিক সহায়তা, সম্পোষণা ও প্রণোদনা ছাড়া এর কোন কিছুই কার্য্যকরী হ'তে পারে কমই। এই সহায়তারও আবার রকমারি আছে। একজন হয়তো প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জন্মেছে। সে যদি জীবন-সাধনার পথে নানা বাধা, বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় তবে ঐগুলিও তার শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক ছাড়া পরিপন্থী হবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, পারিবেশিক প্রভাব আমাদের অন্তর্নিহিত জন্মগত সম্ভাব্যতার স্ফুরণে সহায়তা বা প্রতিকূলতা করতে পারে। কিন্তু ঐ জনিজাত বিশেষ সম্ভাব্যতা যদি কারও থাকে তবে পারিবেশিক সুযোগের অপ্রতুলতা সেই সম্ভাব্যতাকে কখনও নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে না। যদিও বংশপরম্পরায় তা' অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত থাকতে পারে। ব্যত্যয়ী বিবাহের ফলে যে অনেক কিছু বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যেতে পারে, সে-কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি।

শিক্ষা, জীবিকা ও বিবাহের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

আবার, একজনের জনিগত সম্ভাব্যতাকে অনুধাবন না ক'রে বা তার সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন না ক'রে তাকে বাইরে থেকে খেয়ালমত যতই শিক্ষা, সাহায্য, সুযোগ, সুবিধা ও উৎসাহ দেওয়া যাক না কেন, তাতে যে ঐজাতীয় সম্ভাব্যতার সৃষ্টি হ'তে পারে না, এ-কথাও সুনিশ্চিত। কারণ, যে সূক্ষ্ম জৈব উপাদানগত সংগঠনকে আশ্রয় ক'রে যে গুণ ও ক্রিয়ার অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব হ'তে পারে, জন্মগত সেই মৌল উপাদানই যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে উক্ত গুণ ও ক্রিয়াশীলতা উদ্ভিন্ন ক'রে তোলার চেষ্টা বৃথা। কোন গুণ বা ক্রিয়াশীলতা মানুষের ভিতর হাওয়ায় ঝুলে থাকে না। তার পিছনে থাকে তদ্বাহী ঔপাদানিক সংস্থিতি যাকে বিজ্ঞান জনি ব'লে অভিহিত করেছে। এই জনি আবার বংশানুক্রমিকতার অবদান। তাই, প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত কাঠামো, সংস্কার, বৈশিষ্ট্য, গুণপনা, সম্ভাব্যতা, রকম, স্তর ও পর্য্যায় অবধারণ না ক'রে সব মানুষ সমান এই ধুয়ো ধ'রে একঢালাভাবে সবার শিক্ষা, কর্ম্ম, জীবিকা বা বিবাহের

ব্যবস্থা করতে গেলে তাতে একটা বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি হবে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি মানুষের সহজাত জৈবী-সংস্থিতি, বৈশিষ্ট্য, সংস্কার ও প্রকৃতিকে নির্ণয় ক'রে, কে কী এবং তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন কী তা' জেনে ও বুঝে নিয়ে, আবার কার দ্বারা কোন্ ক্ষেত্রে কোন্‌ভাবে সমাজের কোন্ বিশিষ্ট প্রয়োজন দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে পরিপূরিত হ'তে পারে তা' অবধারণ ক'রে এবং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অবিকৃতভাবে সমৃদ্ধতর ছন্দে কিভাবে সন্ততিক্রমে বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হ'য়ে চলতে পারে, তা' অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ ক'রে তবেই ঐ-সব ব্যাপারে হাত দিতে হবে। এই বিজ্ঞানদৃষ্টি যদি আমাদের না থাকে, তবে শুভবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতবশতঃ আমরা শিব গড়তে গিয়ে বানর গ'ড়ে বসব।

বর্ণের তাৎপর্য্য

প্রকৃতপ্রস্তাবে, জগতের যা'-কিছুই বিশিষ্ট, প্রকৃতির মধ্যে কোন দুটো জিনিসই সবদিক দিয়ে হুবহু সমান নয়। ঐ বৈশিষ্ট্যের পিছনে আছে জন্ম বা উদ্ভবগত নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তনের পার্থক্য-যা' আকারিক বিভিন্নতায় অভিব্যক্তি লাভ করে। এই জন্মগত সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে গুণগত ও কর্ম্মগত বৈশিষ্ট্য। তাহ'লে জন্ম, গুণ ও কর্ম্ম এক অখণ্ডসূত্রে গ্রথিত, যদিও শিষ্ট পারিবেশিক পোষণ ও অনুশীলনের যথাযথতায় বা অভাবে গুণ ও কর্ম্মের সম্ভাব্য অভিব্যক্তির ইতরবিশেষ হ'তে পারে। যদিও প্রত্যেকটি মানুষের সহজাত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য আলাদা, তাহ'লেও সমজাতীয় বৈধানিক সংস্থিতিসম্পন্ন অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ে প্রধান কয়েকটি গুচ্ছ সমাজে রচিত হয়েছে। এই গুচ্ছগুলিকে বলে বর্ণ। চতুর্ব্বর্ণ যেমন সমাজের চারটি বিভাগ, চতুরাশ্রম তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের চারটি অধ্যায়। বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তাদের নামকরণও হয়েছে ভিন্ন। বর্ণ মানে রঙ। প্রত্যেক বর্ণের নাম দিয়ে বোঝা যায় তার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের জৈব-সংস্থিতি, জৈব-সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত মৌলিক রাগরঞ্জনা কেমনতর।

প্রকৃতিসঙ্গত কর্ম্মব্যাপৃতির ফল

বংশবাহিত আদ্য বীজধারানিহিত আদিম রাগরঞ্জনাই সৃষ্টি করে মানুষের

সত্তাজড়িত আগ্রহ বা ঝোঁক। একই পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন মানুষকে ছেড়ে দিলে প্রত্যেকেই কিন্তু তার ভিতর-থেকে গ্রহণ করে তার আগ্রহ ও পছন্দমতন। সবাই যে সমভাবে এক দিকে আকৃষ্ট হয়, তা' কিন্তু নয়। এর মূল কারণ ঐ জন্মগত ঝোঁক বা আগ্রহ। এই-ই তার জীবনের মূল সুর। ঐ সুরের সঙ্গে সাত্বত সঙ্গতি বজায় রেখে যদি সে চলতে পারে, তবেই তার জীবনে আসে সার্থকতা, মনে, প্রাণে, অন্তঃকরণে জাগে স্বস্তি, তৃপ্তি, শান্তি, সুস্থতা ও স্বস্থতার অনাবিল মধুর অনুভূতি। তাই, মানুষের জীবনে চাই সুকেন্দ্রিক, বৈশিষ্ট্যসম্মত, সত্তাপোষণী, লোককল্যাণকর কর্ম্মব্যাপৃতি। তার মননযন্ত্র মস্তিষ্ককোষ, স্নায়ু, পেশী, সবকিছুর মধ্যেই থাকে ঐ কর্ম্মের প্রতি ক্ষুধার্ত্ত আগ্রহ। তাই, ঐ কর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদন তার সত্তাকে জোগায় এক গভীর প্রাণদ রসদ। যার লোভে সে জাগতিক অনেক দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ ও বঞ্চনাও হাসিমুখে বরণ ক'রে নিতে পারে। অনেক প্রলোভন ও গর্ব্বেপ্সার হাতছানিকে হেলায় তুচ্ছ করতে পারে। কোন ক্ষোভ, ঈর্ষা বা হীনম্মন্যতা তার মনকে আক্রমণ করবার অবকাশ পায় কমই, তার বুক থাকে ভরা সুখে, সন্তোষে, আত্মপ্রসাদে। আজ যে দুনিয়াময় মানুষের এত অসন্তোষ, দাবীদাওয়া ও বিক্ষোভ, তার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যেমন বর্ত্তমান, আর একটি মহৎ কারণ হচ্ছে—খুব কম সংখ্যক মানুষই আছে যারা আজকের এই অবৈজ্ঞানিক কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তাদের বিধি-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিসঙ্গত কাজে নিয়োজিত হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রকৃতিসঙ্গত কর্ম্ম যদি কেউ পায় এবং সেই কর্ম্মে তন্ময় হ'য়ে কেউ যদি কর্ম্মজনিত সুখের সন্ধান পায়, সে যে কতবড় পাওয়া, তা' বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এখনও এই বাজারে যে কিছু-কিছু মানুষকে দেখা যায়, যারা অর্থ-মান-যশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে যোগমগ্ন ধূর্জ্জটির মত অটল নিষ্ঠাভরে সমাজ-কল্যাণকর সাধনায় অতন্দ্রভাবে নিমগ্ন হ'য়ে মহাসুখে কাল কাটিয়ে দেয়, তাদের পিছনে যেমন আছে গভীর ইষ্টনিষ্ঠ এক-তৎপরতা,—তেমনি আছে বিধিদত্ত সত্তাসঙ্গত ও প্রকৃতিসঙ্গত কর্ম্ম ধারাকে আবিষ্কার করার সৌভাগ্য। বেশীর ভাগ মানুষ সহজাত সংস্কার সম্মত কর্ম্মের সন্ধান পায় না, তাই জলছাড়া মাছের মত হাইফাই ক'রে বেড়ায় আর অন্তরের হাহাকার, শূন্যতা, শুষ্কতা ও ব্যর্থতাবোধকে দূর করতে চায় প্রবৃত্তি-তোষণী অন্তহীন তৃষ্ণার পিছনে ছুটে।

আবার, প্রকৃতিগত কাজ নিয়ে মানুষ যেখানে মগ্ন থাকে, সে নিজেও যেমন

জীবনটাকে উপভোগ করে, তার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বও তেমনি বৃদ্ধি পায়। তার দ্বারা সমাজও বিশেষভাবে উপকৃত হয়। তাই, অর্থ, বিত্ত, মর্য্যাদা ইত্যাদি দিক দিয়ে সে খাটো থাকে না। কিন্তু ঐ ধান্ধায় তাকে লালায়িত হ'য়ে ঘুরতে হয় না। তার যোগ্যতার অবদানই যুগপৎ তাকে ও সমাজকে ক'রে তোলে লাভবান।

ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক পরিপূরণশীলতা

তাই, বীজ-সংক্রমিত বৈশিষ্ট্যানুগ গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের সাত্বত স্বার্থকে সলীল ক'রে যদি সমাজকে সুবিন্যস্ত ক'রে তোলা যায়, তা' ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তা উভয়ের পক্ষেই যে পরম মঙ্গলকর, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের সঙ্গে সেখানে হয় শুভ মেলবন্ধন। সেখানে ব্যক্তির ও সমাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগ করবার কিছু থাকে না, সমাজেরও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুযোগ-অভিযোগ করবার কিছু থাকে না। প্রকৃত-প্রস্তাবে, পরিবেশ বা সমাজও কতকগুলি ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত। এই ব্যক্তিগুলি যাতে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, পরিপোষক ও পরিপালক হ'য়ে উঠতে পারে, তার জন্য প্রধান প্রয়োজন হ'চ্ছে তাদের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, শক্তি ও স্বার্থবোধের সাত্বত, সুধী সুনিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু নিয়োজন। আর, সুনিষ্ঠ ইষ্টীচলন ছাড়া তা' যে কেন সম্ভব নয়, সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই নানাদিক থেকে বিশদভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। তাই পুনরুল্লেখ এড়িয়ে আমরা সংক্ষেপে শুধু এই কথাই বলব যে, বর্ণাশ্রম মানে ইষ্টবিধৃত বর্ণাশ্রম। নইলে, বর্ণাশ্রম প্রাণহীন জীর্ণ আচারেই পর্য্যবসিত হবে। আমরা বর্ণাশ্রমের গুণাগুণ সম্বন্ধে যত কথা আলোচনা করব, পাঠক যেন ধ'রে নেন যে তার সঙ্গে কর্ম্মমুখর অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। আমরা যদি অগ্রগতি চাই, তবে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে গ্রহণ করতেই হবে। ঐ সঞ্জীবনী বিবর্ত্তনী শক্তিকে অস্বীকার ক'রে কেউ যদি অবিহিত রকমে বর্ণাশ্রম পরিপালন ক'রে চলে, তাহ'লে সে যে খুব একটা পরম শ্রেয়ের অধিকারী হবে তা' বলা চলে না। কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

বর্ণাশ্রমের প্রধান ভিত্তি তিনটি

বর্ণাশ্রমের প্রধান ভিত্তি তিনটি। প্রথমটি সাত্বত আচারসমন্বিত সদ্দীক্ষা,

দ্বিতীয়টি বিহিত বিবাহ, তৃতীয়টি বর্ণোচিত জীবিকা। সদ্দীক্ষা বলতে বোঝা যায় অধুনাতন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মান সদ্‌গুরু, অবতার-মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তমের দীক্ষা। বলা বাহুল্য, একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান প্রকৃত সদ্‌গুরু যাঁরা, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সশ্রদ্ধ প্রীতিসঙ্গতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন গুরুর অনুগামীদের মধ্যেও যাতে অনুরূপ অচ্ছেদ্য বান্ধব-বন্ধনের সৃষ্টি হয়, সে-দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কাউকে ছেড়ে কেউ নয়, সবাই মিলে এক—এমনতর সর্ব্বাত্মক ঐক্যবোধ ফুটে ওঠা চাই সাত্বত চেতনার উন্মেষ নিয়ে। আর, সেইটিই হ'ল সদ্দীক্ষার অন্যতম অবদান। সদ্দীক্ষার নামে যদি মানুষ যত্রতত্র দীক্ষা নিয়ে খুশি থাকে, তাহ'লে কিন্তু হবে না। আবার, যথাস্থানে দীক্ষা নিয়েও যদি নিষ্ঠানন্দিত অনুসরণ ও অনুশীলন না থাকে, তাহ'লেও হবে না। আর, যদি কেউ দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনই বোধ না করে, তা' তো আরো ভয়াবহ ব্যাপার। তার মানে সে তার নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল, সদাচঞ্চল, অনিয়ন্ত্রিত মনকে গুরুপদে বরণ ক'রে তার অধীনতা স্বীকার ক'রে চলছে। যা' হোক, একজনের বিবাহ ও জীবিকা যদি মোটামুটি ঠিকও থাকে, অথচ যদি সদ্দীক্ষা ও তার অনুশীলনের ব্যাপারে তার গোলমাল থাকে, তাহ'লেও তার বর্ণাশ্রম-প্রতিপালন নিখুঁত, সম্পূর্ণ ও বিহিত হবে না এবং ঐ পথ দিয়েই ক্রমে-ক্রমে গলদ ঢুকতে থাকবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে। বলাবাহুল্য, উপরি-উক্ত ঐ তিনটি বিধানের যেটিই উল্লঙ্ঘিত হবে, তার ফল বিপর্য্যয়কর হ'য়ে দাঁড়াবে সমাজের পক্ষে।

সদ্দীক্ষা

সদ্দীক্ষাকে অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে ইষ্ট-হিসাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করার ভিতর-দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে আসে প্রবৃত্তিগুলির সুনিয়মন, ধৃতিপোষণী চলন, সহানুভূতি, সেবাবুদ্ধি, সংহতি, শক্তি ও সম্বর্দ্ধনা। অবশ্য, একদিনেই যে এগুলি রূপ নেয়, তা' নয়। তবে দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে নিষ্ঠাসহকারে অনুশীলন করতে করতে সদভ্যাস সুগঠিত ও বদ্ধমূল হ'য়ে ওঠে, ঐ সদভ্যাস কালে-কালে আবার শুভ সংস্কারে পরিণত হয়। ঐ সংস্কার আবার যখন সত্তায় গ্রথিত হয়, তখন তা' সঙ্গতিশীল পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে সন্তানে সঞ্চারিত হবার উপযুক্ততা লাভ ক'রে। তাই, যুগ-যুগ ধ'রে সাধনা ক'রে ঐ সুকেন্দ্রিকতার পীঠস্থান ক'রে তুলতে হবে সমাজমঞ্চকে। ঐটিই হ'ল

সমাজকল্যাণের আদিম অপরিহার্য্য সম্পদ। মানুষের জীবনে সক্রিয় সুকেন্দ্রিকতারূপ বৈভব যদি থাকে, তবে মৃত্যুর বুক চিরেও সে অমৃত আহরণ করতে পারে, আবার ঐ জিনিসের অভাবে প্রবৃত্তি-তাড়নার হিল্লেয় প'ড়ে তার সুখসম্পদ দুঃখ-বিপদের আবাহক হ'য়ে উঠতে পারে। দক্ষতা ও যোগ্যতা মঙ্গলের হোতা না হ'য়ে দানবীয় ধ্বংসলীলার সংসৃজনে সপরিবেশ নিজের নিধনকে অনিবার্য্য ক'রে তুলতে পারে। শিবহীন দক্ষযজ্ঞের পরিণতির নিদর্শন পুরাণ ও ইতিহাসের পাতায়-পাতায় যেমন ছড়িয়ে আছে, তেমনি আছে ঊর্জ্জীভক্তির পরাক্রম-প্রবুদ্ধ অসাধ্যসাধনী রচনাত্মক সংগঠনের বিস্ময়কর গৌরবগাঁথা। তাই, কারও কোন অবস্থায় উল্লাসে আত্মহারা হবারও কিছু নেই, আবার হতাশায় গা ঢেলে দেবারও কিছু নেই। জগতে সবার সর্ব্বাবস্থায় প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিস হ'ল বিরামবিহীন, নিষ্ঠানন্দিত সক্রিয় ইষ্টীতপ। ঐ ধৃতিভূমিতে দৃঢ়স্থিত হ'য়ে বৈশিষ্ট্যানুগ ছন্দে চলতে হবে, আমাদের বিশ্বপরিবেশের সেবার যাগপ্রদীপ জ্বালিয়ে।

বর্ণবিধানের উপযোগিতা

পুরুষ-পরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত সহজাত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও তদনুগ সঙ্গতিসমন্বিত বংশানুক্রমিক জীবিকা—এই হ'ল বর্ণ-বিধানের দিগ্‌দর্শনী নিদর্শন। প্রত্যেকটি শিষ্টজাতক সমাজের এক অতুলনীয় সম্পদ। তার সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার এক বিশেষ ভূমিকা আছে সমাজে, তার বিশেষ কিছু করবার ও দেবার আছে মানবজাতিকে, যা' অন্য কাউকে দিয়ে হবার নয়। সে হিসাবে ঘৃণাবিদ্বেষ-জর্জ্জরিত তথাকথিত জাতিভেদের সঙ্গে বর্ণবিভাগের কোন সম্পর্ক নেইকো। জাতি কথাটি ইংরেজী race বা Ethnic group-এর বাংলা প্রতিশব্দ। সে-হিসাবে সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজ আর্য্যজাতিরই অন্যতম শাখা। বর্ণবিধান মানবমণ্ডলীর এক বিজ্ঞান-ভিত্তিক পর্য্যায়ীকরণ, যার ভিতর-দিয়ে বোঝা যায় সৃষ্টিচক্রে লোকযাত্রা নির্ব্বাহে কোন্ বিশিষ্ট প্রয়োজন-পূরণের জন্য কার অবস্থিতি। তাই এটা একটা নূতন উদ্ভাবন নয়, বরং বিশ্ব-প্রকৃতির সর্ব্বত্রনিহিত স্বতঃক্রিয়াশীল সত্যের আবিষ্কার এবং মানবসমাজের গঠন ও পরিচালন-ব্যবস্থায় তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। প্রত্যেকেরই তার মত ক'রে কিছু-না-কিছু যোগ্যতা আছে। প্রতিটি ব্যক্তি ও শ্রেণীর সেই যে

প্রয়োজন-পূরণী যোগ্যতা ও দক্ষতা, তার কিন্তু অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে অন্য সবার সত্তা ও স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য। এক বর্ণের বিশিষ্ট সেবা বাদ দিয়ে অন্যদের জীবন-পরিক্রমা বিকল হ'য়ে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্ত্তে। এমনি প্রতি পরস্পরের। বর্ণবিধান এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে কোন কোন শ্রেণীর শ্রেণীকে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই। বিভিন্ন বর্ণ পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পর স্বার্থান্বিত। এই পরিস্থিতিতে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সেবা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্দ্য নিতান্ত স্বাভাবিক। এর বিপরীত প্রবণতা যেখানে দেখা গেছে তাকে অজ্ঞতাজনিত বিকৃতি ব'লেই ধ'রে নিতে হবে। তা' বর্ণ-বিজ্ঞানের কোন অঙ্গ নয়কো। বর্ণবিধান চেয়েছে প্রতিটি শ্রেণীকে, প্রতিটি ব্যক্তিকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সমাজে অনন্য, অসাধারণ ও অসামান্য মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে, বিশ্ববিধানের মধ্যে তার যোগ্যস্থানটুকু, বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মটুকু চিহ্নিত ক'রে দিতে, যেখানে তার কেউ জুড়ি নেই, যেখানে সে একক, অদ্বিতীয়, যেখানে তার দেবদক্ষ মঙ্গলহস্তের সহযোগিতাপূর্ণ স্পর্শ ছাড়া বিশ্বচরাচরে বিশৃঙ্খলার বন্যা ব'য়ে যেতে পারে। বিশ্বস্রষ্টা প্রতিটি মানবকে যে অতুল গৌরবে অধিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন, তারই ছন্দানুক্রমে বর্ণবিধান ইষ্ট ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিশীল সাত্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভাবন ক'রে ব্যষ্টিমহিমাকে অমর ঔজ্জ্বল্যে নিত্য উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে প্রয়াস পেয়েছে।

বৃত্তি-অপহরণ নিষিদ্ধ কেন?

বর্ণবিধানে প্রত্যেকের পক্ষে তার বর্ণোচিত কর্ম্মছাড়া অন্য কোন কর্ম্ম দিয়ে জীবিকা আহরণ করা নিষিদ্ধ। কারণ, যার যে-কাজ প্রকৃতিসিদ্ধ তার সেই কাজই করা ভাল। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করতে যাওয়া মানে শক্তির অপচয় করা, নিজেকে ও সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। বর্ণগত কর্ম্ম যেমন বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি অর্থনীতি ও সমাজ শৃঙ্খলার দিক দিয়েও বিশেষ কার্য্যকরী। তাই বর্ণাশ্রমী সমাজে এক সময় বেকার সমস্যা বা অসাধু, হৃদয়হীন প্রতিযোগিতা বলে কোন কথা ছিল না। অপরের বৃত্তি-অপহরণ তখন পাপ ব'লে গণ্য হ'ত। আপদ্ধর্ম্ম ছাড়া একের বৃত্তি অপরে গ্রহণ ক'রে সামাজিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য নষ্ট করতে পারত না। আপদকাল অন্তর্হিত হ'লেই প্রত্যেককে আবার তার বর্ণোচিত বৃত্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হ'ত। এর উদ্দেশ্য এই যে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের

বর্ণোচিত কর্ম্ম ও সেবার সমবায়েই সমগ্র সমাজ সুস্থ, স্বস্থ ও প্রগতিমুখর থাকতে পারে। কোন একপ্রকারের কর্ম্মদক্ষতা ও সেবাজনিত পোষণ থেকে যদি সমাজ বঞ্চিত হয়, তবে সেই দিক থেকে সমাজ অতোখানি দুর্ব্বল ও সঙ্গতিরহিত হ'য়ে থাকে। তা' পরিণামে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বাত্মক প্রস্তুতি ও বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। ঐ রন্ধ্রপথ দিয়েই পরে আসে সাম্যসঙ্গতিহারা, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিরোধী, একদেশদর্শী অভিভূতি-প্রবণ, খণ্ডিত, ব্যত্যয়ী বোধ ও চলন। তার ক্রমপরিণতিতে আসে অযোগ্যতা, অসহযোগিতা, বিভেদ, বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, পরমুখাপেক্ষিতা, পরাধীনতা প্রভৃতি।

বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য

এইসব বিপদ এড়িয়ে চলবার জন্যই দ্রষ্টা সমাজ-বিজ্ঞানীগণ বাস্তবতার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এমনতর স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিকল্পনা সমাজজীবনে প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন, যাতে সহজাত যোগ্যতা ও সংস্কার-সমন্বিত চতুরাশ্রমপালী বিভিন্ন শ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতায় সমগ্র সমাজ সর্ব্বতোমুখী অভ্যুদয় ও কল্যাণের অধিকারী হ'তে পারে। ইষ্ট, ব্যষ্টি, পরিবেশ, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীববিজ্ঞান, দেহবিজ্ঞান, বংশগতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, ধনবিজ্ঞান, জনননীতি, দক্ষতার সংসৃজন, সুসমঞ্জস উৎপাদন ও বন্টন, বৈশিষ্ট্যপোষণী সেবা পরিবেশন, যোগ্যতার ক্রমাধিগমন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সমাজ-শাসন, সামাজিক শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, শক্তি ও সংহতি, কাঞ্চনকৌলিন্য-নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্যভিত্তিক সামাজিক মর্য্যাদা ও ন্যায়বিচার, ক্রমবিবর্ত্তন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয়-সাধন, শ্রেণীহীন সমাজ বা শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে শোষণহীন সেবামুখর প্রীতিপরায়ণ বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের সংগঠন, জীবিকা ও প্রকৃতিগত সঙ্গতি, সত্তাপোষণী ব্যবস্থিতি, অসৎনিরোধী পরাক্রম, জীবনসংগ্রামের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট সচেতন প্রস্তুতি, নিরাপত্তাবোধ, জৈবী বীজ ও মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ-সাধন, প্রত্যেকটি সদ্‌গুণকে মানবসমাজে বংশপরম্পরায় চিরপ্রবহমান ক'রে রাখার পদ্ধতি, জ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবনশীলতা, ত্যাগ, তপস্যা, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, সাত্বত আচার, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার যুগপৎ অনুশীলন, ব্রহ্মতেজ, হৃদয়বত্তা,

সাহস, শৌর্য্য, ক্ষাত্রবীর্য্য, কুশাগ্রবুদ্ধি, কল্যাণব্রতী কুশল-কৌশলী কূটচাতুর্য্য, নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার জাগরণ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার, অর্জ্জনপটুতা, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, উপস্থিতবুদ্ধি, সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যা, সক্রিয় সুকেন্দ্রিক বৃদ্ধিমুখিনতা ও বিস্তার-পরায়ণতা, দশবিধ সংস্কার, নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ ইত্যাদি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কত-কিছুর একসূত্রসঙ্গত জীবন-বর্দ্ধন-বিভুতিসম্পন্ন সংহতি সমাবেশ যে হয়েছে বর্ণাশ্রমের বিপুল পক্ষপুটে তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

বর্ণাশ্রম এবং ইতিহাস ও পুরাণ

বর্ণাশ্রম-বিধৃত সমাজের অভ্যুদয়ের যে চিত্র আমরা পাই বিদেশী পর্য্যটক মেগাস্থিনিস, হিউয়েন সাং ও আরিয়ান প্রভৃতির বিবরণে তাতে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। রামরাজ্যের নানা তথ্য তো আমাদের জানাই আছে। কিন্তু সব চাইতে ভাল লাগে যখন দেখি এক ব্রাহ্মণ তার সন্তানের অকালমৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করছেন—কেন তোমার রাজ্যে অকালমৃত্যু হয়? সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সভ্যতা কোন্ স্তরে গিয়ে দাঁড়ালে একক ব্যক্তি এতখানি অধিকার ও ন্যায়বিচারের দাবী নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের দরবারে এবং সেই মানুষকে পাগল ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি, রঘুকুলতিলক মহীপাল শ্রীরামচন্দ্র পাত্রমিত্র-সভাসদসহ সশ্রদ্ধ আগ্রহে তার অভিযোগ নীরবে কান পেতে শুনেছেন এবং পরে কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

জাতকের গল্পে আমরা পাই প্রবাসী পিতার কাছে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বহন ক'রে আনার পর, এমন-কি সেই বর্ণিত মৃত পুত্রের অস্থি দেখাবার পরও পিতা অটল। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে তাঁর বংশে কারও অকালমৃত্যু হ'তে পারে। কারণ, তাঁরা বংশপরম্পরায় বিধিবদ্ধভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ ক'রে চলেছেন সেই বিজ্ঞান ও অভ্রান্ত শাস্ত্রানুশাসন যাতে বংশে অকালমৃত্যুর অনুপ্রবেশের সমস্ত রন্ধ্র রুদ্ধ হ'য়ে যায়। পরে অবশ্য পরীক্ষাকারী তার মিথ্যা বিবরণদানের কারণ ব্যক্ত করেন। উভয়েই তখন মহাখুশি। এই আমাদের আর্য্য-বর্ণাশ্রমী সমাজের নমুনা। তাঁদের নিষ্ঠা ও জ্ঞানসমন্বিত দুর্ব্বার কর্ম্মাভিযানের সম্মুখে অদৃষ্ট অন্তর্হিত, শয়তান ভীতত্রস্ত। বাস্তব কর্ম্মদক্ষতার দিক দিয়ে যখন ভাবি তখন দেখি, এই সেদিনও ঢাকাই মসলিনের কত সমাদর ছিল সারা

পৃথিবীতে। ম্যাঞ্চেষ্টারের কল চালাতে তাই এদেশের হাজার-হাজার তাঁতীর বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়েছিল বিদেশী শাসকদের। জীবনের কোন্ বিভাগে নেই উৎকর্ষের নিদর্শন? ইতিহাসের পাতায়-পাতায় বিকীর্ণ আছে তার স্বর্ণস্বাক্ষর। সে-সব কথার অবতারণা ক'রে রচনার কলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

বর্ণাশ্রমের প্রাণশক্তি

সবচাইতে বিস্ময়কর লাগে যখন ভাবি,—কালের করাল কুটিল প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে সহস্র-সহস্র বৎসর ধ'রে এই সমাজ কেমন ক'রে তার মহিমামণ্ডিত অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এত স্খলন, পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আজও যে এই সমাজের বুকে মহা-মহা বিশ্বেবরেণ্য মনীষী, চিন্তানায়ক, কর্ম্মবীর, জ্ঞানী, গুণী, সাধক, বিজ্ঞানী, শক্তিধর জননেতা এবং পরমপ্রাজ্ঞ ভুবনপাবন প্রেমিক পুরুষের আবির্ভাব দেখা যায়, তা' এই সমাজের অন্তর্নিহিত পুঞ্জীভূত, প্রবল ও বিপুল প্রাণশক্তি ও পুণ্যবলেরই পরিচয় বহন করে। অবশ্য, সমগ্র সমাজকে যদি সমুন্নত ও সুগঠিত না করা যায়, তাহ'লে শুধু মহানদের গর্ব্ব নিয়ে থাকলেই আমাদের চলবে না।

সাম্য

সমগ্র সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা ভাবতে গিয়ে অনেকে তথাকথিত সাম্য ও ধনবৈষম্যের অবসানের পরিকল্পনা করেন। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ যেখানে অসমান, সেখানে একঢালা সাম্যের ব্যবস্থাপনা কতদূর সার্থক হ'তে পারে, তা' ঠিক বোঝা যায় না। সাম্য মানেই হচ্ছে প্রত্যেকের বিশিষ্ট রুচি, সত্তাসঙ্গতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাল ও মিল রেখে মানানসই ক'রে স্বতন্ত্র, যথোপযুক্ত ও শোভন রকমে পোষণ-পরিপোষণের বিলিব্যবস্থা করা। এর মধ্যে আছে আবার স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা ও পরিস্থিতির বিবেচনা। মা বাড়িতে পাঁচটি সন্তানকে ঠিক একই রকম খেতে দেন না। একজনের হয়তো ডাল পেটে সয় না, তার জন্য একটু ঝোল ক'রে দেন। আনাজপত্র বেশী না থাকলে ঝোল হয়তো একজনের মতই করেন। অন্য সবাই ঝোল পায় না। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা কিন্তু মায়ের সন্তানপালী বাৎসল্যের সাম্যসুন্দর অভিজ্ঞান। যে ঝোল পছন্দ করে তারই কিন্তু জ্বর হ'লে তাকে বার্লি খেতে হয়। এই হ'ল প্রকৃতিদত্ত সত্তাপোষণী বিধান। সমাজের মধ্যেও চাই এমনতর ব্যবস্থা। তার জন্য চাই

ঋষির নায়কত্ব, যাঁর মধ্যে নেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা বা শোষণবুদ্ধি, বরং আছে লোকস্বার্থী সমদৃষ্টি এবং যোগ্যতা-ও-বৈশিষ্ট্যবর্দ্ধনী সত্তাপোষণী সেবা পরিবেশনের সূক্ষ্ম জ্ঞান। ঐ মানদণ্ড-অনুযায়ী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-ও-প্রয়োজন পূরণকল্পে অসমান অথচ শিষ্ট বন্টনবিন্যাস হ'লে তাতে প্রত্যেকেরই প্রকৃত কল্যাণ হবে।

সাম্যবাদ

নইলে মানুষের হীনম্মন্যতা ও অশিষ্ট লালসাপ্রসূত যোগ্যতাহারা অন্তহীন দাবীদাওয়া ক্রমাগত মেটাতে থাকলে তাতে যে তাদের উপকার করা হবে, তা' কিন্তু নয়। এর ফলে হয়তো ব্যক্তিগত বা যৌথ মালিকানাওয়ালা যাবতীয় উৎপাদনী ও অর্থনৈতিক সংস্থা একদিন অচল অবস্থা প্রাপ্ত হবে। হ্যাঁ! হ'ল। তারপর তো সেগুলির মালিক একজন হবে। সে মালিক কে? গালভরা কথায় বলা হবে। সে-মালিক জনগণ, সমাজ বা রাষ্ট্র। সেখানে ধনিক-শ্রমিক বলে কেউ থাকবে না, শোষক-শোষিত ব'লে কেউ থাকবে না। কিন্তু তা' না থাকলেও তার পরিবর্ত্তে গজিয়ে উঠবে রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাসী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যক্তিগতমতামত-ও-অধিকার বিলোপকারী সর্ব্বগ্রাসী ক্ষমতা-সম্পন্ন একনায়কতন্ত্রী একটি দল। সেই দলের হাতে সবার সাত্বত স্বার্থ যে নিরাপদ থাকবে, তার কি কোন মানে আছে? তাদের হাতেও তো মানুষ নিপীড়িত হ'তে পারে। অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তারাও তো মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে। আর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই যেখানে বিলুপ্ত, সেখানে রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হ'য়ে, রাষ্ট্রভজা হ'য়ে, রাষ্ট্রের হাতে কলের পুতুলের মত হ'য়ে, তাদের শেখান বুলি কপচিয়ে বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে ঐ যান্ত্রিক ছাঁচে ঢালাই ক'রে সেইভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে যদি সুখের পায়রা হ'য়েও থাকা যায়, তাতে মানবসত্তার গৌরব না অগৌরব হয়, বিবর্ত্তন না অপবর্ত্তন হয়, তা' কি ভেবে দেখবার মত কথা নয়? আমরা জানি 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'। আর, এই কৃষ্ণদাসত্বের ভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত তার সত্তাগত স্বাধীনতার স্বর্ণদেউল। তাই-ই তার স্বভূমি, তাই তার জীবনলীলার অমৃত-অঙ্গন। কোন রাষ্ট্র যদি মানুষকে তার এই স্বাধিকারভূমি থেকে বঞ্চিত ক'রে তার সমগ্র সত্তার অখণ্ড আনুগত্য দাবী করে—তার সাত্বত স্ফুরণকে ব্যাহত ক'রে,—তবে তা' আশু যত সমস্যারই সমাধান করুক না কেন,

তার ফাঁদে পা দেওয়া মানে জৈব প্রয়োজন-সাধনের যূপকাষ্ঠে আত্মিকতাকে বলি দেওয়া। মানুষ যদি আত্মিক বিকাশের বিনিময়ে জগতের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্যও লাভ করে, সেটা তার পক্ষে আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ? সম্পদ না বিপদ? সুখৈশ্বর্য্য কার জন্য? সে তো মানুষেরই জন্য। কিন্তু মানুষ যদি রাষ্ট্রের লৌহ নিগড়ে প'ড়ে হারিয়ে ফেলে তার দিব্য স্বরূপের সত্য পরিচয়, তার সামগ্রিক জীবনদর্শনের ভাস্বর চেতনা, সেই তো তার মহতী বিনষ্টি, পরম পরাজয়। ফলকথা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যষ্টির সর্ব্বতোমুখী সাত্বত পরিপূর্ত্তিসাধনে সহায়তা করবার জন্য, এই শিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন করার অধিকার তার নেই।

মানুষের জীবন অনেক বড় জিনিস। কোন উগ্র প্রয়োজনের বশে ঐকদেশিক অভিভূত দৃষ্টি নিয়ে জীবন-সমস্যার সমাধান হবার নয়। তাতে সাময়িক যদি কোন সমস্যার সমাধান হয়ও, সে-সমাধান হয় একদেশদর্শী ও প্রতিক্রিয়াশীল। জীবন সম্বন্ধে চাই সম্যক দৃষ্টি, তার ভিতর-দিয়েই আসে সামগ্রিক সমাধান। আর চাই, দোষের সংস্পর্শে দুষ্ট না হওয়া। কারও দুর্ব্যবহার বা অত্যাচার-অবিচারের ফলে যদি আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে প্রতিহিংসাকামী হই, সে-কামনা হয়তো চরিতার্থ হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী সাত্বত সমাধান হয় না। ঐ মনোভাবই তরঙ্গায়িত হ'য়ে চলে উভয়পক্ষের মধ্যে। সুযোগমত অপরপক্ষও আবার ভীমবেগে লাগে।

সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবিধান

তাই, যেখানেই পরিবেশের একদলের দুকর্ম্ম, অপরাধ, অবিচার ও অজ্ঞতার ফলে অপর দলের ন্যায্য স্বার্থ ব্যাহত হয়, মনে ক্ষোভ, বিদ্বেষ ও ব্যথার সঞ্চার হয়, সেখানে প্রবৃত্তি-নির্দ্দেশিত প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না ক'রে প্রবৃত্তির উর্দ্ধে সাত্বত-ভূমিতে নিত্য-অবস্থিত সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বংসহা, নিখিলমঙ্গলবিধায়ক আত্মস্থ কোন পুরুষের শরণাপন্ন হ'য়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা ভাল। আবার,.অন্যায়কারীদেরও উচিত ঐ অমনতর কোন সমাধান-মূর্ত্তির জীয়ন্ত সান্নিধ্যে উপনীত হ'য়ে তাঁর অনুশাসনমত প্রায়শ্চিত্ত করা, অপরপক্ষের ক্ষতিপূরণ করা, বিহিত আচরণে তাদের হৃদয় জয় ক'রে তাদের বান্ধব ক'রে তুলতে চেষ্টা করা। এমনটা যদি হয়, তবে তার ভিতর দিয়েই বিদ্রোহবর্জ্জিত সমন্বয়ী সমাধান হ'তে পারে।

ধনতন্ত্রবাদ

কিন্তু সমগ্র জগতের জনমত যে আজ ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'য়ে উঠেছে, তাকে যদি দরিদ্রদের হীনম্মন্যতা ও ঈর্ষ্যাপ্রসূত অভিযান ব'লে এড়িয়ে যাওয়া বা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহ'লে সেটা হবে বেকুবী। এর বাস্তব কারণ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন এবং ধনিকদের অপরিমেয় ধনলোলুপতা, মানবতাবিরোধী মুনাফাবাজী ও শোষণক্ষুধাই এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। মানুষের প্রধান স্বার্থ যে মানুষ, এ-কথা যতদিন মানুষ না বোঝে, ততদিন সে স্বার্থের নামে নিজের এবং অপরের ক্ষতির পথই প্রশস্ত ক'রে চলে। মানুষকে দিয়েই মানুষের উপার্জ্জন। সেই মানুষ সে শ্রমিকই হোক বা ক্রেতাই হোক, সে যদি শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর অদূরদর্শিতা ও দুষ্টলোভের ফলে নিঃস্ব, হতবল ও মৃত্যুমুখী হ'য়ে ওঠে, তার ফলে ধনিকের উপার্জ্জন কি শেষ পর্য্যন্ত ব্যাহত হবে না? মানুষকে বাঁচিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা, বড় ক'রে বড় হওয়ার চেষ্টা করা—তার মধ্যেই একাধারে নিহিত আছে ধর্ম্ম ও অর্থ। এই সাত্বত অর্থনীতিকে অনুসরণ করতে গেলে চাই স্বচ্ছ দীর্ঘদৃষ্টি এবং প্রবৃত্তি-অভিভূতিহীন সুস্থ, সর্ব্বতোমুখী চিন্তাশক্তি ও বোধবিভূতি। আর, তা' লাভ করতে গেলে চাই অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠা। আর, তা' থাকলে মানুষ কখনও নিজের ও অপরের সাত্বত স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করে না। সাত্বত-স্বার্থ-বিরোধী আচরণ শক্তিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এটা দুর্ব্বলতা, নির্বুদ্ধিতা ও শয়তানসেবিতারই নিদর্শন। তাই, জগতের কল্যাণের জন্য পদে-পদে প্রধান প্রয়োজন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার। মানুষ যদি নিঃশেষে ইষ্টানুশীলনে নিরত ও তন্ময় হ'তে না পারে, তবে তার অন্তররাজ্য খালি প'ড়ে থাকে না, সেখানে যে আধিপত্য বিস্তার করে সে হ'ল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য ক'রে মানুষকে যে কখন কোন্ নেশায় মত্ত ক'রে তোলে, তার কোন ঠিক নেই। জীবননাশা অর্থনেশা প্রবৃত্তিরই এক শয়তানি কারসাজি। ওটা ব্যাধি ও বিকৃতি। তাই, শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, নির্লোভ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ প্রয়োজন বোধ করলে অমনতর ধনিকের ধন মাত্রামত কেড়ে নিয়ে যথাযোগ্যস্থানে বণ্টন ক'রে দিতে পারেন।

বর্ণাশ্রমী সমাজে বৈশ্যের ধর্ম্মার্থে অর্থাৎ ইষ্ট ও পরিবেশের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী প্রয়োজনপূরণার্থে দান অবশ্যপালনীয় কর্ম্ম। এই দান না করলে তাকে সমাজের

কাছে দণ্ডিত হ'তে হ'ত। বর্ণাশ্রম সঞ্চয়কে উৎসাহিত করেছে, কিন্তু সে-সঞ্চয় জীবনের সেবার জন্য। এই সমাজই বলেছে—"তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্ যাবৎ ভ্রিয়তে জঠরং। অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনদণ্ডমর্হতি।" লোভকে সংযত করার অনুশাসন প্রদত্ত হয়েছে সর্ব্বত্র। কিন্তু সাত্বত যোগ্যতা ও অর্জ্জনপটুতাকে ক্রমবৃদ্ধিপর ক'রে তোলার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে—আর তা' সপরিবেশ বাঁচা-বাড়ার জন্য। পরিবেশকে ক্ষীণ ক'রে, হীন ক'রে তাদের মাথার উপর পা তুলে দিয়ে প্রভুত্ব করবার জন্য নয়। সেই শোষণমূলক কুৎসিত প্রয়াস যেখানে হয়েছে রিপুজয়ী ব্রাহ্মণ সেখানে হস্তক্ষেপ করেছেন, বিহিত শাসনে সংযত করেছেন তাকে। দরকার হলে ক্ষত্রিয়ের সাহায্য নিয়েছেন তিনি।

দারিদ্র্য

প্রয়োজনপীড়িত লোভতাড়িত দরিদ্রের উপর কিন্তু ঐ অধিকার দেওয়া হয়নি। দারিদ্র্য একটা গুণ নয়। দারিদ্র্যও একটা ব্যাধি। তা' গুণ ও যোগ্যতাগত দৈন্যই সূচিত করে। যোগ্যতার বলে অন্যকে শোষণ করাও যেমন পাপ, অযোগ্যতাবশতঃ শোষক কর্ত্তৃক নিজেকে শোষিত হ'তে দেওয়াও তেমনি পাপ। আবার, কারও অযোগ্যতা বা আলস্যের মাত্রাধিক্য যদি এতখানি হয় যে, সে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য সমাজের কাছ থেকে যা' নেয়, তার তুলনায় তার করা ও দেওয়া নিতান্ত নগণ্য, সেক্ষেত্রে প্রকারান্তরে সেও সমাজকে শোষণ করে। কোনদিক থেকেই বিহিত পোষণহীন শোষণ ভাল নয়। তাতে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় এবং সমাজজীবনে পারস্পরিক সত্তাপোষণী সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় বিশৃঙ্খলা, দোষদর্শন, দ্রোহবুদ্ধি এবং অসহযোগিতার সৃষ্টি হয়। অবশ্য রোগব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈবদুর্ব্বিপাকজনিত অপারগতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ যেখানে পরনির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে, সেখানে সমাজের মানবতাসম্মত কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে তাদের দেখা, সেই নিরুপায় নির্ভরতাকে যদি শোষণ হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে তা ভুল হবে।

সমাজ-শাসন

তবে সমাজের জনন, শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা এমন থাকা দরকার যাতে কেউ অযোগ্য, সমাজবিরোধী মনোবৃত্তিসম্পন্ন, স্বার্থান্ধ, কর্ম্মহীন, কর্ম্মবিমুখ,

দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে না থাকে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে যুগপৎ এই সব দিকেই নজর ছিল। গণতন্ত্রের নামে অসমীচীন, অবৈজ্ঞানিক বিবাহ ও বিকৃত জননকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে তাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর যে জগদ্দল পাষাণভারের সৃষ্টি হবে তা' বহন করা বিধাতারও দুঃসাধ্য। সৎশিক্ষা নিতে ও সমাজের প্রয়োজনপূরণের উপযুক্ততা অর্জ্জন করতে যে বৈধানিক সঙ্গতির আবশ্যক, তা' যেখানে অবর্ত্তমান, সেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। আজকের সভ্যসমাজের তাই ভাববার দিন এসেছে এর মূল গলদ কোথায়, যার দরুন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্ব্বত্র মানুষ দিন-দিন ভোগসর্ব্বস্ব, উন্মার্গগামী ও সমাজবিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে, বহুস্থানে যোগ্যতা ও সততার মান যাচ্ছে নেমে। তাই, গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কিছু হবে না। বর্ণাশ্রম ব্যক্তি-স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করে কিন্তু সে-স্বাধীনতা যদি প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় ব্যক্তির ও পরিবেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সত্তাসম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে, সেখানেই তাকে রূঢ় হস্তে প্রতিরোধ করে। তাই, বর্ণাশ্রমে নেই অদীক্ষিত থেকে নিজের খেয়ালমত চলার স্বাধীনতা, নেই বিধিবিজ্ঞান-বিগর্হিত জন্মগত বৈধানিক বিন্যাস-ও-বৈশিষ্ট্য-বিরোধী যথেচ্ছ শিক্ষাগ্রহণ, বিবাহ ও বৃত্তি-নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা।

বর্ণাশ্রম ও প্রগতি

আজকের সমাজ মধ্যযুগে ফিরে যেতে পারে না। বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, প্রয়োগবিদ্যা, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তির অকৃপণ অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিয়েছি ও নেব। এ সবের প্রয়োগনৈপুণ্যে আমরা ঐশ্বর্য্য ও প্রগতির অগ্রযাত্রায় ক্রমোন্নতির পথেই চলব। তবে যা'-কিছুই করি তা' কিন্তু জীবনের জন্য। তাই, দীক্ষা, শিক্ষা, বিবাহ ও জীবিকাজড়িত বর্ণাশ্রমের যে সর্ব্বাঙ্গীণ সার্ব্বভৌম বিজ্ঞানসম্মত জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থা তার মৌলিক তাৎপর্য্যকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবেই আমরা খণ্ডিত-দৃষ্টিসম্পন্ন বাদবিবাদের ধার না ধেরে ইষ্ট-কৃষ্টি-ব্যষ্টি ও সমাজের সুসঙ্গত অন্বয়ে, পিতৃপরম্পরাগত বৈধানিক সম্পদ ও সমাবেশকে অব্যাহত রেখে সুষ্ঠুভাবে বর্ত্তমানের সম্মুখীন হ'য়ে উন্নততর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারব, ব্যষ্টি ও সমষ্টির অখণ্ড জীবনপ্রবাহকে উচ্ছল ক'রে।

বর্ণাশ্রমের সংস্কার

কালস্রোতে বর্ণাশ্রমের মধ্যে গলদ যদি কিছু ঢুকে থাকে, বিকৃতি যদি কিছু অনুপ্রবেশ লাভ ক'রে থাকে, তবে তাকে পরিমার্জ্জিত করতে হবে, সংশুদ্ধ করতে হবে, সুবিন্যস্ত করতে হবে—বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেককে যথাযোগ্যস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে। কিন্তু অসহিষ্ণু হ'য়ে আমরা যদি বর্ণাশ্রমের মূল কাঠামোকে বিদায় দিই, তাহ'লে বহু বিচিত্র জটিল জীবনসমস্যার সর্ব্বসমঞ্জসা সমাধানসূত্র হারিয়ে আমরাও বিধ্বস্ত হব, এবং পথভ্রান্ত পৃথিবীও বঞ্চিত হবে এক সর্ব্বপূরয়মাণ অভ্রান্ত জীবন-বর্ত্মের অমৃত অবদান থেকে।

বর্ণাশ্রমের সার্ব্বজনীনতা

আমরা বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিকতা, সার্ব্বজনীনতা, সার্ব্বভৌমতা ও সর্ব্বাঙ্গীণ উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা করেছি। তাই আমরা বলব, প্রত্যেকটি দেশের সমাজ-বিন্যাসের ক্ষেত্রে যদি সমজাতীয় সহজাত বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শ্রেণী-বিভাগ করা হয় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে দীক্ষা, শিক্ষা, বিবাহ ও জীবিকার প্রবর্ত্তন করা হয়—জাতির অতীত সাত্বত ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে; তাহ'লে জগতের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, দাম্পত্য, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও কৃষ্টিগত এবং আন্তর্জাতিক বহু সমস্যার সমাধান সহজ হ'য়ে আসে।

বর্ণাশ্রম ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ

এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, আমাদের সমস্যাবলীর অভ্যুদয় হয়েছে বর্ণাশ্রম যথাযথভাবে মানার দরুন নয়, বরং না-মানার দরুন। আর, সব জিনিসেরই চাই স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতি-উপযোগী পুনর্বিন্যাস। যেমন বর্ণাশ্রমের বিধান-অনুযায়ী মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের কুফল অনেক আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মহাযন্ত্র তথা ভারী শিল্পকে বাদ দিয়ে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে কতকগুলি মৌলিক বৃহদাকার শিল্প যেমন ইস্পাত কারখানা, সারের কারখানা, ইঞ্জিন নির্ম্মাণের কারখানা, বিমান-শিল্প, জাহাজ তৈরির কারখানা, সমরোপকরণ নির্ম্মাণের কারখানা ইত্যাদি চাই-ই। কিন্তু বহু শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীকরণ

পদ্ধতিকে এড়িয়ে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করতে পারি, তার কিছু-কিছু অংশ ছোট-ছোট যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে গৃহে-গৃহে নির্ম্মিত হ'তে পারে, এবং পরে সেগুলি একত্র সন্নিবেশিত ক'রে সমগ্র জিনিসটি বাজারে ছাড়া যেতে পারে। আবার, পূর্ব্বোল্লেখিত ভারী শিল্পগুলির যে-যে অংশ বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে প্রস্তুত হ'তে পারে, সেগুলিকে বিকেন্দ্রায়িত প্রথায় প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। বংশানুক্রমিক দক্ষতার ভিত্তির উপর এই সব কর্ম্মের বণ্টন-ব্যবস্থা হ'তে পারে। তাতে মানুষ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে থেকে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ পায়। নারী, বৃদ্ধ ও শিশুরাও ঐ সব কাজে সাধ্যমত সাহায্য করতে পারে। শিশুরাও অল্পবয়স থেকে অর্জ্জনী-যোগ্যতা আহরণ করে। তা'ছাড়া নানাপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ কুটির-শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে পল্লীতে-পল্লীতে কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা ও পারিবারিক সহজাত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গৃহে-গৃহে বিচিত্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে। উপযুক্ত সংগঠনের মাধ্যমে ঐ-সব তৈরি মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্ণাশ্রম চায় এমন ব্যবস্থা যা'তে বৈশিষ্ট্যসম্মত যোগ্যতা ও শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে। গোলামী করার প্রয়োজন মানুষের যত কম হয় ততই ভাল। এতে ধনিক-শ্রমিক সমস্যার আপনিই সমাধান হ'য়ে আসে। যে মালিক সেই শ্রমিক, যে শ্রমিক সেই মালিক। মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের হাতে গুচ্ছের টাকা হোক, তারাই সব উৎপাদনী সরঞ্জামের মালিক হোক, আর দেশের সব লোক তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়ুক—বর্ণাশ্রম তা'ও যেমন চায় না, আবার এও চায় না যে সরকারই সবকিছুর মালিক হোক, এবং মানুষ সরকারের তাঁবেদারি ক'রে চলুক। বরং সরকারের উচিত এমন ব্যবস্থা করা যা'তে প্রত্যেকে সহজাত যোগ্যতাকে বাড়িয়ে তুলে তদনুগ কর্ম্ম-অবলম্বনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরিবেশের সঙ্গে সহযোগিতা নিয়ে ইষ্ট ও কৃষ্টি-অভিগমনে চ'লে মানবজীবন সার্থক ক'রে তুলতে পারে বিহিত বিনায়নী তাৎপর্য্যে। রাষ্ট্র তা' যদি করে তাহ'লে বোঝা যাবে তা' বর্ণাশ্রমী সমাজতন্ত্রের অনুবর্ত্তন ক'রে চলছে।

মানুষের কামনা

সারা পৃথিবীর জনমত যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে অধিকাংশ

লোকই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে চায় না, আর চায় না শোষিত হ'তে বা শোষণ করতে, আরো চায় না পশুর মত উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করতে। তারা চায় স্ব-স্ব যোগ্যতা-অনুযায়ী কাজকর্ম্ম ক'রে পরিবার-পরিবেশকে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করতে, মনের শান্তি, সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বজার রেখে চলতে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে প'ড়ে অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে আশু প্রয়োজন মেটাবার ধান্ধায় অনেকে আবোল তাবোল করে। অবশ্য প্রকৃতিগত বিকৃতির দরুনও অনেকে অন্যায় ক'রে থাকে। যা'হোক, মানুষের সত্তাগত সুস্থ চাহিদা যা', তা' সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিপূরিত হ'তে পারে একমাত্র বর্ণাশ্রমসম্মত বিধানের প্রবর্ত্তনে।

বর্ণবিধান সর্ব্বত্র কার্য্যকরী

এর মধ্যে সম্প্রদায় বা দেশের কোন প্রশ্ন নেই। যেখানেই মানুষ আছে, তার আছে সহজাত সংস্কার। একজাতীয় সহজাত সংস্কারওয়ালা বহু মানুষও আছে, এও ঠিক। বংশানুক্রমিক সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী বৃত্তি-নির্ব্বাচন বা শ্রেণীবিন্যাস প্রকৃতি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কিছু নয়। কৃত্রিম অর্থনৈতিক মানদণ্ড বা শোষণলিপ্সার সঙ্গে এই গুচ্ছীকরণের কোন সম্পর্ক নেইকো এবং মানবের অন্তর্নিহিত গুণ ও কর্ম্মক্ষমতার সুনির্দ্দিষ্ট চিত্রাঙ্কনই এই বিভাজনের উদ্দেশ্য। আর তার প্রয়োজনও অসীম। আজও তাই গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে লোক নিয়োগ করতে গেলে দেখা হয় ঐ কাজের উপযোগী দৈহিক, মানসিক ও প্রকৃতিগত যোগ্যতা তার আছে কিনা। তাই, যাকে-তাকে বৈমানিক করা হয় না, যাকে-তাকে সেনানায়ক করা হয় না। বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য বিভিন্নভাবে স্নায়বিক সামঞ্জস্য, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ, ক্ষিপ্রতা, উপস্থিতবুদ্ধি, নির্ভীকতা, ত্বরিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষমতা, মানসিক স্থৈর্য্য, অবিচলিত দৃঢ়তা ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করা হয়। তবেই উপযুক্তস্থানে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। বর্ণাশ্রমের অন্যতম কাজ হ'ল জন্মগত স্নায়ু-পেশী, শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্ককোষ ও মননযন্ত্রের গঠন-অনুযায়ী পৃথিবীতে যার যেখানে প্রকৃতি-নির্দ্ধারিত স্থান, তাকে সেখানে সেই সুনির্দ্দিষ্ট জীবনব্রত উদ্‌যাপনে সংস্থাপিত করা। বহু দেশে শিক্ষার ব্যাপারেও আজ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নানাভাবে নির্দ্ধারণ ক'রে তবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গতিশীল বিবাহের কথাও আজ বিজ্ঞান স্বীকার করছে। নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস ও আদর্শানুসরণের

সুফল সম্বন্ধে অনাদিকাল থেকে পৃথিবী অবহিত। সুতরাং বর্ণাশ্রমের মৌলিক নীতি-নিয়মনার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে কারও আপত্তি থাকবার কথা নয়! কেউ যদি মনে করেন এতে ভারতীয় আর্য্যহিন্দুদের কৃষ্টি অন্য সবার উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হ'চ্ছে তাহ'লে সেটা হবে মস্ত ভুল। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। তাই ব'লে কি পৃথিবীর অন্য কোন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক তা' স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন? আমরা জীবনের পূজারী, সত্যের পূজারী অর্থাৎ সত্তার পূজারী। তাই সার্ব্বজনীন সাত্বত বিজ্ঞানেরও পূজারী। সেই বিজ্ঞানকে আমরা সর্ব্বত্র সাগ্রহে বরণ ক'রে নেব—স্ব-স্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে।

প্রাচীন বিশ্বসমাজ ও বর্ণাশ্রম

আর, বর্ণাশ্রমকে শুধু ভারতীয়ই বা বলব কেন? প্রাচীন গ্রীস, ইতালী, ইংল্যাণ্ড, ইজিপ্ট, মেক্সিকো ইত্যাদি দেশের সমাজ-ব্যবস্থার রূপরেখা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে নামে না হ'লেও কার্য্যক্ষেত্রে সেখানে বর্ণাশ্রমের আংশিক ছায়া দেখা যাবে। অবশ্য, ভারতের মত অন্য কোথাও এটা এমন সুচিন্তিত, সুস্পষ্ট, সুপরিশীলিত, সুপরীক্ষিত, সুপুষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপ পায়নি।

ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকার

ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে আধুনিক সমাজতন্ত্র অনেকখানি দ্বিধাগ্রস্ত। রাশিয়ায় এক সময় কোনকিছু সম্পদের উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হ'ত না। শুনেছি, এখন সামান্য-সামান্য জিনিসের উপর ব্যক্তিগত অধিকার মেনে নেওয়া হয় এবং একজনের মৃত্যুর পর তার সন্তানকেও তা' ভোগ করতে দেওয়া হয়। বর্ণাশ্রমী সমাজতন্ত্রের মত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট। বর্ণাশ্রম ব্যক্তির স্বোপার্জ্জিত ধনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার ও তার সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকার সহজভাবে স্বীকার করে। কিন্তু ইষ্ট, কৃষ্টি ও সমাজকল্যাণকে যদি সে উল্লঙ্ঘন করে তখনই সে সামাজিক শাসনের আওতায় প'ড়ে যায়। এই সামাজিক শাসনের একটা অসীম প্রভাব ছিল মানুষের উপর। কল্যাণতপা শাস্ত্রজ্ঞ নিঃস্ব বিপ্রের বিধান সমাজের ধনীদেরও মাথা পেতে নিতে

হ'ত। যদৃচ্ছ চলন তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না। তাই, ব্যক্তিগত অধিকার সত্ত্বেও মানুষ অনেকখানি সংযত থাকত। কম্যুনিষ্টদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে ধনের উপর বিশেষতঃ উৎপাদন-যন্ত্রের উপর মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকার থাকলেই তাই-ই শেষপর্য্যন্ত ডেকে আনবে ধনবৈষম্য ও ধনতান্ত্রিক শোষণ ও নিপীড়ন এবং তার ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক চরম অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার সম্মুখীন হবে, দুনিয়ায় তাদের টিকে থাকাই কঠিন হবে। আবার, এমনতর ধনিক যারা তারাও লোভ, বিলাসব্যসন ও হৃদয়হীনতার ফলে অমানুষ হ'তে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক ও জাতীয় চরিত্র, যোগ্যতা ও সংহতিও বিপন্ন হবে। কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। জগতের ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে বাহ্যতঃ শয়তানের আধিপত্যই এখানে প্রবল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে। অন্যকে বাঁচিয়ে বাঁচার থেকে, অন্যকে মেরে বাঁচার বুদ্ধিই প্রকট। অন্যকে বড় ক'রে বড় হওয়ার থেকে অন্যকে খাটো ক'রে, দাবিয়ে বড় হওয়ার প্রবণতাই সক্রিয়। মানুষ নিজে যে-অধিকার চায়, অন্যকে সে-অধিকার দিতে নারাজ। সে নিজে যে-ব্যবহার অপছন্দ করে, অন্যের উপর নির্ব্বিবাদে সেই ব্যবহার করে। এই পশুত্বের সংস্কার বেশির ভাগ মানুষের স্বভাবজ। তারপর তার জ্ঞান, বোধ, প্রেম ও দূরদৃষ্টির পাল্লা অতি সঙ্কীর্ণ। সে জানে না তার নিজের স্বার্থ নিহিত কোথায়। প্রবৃত্তির অন্ধ আবেগ তাকে নিয়তই বিকৃতি, আত্মদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতার পথেই পরিচালিত করে।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর স্বাধীন জীবিকা ও পরাধীন জীবিকার প্রভাব

এই যেখানে অবস্থা সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকার লোপ করাই সঙ্গত ব'লে মনে হয়। কিন্তু নিজের যোগ্যতা ও অর্জ্জনপটুতা বাড়াবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের ভিতর বিদ্যমান। সেই ঝোঁককে যদি স্তিমিত ক'রে দেওয়া যায়, তাহ'লে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় অন্য ভয় ও উৎসাহ দেখিয়ে মানুষকে দিয়ে যতই কাজ আদায় ক'রে নেওয়া যাক না কেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তি, সম্বেগ ও আগ্রহ তা'তে কতখানি উদ্বোধিত হবে বলা যায় না। তাই, স্বতঃদায়িত্বপূর্ণ, স্বতঃস্বেচ্ছ স্বাধীন কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল,

আত্মকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগত দক্ষতা এতে ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। তা'তে ব্যক্তিত্বের বিকাশও অনেকখানি ব্যাহত হয়। একজন স্বাধীন জীবিকাসম্পন্ন ভাল আইনজীবী ও একজন চাকুরিজীবী দক্ষ বিচারক, দুইজনের যদিও আইন নিয়ে কারবার, তাহ'লেও দেখা যাবে ঐ বিচারকের যদি স্বাধীন আইন-ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহ'লে আইনের ব্যবহারিক ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে তার কিছু ন্যূনতা থেকে যাবে। তা'ছাড়া, আজীবন ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার ফলে আইনজীবীর যে আত্মপ্রত্যয় ও উপস্থিতবুদ্ধি অধিগত হবে, বিচারকের তা' অধিগত না হওয়াই সম্ভব, যদিও স্বাধীন আইনব্যবসায়ে ব্রতী হ'য়ে পরে তার পক্ষে তা আয়ত্ত করা সম্ভব হ'তে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে-অনিশ্চয়তাপূর্ণ, সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক, নিত্য সংগ্রামরত, সৎ স্বাধীন জীবিকা যে আমাদের ইচ্ছাশক্তি, আত্মপ্রত্যয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বকে বলিষ্ঠ ক'রে তোলে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। জাতীয়জীবনে এর অবকাশ যত তিরোহিত হ'য়ে যায়, ততই অমঙ্গল। জীবিকার সব পথই যদি রাষ্ট্রায়ত্ত হ'য়ে যায়, তবে প্রত্যেকেই হবে রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্ম্মচারী। চাকুরীকে আমাদের শাস্ত্র বলেছে কুক্কুরবৃত্তি, দাসবৃত্তি। জীবিকার নিরাপত্তার জন্য সমস্ত জাতিকে যদি রাষ্ট্রপদলেহী দাসজাতিতে পরিণত করা হয়, সে কি খুব গৌরবের কথা? আর, রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা, তারা যে প্রবৃত্তির বশে ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে জনজীবনকে নিষ্পেষিত করবে না, তারই বা রক্ষাকবচ কোথায়?

চাই চরিত্রের রূপান্তর

আদত কথা হচ্ছে, মানুষের বিশেষ ক'রে শক্তিমান ব্যক্তিদের চরিত্র যদি রূপান্তরিত না হয়, তাহ'লে কোন ব্যবস্থাই মানুষকে স্বস্তি বা শান্তি দিতে পারবে না। এই কথা তুললেই সকলে বলবেন—'হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, চরিত্রের পরিবর্ত্তন—ও হ'ল অসম্ভব কথা, ও কখনও হয় না। এ হ'ল অনিবার্য্য বিপ্লবকে দমিত ক'রে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রশ্রয় দেওয়ার ভাঁওতা।' এই অভিযোগের মধ্যে যে কোন সত্য নেই, তা' আমরা বলি না। বৃত্তিস্বার্থপূরণের খাতিরে অনেকে ধর্ম্মবুলি আউড়ে থাকেন, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না। তবে আমাদের কথা তা' নয়। আমরা নিজেদের সন্তাপলাপী প্রবৃত্তিপরায়ণতা সমর্থন করি না, অন্যের তজ্জাতীয় প্রবৃত্তিপরায়ণতাও সমর্থন করি না—তা' সে ধনিকই হোক বা শ্রমিকই

হোক। আমার প্রবৃত্তিবশ্যতা যেমন আমার শত্রু, তেমনি তা' জগতের শত্রু, আবার, অপরের প্রবৃত্তিবশ্যতা যেমন তার শত্রু, তেমনি তা' জগতেরও শত্রু, আর সে-জগতের মধ্যে আমিও একজন। এ হ'ল আমাদের সুস্পষ্ট অকাট্য প্রত্যয়। সুতরাং আমাদের জেহাদ হ'ল প্রবৃত্তিমার্গী, অজ্ঞ, বেকুব চলনের বিরুদ্ধে। তাই, আমার ভিতরে ব'সে যারা আমার ও আমার পরিবেশের সত্তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাদের আমি শাসনে সংযত করতে চাই, আমার ও সবার সত্তার পরিচায়ক ক'রে তুলতে চাই। এই আমার সাত্বত রণযাত্রা।

চারিত্রিক রূপান্তরের সুসংবদ্ধ পদ্ধতি

একেই আমরা সম্প্রসারিত করতে চাই বিশ্বময়। বলা বাহুল্য, অস্খলিত ইষ্টনিষ্ঠাই আমাদের প্রধান সমরোপকরণ। তার মূলে আছে বিহিত দীক্ষা ও তদনুগ নিত্যসাধনা ও আচারপরায়ণতা। এই সাধননিরতি সত্ত্বেও বার-বার পূর্ব্বের অভ্যাস ও সংস্কার জয়ী হয়, পদে-পদে ভুল হয় মানুষের। তবু মানুষ ধীরে-ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হ'তে পারে এর ভিতর-দিয়েই। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি প্রভৃতি অধ্যায়ে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দীক্ষার সঙ্গে চাই সুবিবাহ, সুজনন, সুশিক্ষা ও প্রকৃতিসঙ্গত সৎ জীবিকা। বংশপরম্পরায় এইগুলি চলতে থাকলে মানুষের ভিতর চরিত্রবত্তা, হৃদয়বত্তা, সাত্বতপ্রবণতা সহজ হ'য়ে ওঠে। এই হ'ল চারিত্রিক রূপান্তরের বিজ্ঞান। সঙ্গে সঙ্গে চাই সামাজিক শাসন, রাষ্ট্রিক শাসন অর্থাৎ অসৎনিরোধের বিহিত ব্যবস্থা।

ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্ত্ত

এই সব সর্ত্তের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই, ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকার চাই, যাতে বংশপরম্পরায় মানুষের যোগ্যতা, চরিত্র ও সাত্বত কুলকৃষ্টি উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলে। স্বাধীনতা ও সম্পদ কিন্তু নিজের ও পরিবেশের জীবন ও যোগ্যতা বাড়িতে তুলবার জন্য। যেখানেই তা' বিপরীতভাবে প্রযুক্ত হবে, সেখানে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। তা' সত্ত্বেও ধ'রেই নিতে হবে যে এর কিছু-কিছু অপব্যবহার হবেই। সেই ঝুঁকি নিয়েই বর্ণাশ্রম বিহিত ইষ্টনিষ্ঠানুপ্রাণিত, সমাজ ও রাষ্ট্রশাসিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকার থাকা ভাল। কোন মানুষই সর্ব্বহারা রাষ্ট্রদাস

বা ধনিকদাস হয়, সেটা ভাল নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই যাতে পিতৃপরম্পরাগত যোগ্যতা ও ধনের অধিকারী হয়, তেমন ব্যবস্থা থাকা যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ ধনের পরিমাণ যদি এজন্য নির্দ্ধারণ ক'রে দিতে হয়, তাও দিতে হবে। বর্ণাশ্রম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত বৈষয়িক অধিকারের উপর এতখানি গুরুত্ব দেয়, তার উদ্দেশ্য শুধু সমাজ-কল্যাণ নয়, আরও নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে এর পিছনে। প্রত্যেকটি মানুষ স্রষ্টারই এক-এক পরিণয়ন। তাই, আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধিই তার জীবনের চরম কথা।

জীবনের চরম উদ্দেশ্যসাধনে সমীচীন ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্ব

আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির জন্য চাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্ফুরণের সুযোগ। প্রত্যেকটি মানুষ তার মত ক'রে স্বাধীনতা ও সম্পদের অধিকারী হ'য়েও ইষ্টপ্রীতি ও বিশ্বাত্মবোধের খাতিরে তার অপব্যবহার না ক'রে স্বেচ্ছায় যখন তার সাত্বত ব্যবহার করে, তখনই বোঝা গেল তার মনুষ্যদেহলাভ সার্থক হয়েছে। সে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে। এই স্বাধীনতা যদি তাকে না দেওয়া যায়, তাহ'লে বোঝা যায় না, তার ভিতরের প্রবৃত্তি বিশেষ ক'রে অহমিকা, লোভ ও শোষণ-প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয়েছে কিনা। আর, প্রবৃত্তির রূপান্তরসাধন যদি না হয়, দানব যদি দেবত্বে উন্নীত না হয় তবে জোর করে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে লাভ কী? শিকলছেঁড়া অবস্থায় সে যে কী কাণ্ড করবে, তার কি ঠিক আছে? তা'ছাড়া মানবদেহলাভ যে প্রবৃত্তিবন্ধন-মুক্তির জন্য, স্বরূপ সাক্ষাৎকারের জন্য, সেদিক দিয়ে তো সে বঞ্চিতই হ'য়ে রইল। মানুষ তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে ইষ্টানুরাগের পথে চলতে-চলতে ভুল-ক্রটির ভিতর-দিয়েও যদি নিজের যাবতীয় দোষ-দুর্ব্বলতা ও প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার করার সুযোগ পায় এবং ক্রমে-ক্রমে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসী হয়, বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে তারও প্রভুত মূল্য আছে। কিন্তু একটা কৃত্রিম ব্যবস্থার মধ্যে আত্ম-অচেতন অবস্থায় ধামাচাপা দিয়ে স্বপ্নের স্বর্গে থেকে কোন লাভ নেই। ওতে মানুষের নিরুদ্ধ কামনা-বাসনা বা গ্রন্থির কোন সমাধান হবে না। চেতন, অবচেতন বা অচেতন মনে চলতে থাকবে কালকূটের বীভৎস করাল লীলা। ফলকথা, ব্যক্তিগত জীবনে আত্মসুখ, আত্মস্বার্থ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার কামনাভিভূতিই বিশ্বব্যাধির মূল উৎস, এবং তাকে

যতক্ষণ ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা তথা সাত্বত পরসুখ, পরস্বার্থ ও পরপ্রতিষ্ঠার দিকে মোড় ফেরান না যাবে, ততক্ষণ কোনকিছু দিয়েই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ করা যাবে না। একটা মানুষের মধ্যেও ঈশ্বরমুখিনতা অর্থাৎ ইষ্টানুগ ধারণ-পালন-সম্বেগশীলতা যদি অচ্ছেদ্য নিরন্তরতায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, তা' মানবসমাজে এক অমোঘ মঙ্গলশক্তিরূপে অব্যর্থভাবে ক্রিয়া ক'রে চলবে। বর্ণাশ্রম চায় ঘরে-ঘরে, জনে-জনে ঐ ধারণ-পালনী শক্তির আবির্ভাব ঘটিয়ে তুলতে। তার জন্যই তার যতকিছু বিধিনিষেধ ও আয়োজন। বর্ণাশ্রম মানুষকে বলে—"তুমি যোগ্যতা, গুণপনা ও সম্পদের অছিমাত্র। সবকিছুর মালিক পরমপিতা। এ-সব পেয়েছ ইষ্টার্থী সাত্বত সেবার জন্য। তা' যদি না কর, তুমি প্রত্যবায়ের ভাগী হবে। আর, কোন প্রত্যাশার বশবর্ত্তী হ'য়ে কিছু ক'রো না। ক'রো ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য। সেই তোমার ধর্ম্ম, সেই তোমার কর্ম্ম।" এই নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষাই পেয়েছি আমরা যুগে-যুগে। তাই-ই ভারতকে একদিন অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত দৈবীবিভূতিভূষিত বিশ্ববন্দিত দেবলোকে পরিণত করেছিল।

চতুর্ব্বর্ণ

বিপ্রের কাজ

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে আছে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারটি বর্ণ। বিপ্র সমাজের শিক্ষক বা আচার্য্য। ইষ্টপরিবেশন এবং সাত্বত লোকচর্য্যাই তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ তাদের সাধন-সোপান ও জীবিকামূলক কর্ম্ম। যদিও সাধনার অঙ্গ হিসাবে এই ষট্‌কর্ম্ম সবারই অনুশীলনীয়। জ্ঞান, গবেষণা, বিদ্যাদান, সমাজ-উন্নয়ন, মন্ত্রণা, বিধি-প্রণয়ন, বিচার, উপদেশ ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের কর্ম্মেই বিপ্রদের জন্মগত অধিকার। এইসব কর্ম্ম করলেও বেতনভূক কর্ম্মচারী হওয়া তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আজকের সামাজিক পরিবেশে আমরা হয়তো এ-কথা ভাবতে পারি না। কিন্তু একদিন মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ দক্ষিণা ও প্রীতি-অবদানই ছিল বিপ্রদের উপজীব্য। লোক-জীবনই ছিল তাদের মুখ্যসম্পদ। নিজেদের সুগঠিত চরিত্র, সক্রিয় ইষ্টনিষ্ঠা, ভূয়োদর্শন, বোধি, প্রীতি ও সেবা দিয়ে মানুষকে ক্রমাগত উন্নতির পথে পরিচালিত করাই ছিল তাদের নেশা ও পেশা। তাই, মানুষও তাদের আপনা থেকেই দিত—প্রাণের টানে। তা'ই দিয়ে তাদের পরিবারবর্গের কোনভাবে চ'লে যেত। প্রয়োজন-বাহুল্যের বালাই ছিল না তাদের। সহজ, সরল, ত্যাগপূত সেবামুখর জীবনই ছিল তাদের আদর্শ। আজকের সমাজে এই বৈপ্রিক চরিত্র ও বৃত্তিওয়ালা লোকের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে খুব বেশি। মানুষের চারিত্রিক মান যে দিন-দিন নেমে যাচ্ছে, তার অন্য যত কারণই থাক না কেন, একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ইষ্টনিষ্ঠ, আচারবান, চরিত্রবান, সুসঙ্গত, সুসংহত, সুসংযত অভ্যাস-ব্যবহার-সম্পন্ন মানুষের সঙ্গ-সাহচর্য্য ও দেবত্বদীপী নিবিড় প্রীতি ও সেবাসম্পোষণা লাভের সুযোগ বহু মানুষের জীবনে ঘটছে না। মানুষ ক্রমাগত দৃষ্টান্ত ও প্রবর্ত্তনা পাচ্ছে প্রবৃত্তিচলনার, আর তাই-ই গুণিত হয়ে চলেছে। ইষ্টনিষ্ঠ, প্রত্যাশাশূন্য যাজন-ও-সেবাসর্ব্বস্ব অসংখ্য সাধক আজ চাই, যারা ছড়িয়ে পড়বে জগতের বুকে মানুষের ঘরে-ঘরে, যাদের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে

মানুষ চারিত্র্য-অর্জ্জনের তপস্যায় ব্রতী হবে। এই এরা কিন্তু পয়সার চাকরে হ'লে চলবে না। তবে জনমত এমনভাবে গঠিত ক'রে তুলতে হবে, যাতে লোকে এদের সশ্রদ্ধভাবে পোষণ করে।

ঋত্বিকী

আমাদের এই আলোচনা অনেকখানি অবাস্তব মনে হ'তে পারে। কিন্তু এর একটা সাংগঠনিক বাস্তব দিক আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এর আলোচনা করলে অনেকের পক্ষেই এটা বোঝার সুবিধা হ'তে পারে। আমি সৎসঙ্গের ঋত্বিক্ আন্দোলনের কথা বলছি। সৎসঙ্গের ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, যাজক, উদগাতা ইত্যাদির কাজ কতকাংশে বিপ্র-বৃত্তির সামিল। ইষ্ট-কৃষ্টির পরিবেশন, সাধনশীলতার সঞ্চারণ, লোকের সর্ব্ববিধ উন্নয়ন, লোকের মধ্যে ইষ্টানুগ পারস্পরিক সেবা, প্রীতি-সঙ্গতি ও প্রীতি-সংহতি প্রবর্ত্তন ইত্যাদিই তাদের কাজ। আজ জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে লক্ষ-লক্ষ সৎসঙ্গী ব্যক্তিগতভাবে যেমন বিধিমাফিক যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির পরিপালনে অস্খলিতব্রত, তেমনি তাদের অনেকে ঋত্বিক্দের ভরণপোষণের জন্য প্রতিমাসে ইষ্টসকাশে ঋত্বিকী প্রেরণেও অভ্যস্ত। অনেক ঋত্বিকের পরিবার যজমানের এই প্রীতি-অবদানের উপরই নির্ভরশীল। এ-থেকে এই বোঝা যায় যে, লোকের মধ্যে চারাতে পারলে এখনও এটা পুনর্জাগ্রত ক'রে তোলা অসম্ভব নয়। তবে প্রধান জিনিস হচ্ছে—এই পবিত্রতম কাজের জন্য সুকেন্দ্রিক-লোকহিতব্রতী, নির্লোভ, কঠোরকর্ম্মা, জিতেন্দ্রিয়, যোগ্যতাদীপ্ত বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন। এবং তাদের মধ্যে বিপ্র-বংশোদ্ভূত কর্ম্মীর সংখ্যাই বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনি ক'রে তাদের সুপ্ত সংস্কারও জাগ্রত হ'য়ে উঠবে এবং মানব-সমাজেরও অশেষ কল্যাণ হবে।

বিপ্রোচিত চরিত্র ও মনোভাবসম্পন্ন লোকের প্রয়োজনীয়তা

একদিন কপর্দ্দকশূন্য, নগ্নপদ, নগ্নদেহ, মহাতপা, বিপ্রবর চাণক্যের অঙ্গুলি-হেলনে সসাগরা ভারত পরিচালিত হ'ত। মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের উপর তাঁর যে অতোখানি দাপট ছিল, রাজার অন্নদাস হ'লে তা' তাঁর থাকতো কিনা সন্দেহ। ভীষ্ম কত বড় মানুষ ছিলেন, কিন্তু কৌরবদের অন্নদাসত্বই তাঁর কাল হ'য়ে দাঁড়ালো। আজকের রাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁদেরও উচিত রাষ্ট্রের বেতনভুক না

হওয়া, রাষ্ট্রের সুযোগসুবিধা যথাসম্ভব কম নেওয়া। বিপ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কতকগুলি নিষ্ঠাবান, ধীমান, দূরদর্শী, করিৎকর্ম্মা, স্বার্থগত বাধ্যবাধকতাহীন, ত্যাগব্রতী, কুশলকৌশলী, আপোসরফাহীন, লোক-কল্যাণকামী, ইন্দ্রিয়জয়ী সৎলোক যদি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত না হন, তাহ'লে কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কতকগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, প্রবৃত্তিপরায়ণ, হীনম্মন্য-লালসাতাড়িত, গর্ব্বেপ্সু লোক বুদ্ধির জোরে, টাকার জোরে, দক্ষতার জোরে বা ভোটের জোরে যদি নেতৃত্বপদে আসীন হয়, তবে তা' সমূহ বিপদেরই কথা। নেতৃত্বের পদে চাই দক্ষতা ও যোগ্যতাসমন্বিত বিপ্রোচিত চরিত্র ও মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক, প্রবৃত্তি যাকে টলাতে পারে না। আজকের সমাজে তেমন মানুষ থাকলে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির উচিত তাদের খুঁজে বের ক'রে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। তা' যদি করা হয় তবে ইষ্ট, ধর্ম্ম-ও-কৃষ্টিবাহী চারিত্র্য ও যোগ্যতার প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাদের প্রভাবে জনজীবনে প্রীতিসঙ্গতি বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ লোকও উৎসাহিত হবে সুকেন্দ্রিক চারিত্র্য-অর্জ্জনী অনুশীলনে। আমরা আবার বলি—বিপ্র-বংশোদ্ভুত যারা, তাদের বিশেষভাবে পোষণ দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক লোক বিপ্রোচিত শিক্ষা, চারিত্র্য ও জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করে। বংশগত স্থায়ী সহজাত-সংস্কার হাজার হাজার বছরেও মরে না। তাই বিভিন্ন প্রকারের সহজাত-সংস্কার যা' বিভিন্ন বর্ণের লোকের মধ্যে নিহিত আছে, তা' আবিষ্কার ক'রে ও তার সদ্ব্যবহার ক'রে জাতির ও জগতের মঙ্গল করতে হবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতি ও বর্ণবিধান

আজ পরিকল্পিত অর্থনীতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সারা জগতে জনমত গঠিত হয়েছে। তার একদিকে যেমন ভাবতে হবে সামগ্রিকভাবে নানা প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজন সাধনের নানা উপায় ও সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে, তেমনি আবার ভাবতে হবে জাতির জনগণের সহজাত সংস্কারের মধ্যে বিদ্যমান গুণসম্পদ ও কর্ম্মশক্তির উৎপাদনী সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে। এই মৌলিক মানবিক সম্পদ পরিকল্পনা-রচয়িতাদের ফরমায়েসমত রাতারাতি পয়দা হয় না। নানা কাজের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থাও যদি করা হয়, তার সুযোগ সকলে সমভাবে নিতে পারে না। যার জন্মগত প্রবণতা ও সম্ভাব্যতা যেদিকে আছে, সে তজ্জাতীয় শিক্ষা

গ্রহণ ক'রেই লাভবান হ'তে পারে। তাইতো আমরা নানাক্ষেত্রে দক্ষ, ইচ্ছুক, দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য কর্ম্মীর অভাবের কথা প্রতিনিয়তই শুনতে পাই। মানবের দেহাহিত গুণ ও কর্ম্মক্ষমতাগত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও পরিসংখ্যানের মানচিত্রের সূত্রপাত হয়েছিল আমাদের দেশে হাজার-হাজার বছর পূর্ব্বে বর্ণ-ধর্ম্মের মাধ্যমে। আজকের পরিকল্পনাকারদের উচিত হবে এই সমাজবিন্যাসের সর্ব্বার্থসার্থক তাৎপর্য্যকে অনুধাবন ক'রে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোকে তাকে আরও সমুন্নত, সম্প্রসারিত ও কার্য্যকরী রূপ দিয়ে যুগপৎ আমাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা। এটা হবে পরিকল্পিত অগ্রগতি ও উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রাথমিক ধাপ। কারণ, মানুষের মস্তিষ্ক-সম্পদ, চারিত্রিক সম্পদ ও দক্ষতাগত বৈশিষ্ট্য যে তার প্রধান মূলধন, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। এইগুলির উৎকর্ষসাধনে যোগান দেওয়াই বিপ্রের কাজ। অবশ্য, সুবিবাহ ও সুজনন ছাড়া যে সব চেষ্টা অনেকখানি নিষ্ফল, তা' আমরা বহুবার ইঙ্গিত করেছি।

সৎসঙ্গ ঋত্বিক্‌সঙ্ঘ ও বর্ণাশ্রম

মানুষের মন স্বভাবতঃই নিম্নগামী ও তপস্যাবিমুখ। এই জড়তাকে অপসারিত করার জন্য চাই প্রত্যক্ষ প্রবল উচ্চেতনী প্রেরণা ও দৃষ্টান্ত। বিপ্রের কাজ হ'ল স্বতঃদায়িত্বে ঘরে-ঘরে হানা দিয়ে নিজেদের উন্নত জীবনবিভা বিচ্ছুরিত ক'রে মানুষের ভিতর ইষ্টানুগ সাধনশীলতার সঞ্চারণায় প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার মধ্যে দিব্য জীবন উদ্বোধিত ক'রে তোলা। মানুষের সমাজে এই বিপ্রোচিত সেবার প্রয়োজন আজ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ-কল্যাণ, সমাজ-উন্নয়ন যাঁরা চান, তাঁদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এই লোকশিক্ষক ও লোক রাখাল-বাহিনী সংসৃজনের দিকে। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবর্ত্তনায় সৎসঙ্গের ঋত্বিক্‌সঙ্ঘ বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেশে সেদিক দিয়ে শাশ্বত ভারতের ব্রহ্মণ্যকৃষ্টির এক নূতন পরিচয় তুলে ধরেছে জগতের সামনে। ব্রহ্মণ্যকৃষ্টি মানে সেই কৃষ্টি যা' মানুষকে সর্ব্বসমন্বয়ী পরমবৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। মানুষের বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্মদক্ষতা যেমন চাই, তেমনি চাই ঈশ্বরকেন্দ্রিক সমাজ সচেতনতা। মানুষ ঈশ্বর তথা ইষ্টপ্রীতিকাম হ'য়ে তার বৈশিষ্ট্যসম্মত দক্ষতার স্ফুরণ ও নিয়োগে সমাজকে সেবায় সমুন্নত ক'রে

তুলবে—এই হ'ল তার জীবনব্রত। এর ভিতর-দিয়েই অধিগত হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বর্ণাশ্রমের পরিকল্পনা এমনতরই। এতে ব্যষ্টি, সমষ্টি, দেহ, মন, আত্মা, অর্থ, পরমার্থ সব দিকই রক্ষা পায়। এক ঢিলে সব পাখীই মারা হয়। এতে না থাকে চরিত্রের অভাব, না থাকে যোগ্যতার অভাব, না থাকে প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও দ্রব্যসামগ্রীর অভাব, না থাকে সম্প্রীতি ও সংহতির অভাব।

বর্ণাশ্রম ও বিশ্বমঙ্গল

ব্যক্তিগত উন্নতি ও সামাজিক উন্নতি এই দুইয়ের সমন্বয় যদি না হয়, তাহ'লে মানুষ প্রকৃত স্বস্তির অধিকারী হ'তে পারে না। আর, এই উন্নতিটি হওয়া চাই বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ও সর্ব্বতোমুখী। জীবন-সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জ্ঞান না থাকলে তা' হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টই হ'লেন সমাজের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সত্তাসম্বর্দ্ধনী সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়ে অধিরূঢ় হ'তে পারে বিশ্বপরিবেশকে বান্ধব-বন্ধনে আলিঙ্গন ক'রে। বর্ণাশ্রমের ফলশ্রুতির মধ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে এই বিশ্বমঙ্গলকর প্রতিশ্রুতি।

ক্ষত্রিয়ের কাজ

বিপ্র বর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করতে-করতে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছি। এইবার আমরা অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করব। বিপ্রের পর হ'ল ক্ষত্রিয়। শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, লোক-নিয়ন্তৃত্ব, রাজ্যশাসন ও পরিচালন-ক্ষমতা, সামরিক দক্ষতা, কূটনীতিজ্ঞতা ইত্যাদি গুণ হ'ল ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি ও লোকরক্ষা, আর্ত্তত্রাণ, বিপন্নকে আশ্রয় ও অভয়দান এবং অসৎ-নিরোধী তৎপরতা—এইগুলিই তার চরিত্রগত লক্ষণ। ক্ষত্রিয়সন্তান যারা, তাদের ভিতর এই সব গুণ যাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে, সেদিকে নজর দিতে হবে। আর, আইন, শাসন, রাজনীতি, সরকারী ও বেসরকারী নানাপ্রকার কার্য্যনির্ব্বাহ ও পরিচালনা, সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক দপ্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা-অনুযায়ী কাজের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। অন্যান্য যাদের মধ্যে ঐসব গুণ আছে, তাদের গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিহিত কাজে নিয়োগ করতে হবে। আমাদের কথা হচ্ছে—শুধু ডিগ্রী না দেখে মানুষের জন্মগত সংস্কার ও সম্ভাব্যতা

নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা ক'রে প্রত্যেককে যথাসম্ভব প্রকৃতিসঙ্গত কাজের সুযোগ ক'রে দেওয়াই সব দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক।

বৈশ্যের কাজ

তারপর হচ্ছে বৈশ্য। বৈশ্যদের প্রধান কাজ হচ্ছে কৃষি, শিল্প, গো-রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য। লোকের প্রয়োজন-পূরণী উৎপাদন ও সেবার মাধ্যমে দেশের ঐশ্বর্য্য এবং নিজেদের অর্জ্জনপটুতা বৃদ্ধিই তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈশ্যরা যাতে অসাধুতা ও শোষণের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে অথচ বিহিত নিয়ন্ত্রণাধীন হ'য়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্ম্ম পরিচালনা করতে পারে, তেমনতর ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। যে-সব উদ্যোগ রাষ্ট্রায়ত্ত রাখার অপরিহার্য্য প্রয়োজন, তা' ছাড়া অন্যান্য উদ্যোগের ব্যাপারে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা আবার বলি—মহাযন্ত্রের ব্যবহার যত কম হয় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছোট-ছোট পারিবারিক শিল্প যত বেশি পরিবারের মধ্যে চালু হয়, তাই-ই সর্ব্বথা মঙ্গলজনক। এগুলি কার্য্যকরী করতে গেলে সরকারের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। কারণ, মূলধন ও যন্ত্রপাতির যোগান, শক্তি-সরবরাহ, কাঁচামালের যোগাড়, কর্ম্মীর প্রশিক্ষণ, পণ্য-বিপণন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক শিল্পগুলির গতি, প্রকৃতি ও প্রকার নির্দ্ধারণ এবং সেগুলি সামঞ্জস্য-বিধান—ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যাপার আছে যা' বর্ত্তমান যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যাপক পটভূমিকায়ই সমাধান লাভ করতে পারে। আমরা চাই সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা যা' যুগপৎ প্রতিটি ব্যক্তির হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেবে রাষ্ট্রীয় ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার জন্য চাই শিল্পের সুপরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ। বর্ণাশ্রম এই বিকেন্দ্রীকৃত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী, সমাজ-সেবামূলক পারিবারিক শিল্পসম্প্রসারণেই পক্ষপাতী। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার সহায়তা নিয়ে আমরা যদি আমাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভারতে এক নতুন গৃহকেন্দ্রিক শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত ক'রে তুলতে পারি, তাহ'লে তা' হয়তো দেশের বেকার, দারিদ্র্য ও প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের অনটনের সমস্যা চিরতরে বিদূরিত ক'রে সমগ্র জগতের সমক্ষে এক নূতন নজির স্থাপন করবে। শুধু তাই নয়, তা' আমাদের প্রয়োজন সরবরাহ ক'রে রপ্তানী-বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনেও সমর্থ হবে।

কৃষির গুরুত্ব

অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে চাই কৃষির উন্নয়ন। কৃষির উন্নতি ব্যতীত শিল্প উন্নত হ'তে পারে না এবং খাদ্যসমস্যারও সমাধান হ'তে পারে না। এই কৃষির উন্নয়ন-সম্পর্কে আমাদের একটা প্রধান কথা হচ্ছে, কৃষির প্রতি কৃষকের নিজের মনে এবং সমাজ-মানসে একটা গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেগ করার বিশেষ প্রয়োজন। নইলে, একটু লেখাপড়া শিখলেই যে কৃষকের ছেলে চাকরী খোঁজে, এটা কিন্তু আদৌ শুভলক্ষণ নয়। তার লেখাপড়ার বিদ্যা দিয়ে তার চেষ্টা করা উচিত আরো উন্নত, আধুনিক ও লাভজনক পদ্ধতিতে কৃষি করতে চেষ্টা করা। সুষ্ঠুভাবে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারলে তা' সুফলপ্রসূ হ'তে পারে। অবশ্য, তার জন্য চাই দায়িত্বশীল, পরার্থপর, দক্ষ, সৎ, পরিশ্রমী মানুষ! আর, কৃষকদের উচিত কৃষির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত শিল্পের দিকে নজর দেওয়া। তাতে তার কোন সময় ব'সে থাকতে হবে না ও আয় বৃদ্ধি হবে।

শূদ্রের কাজ

শূদ্রের কাজ হ'ল পরিচর্য্যা। পরিচর্য্যা মানে সেবা। সে এই সেবা করবে তার যোগ্যতা-অনুযায়ী। তার যদি দৈহিক শক্তি থাকে, সে তার ঐ দৈহিক শক্তিকেই প্রয়োগ করবে সমাজের সেবায়। আর, এটা করতে হবে অসূয়াহীন চিত্তে। যার যা' সম্বল আছে, তাই-ই নিয়োগ করতে হবে তাকে সমাজ-কল্যাণে। এর মধ্যে হীনম্মন্যতার কোন স্থান নেইকো। কারণ, সমাজকল্যাণের জন্য প্রত্যেকের সেবাই অপরিহার্য্য। প্রত্যেকেই তার স্ব-স্ব স্থানে, এক অদ্বিতীয় ও অনন্য। তাই প্রত্যেককেই মানুষ হিসাবে বিশিষ্ট মর্য্যাদা দিতে হবে।

সমাজে বিপ্রের স্থান

তবুও চরিত্র, যোগ্যতা ও অবদান-বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেক বর্ণের একটা মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রেও সবাই এক পর্য্যায়ের নয়। এর মধ্যে তর-তম আছে। সেদিক দিয়ে বিপ্রের স্থান সর্ব্বাগ্রে। কারণ, তার সাত্বত সম্পোষণার বলেই সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ প্রবৃত্তির উপর যথাসম্ভব আধিপত্য লাভ ক'রে বৈশিষ্ট্যসম্মত যোগ্যতার অধিগমনে সত্তাসম্বর্দ্ধনার পথে অগ্রসর হবার

সুযোগ পায়। ইষ্টনিষ্ঠ, কৃষ্টিযাগপালী, তপঃ-প্রভাবশালী, আচারবান, ত্যাগতিতিক্ষা-সমন্বিত, লোকস্বার্থী, সেবাব্রতী, জ্ঞানতপস্বী, যাজনমুখর বিপ্রদের প্রচেষ্টা ও প্রভাবের ফলেই সমগ্র সমাজ সুস্থ-স্বস্থ থেকে দেবজীবনলাভের সাধনায় সক্রিয় ও সচল হয়। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হ'ল চারিত্রিক বিকাশ, সুপ্ত দিব্যগুণাবলীর স্ফুরণ, আত্মশক্তির উদ্বোধন, আত্মজ্ঞানলাভ ও সুকেন্দ্রিক বিস্তারশীল প্রেমের জাগরণ। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রত্যেককে প্রেরণা জোগানই বিপ্রের কাজ। তাই, বিপ্রের স্থান যে কেন সর্ব্বোচ্চ, সে-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই উন্নত বৈশিষ্ট্য শুধু তাদের সাধনগত সম্পদ নয়। এর পিছনে আছে পিতৃপরম্পরাগত বীজগত সম্পদ অর্থাৎ উচ্চকোটির গুণবিশিষ্ট জনিবিন্যাস। জৈব-সংস্থিতির সঙ্গে এর নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধনার অভাবে জৈব-সংস্থিতি-নিহিত সম্ভাব্যতার অভিব্যক্তির তারতম্য হ'তে পারে, কিন্তু যদি বংশে সঙ্গতিশীল বিবাহধারা ঠিক থাকে, তবে ঐ সম্ভাব্যতার মূল বুনিয়াদ উচ্ছিন্ন হ'তে পারে না। তাই, যেসব পরিবারে ব্যত্যয়ী বিবাহ ঘটেনি, সেইসব পরিবারের জাতকদের মধ্যে তাদের বর্ণ ও বংশগত বীজ-সত্তা অর্থাৎ জনি-প্রবাহ অক্ষুন্ন আছে ব'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি। কারণ, সত্তাগত সহজাত বীজসম্পদ হাজার-হাজার বছরেও লোপ পায় না। বিবাহ ও জনন-ব্যাপারে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হবে নারী-পুরুষের বৈধানিক সংস্থিতি-অনুস্যূত জনি-প্রবাহের সঙ্গতিশীল সমাবেশের দিকে। বিপ্রকে আমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব'লে সম্মান দিচ্ছি, তার মানে তার বীজসম্পদও অন্যান্য বর্ণের বীজসম্পদের থেকে উৎকৃষ্ট। কোন বর্ণের গুণাবলীই উপেক্ষণীয় নয়। তবে যে-বর্ণের গুণসম্পদ দিয়ে মানুষের সত্তা যত উন্নত, সূক্ষ্ম, গভীর ও ব্যাপকভাবে পরিপূরিত হয়, স্বভাবতঃই সে বর্ণের স্থান তত উচ্চে। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি বীজসম্পদ অর্থাৎ বিশিষ্ট জনিবিন্যাসকে আশ্রয় ক'রে বিশিষ্ট গুণসম্পদের সম্ভাব্যতা কেমন ক'রে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হ'য়ে চলে।

ক্ষত্রিয়ের স্থান

বিপ্রের পরই স্থান হ'ল ক্ষত্রিয়ের। ক্ষত্রিয়ের ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব বিস্তর। নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রেও তাদের দেশকে, দশকে, ধর্ম্মকে ও কৃষ্টিকে রক্ষা করতে হয় বিদ্রোহ, বিপ্লব, অরাজকতা, দুর্নীতি, দুঃশীলতা, অনাচার, অত্যাচার,

ব্যভিচার ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে। দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন তাদের প্রধান কর্ম্ম। জিতেন্দ্রিয়তা রাজধর্ম্মের মূল। জিতেন্দ্রিয় না হ'লে ক্ষমতাসীন হ'য়ে সকলের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় না। যে নিজে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুধী নয়, তার পক্ষে লোকশাসন, লোকনিয়ন্ত্রণ ও নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ, জটিল দায়িত্ব উদ্‌যাপন দুরূহ হ'য়ে ওঠে। তাই, ক্ষত্রিয়কে স্বভাবতঃই হ'তে হয় শৌর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা, কুশলকৌশলী বুদ্ধিমত্তা, সংযম, সাহস, দৃঢ়তা, হৃদয়বত্তা, নেতৃত্ব, অতন্দ্রকর্ম্মতৎপরতা ও আত্মোৎসর্গের গুণ-বিভূষিত। এগুলি লোক-সংস্থিতির পক্ষে উচ্চাঙ্গের গুণ-বিশেষ। এতজ্জাতীয় উন্নত গুণসম্পদ ও তদ্বাহী বীজসম্পদের অধিকারী ব'লে বিপ্রের পরই ক্ষত্রিয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে সমাজে।

বৈশ্যের স্থান

তারপর হ'ল বৈশ্য। কৃষি, শিল্প, উৎপাদন, বণ্টন ও বাণিজ্য, এক-কথায়, অর্থনৈতিক জীবনের দায়িত্ব বৈশ্যের উপর। বৈশ্যের সততা ও দক্ষতার উপর জাতির অস্তিত্ব ও উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-রক্ষার্থে, রাজ্যরক্ষার্থে এবং লোককল্যাণার্থে দান বৈশ্যের অবশ্য করণীয়। বৈশ্য ধন আহরণ করবে—কিন্তু তা' সেবার মাধ্যমে মানুষকে পুষ্ট ক'রে। অর্থাৎ, ঐ আহরণটা হওয়া চাই সৎপথে। আর, ঐ আহৃত অর্থের বিনিয়োগও হওয়া চাই সৎকাজে। শিল্প-বাণিজ্যের জন্য মূলধন-গঠনও সৎকাজের অন্তর্গত যদি কিনা ঐ শিল্প-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য হয় সমাজসেবা ও রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অভ্যুদয়-সাধন। সপরিবেশ জীবনবৃদ্ধির জন্য যা' করা হয়, তাই ধর্ম্ম। তাই, অর্থনীতিও ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এদিক দিয়ে বৈশ্যের জৈবসম্পদ ও তদনুস্যূত গুণপনার মূল্য কতখানি তা' সহজেই অনুমেয়।

শূদ্রের স্থান

তারপরেই হ'ল শূদ্রের স্থান। শূদ্র দেহবলে বলীয়ান। সমাজ-সংস্থিতির জন্য দেহবল ও কায়িকশ্রমের প্রয়োজন অপরিসীম। তাই, শূদ্রের জৈবসম্পদ ও কর্ম্মশক্তির মূল্যও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী সমাজসেবাই প্রত্যেক বর্ণের কাজ। মানবমাত্রেই মূলতঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সেবক। এই তার মৌল পরিচয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর স্থান ও মান নির্ণয়ের হেতু

চারটি বর্ণের জৈব-সংস্থিতি ও তন্নিহিত গুণাবলীর তুলনামূলক উৎকর্ষ-বিচারের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে, ক্রমাভিব্যক্তির এলাকায় প্রত্যেকটি গুচ্ছের স্থান ও মান নির্ণয় যা'তে পরিণয়-প্রয়োজনায় প্রতিলোম-সংযোগ কঠোরভাবে এড়িয়ে বিহিত মিলন সংগঠন করা যায়। তাছাড়া, সব মানুষকে একশা করায় কোন লাভ নেই। প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও স্থান দেওয়া প্রত্যেকের পক্ষেই কল্যাণকর। সেইজন্যই সামাজিক জীবনে বিধিসম্মত পন্থায় বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ক্রমিক স্তরবিন্যাস ও পর্য্যায়ীকরণ প্রয়োজন। কারণ, উন্নত যে তার প্রতি সহজ আনতি ও শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়েই মানুষ উৎকর্ষ লাভ করে। আর, এই আনতি ও শ্রদ্ধার অর্থ এ নয় যে, কেউ তার স্বকীয় সাত্বত বৈশিষ্ট্য উল্লঙ্ঘন ক'রে বা বিসর্জ্জন দিয়ে অন্যের বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবে। তা' সম্ভবও নয়, এবং তা' সম্ভব হ'লেও লোকসান বই লাভ ছিল না। শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর-দিয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্যসম্মত জীবনীয় চলনই আরো সমুন্নত হয়। নব-নব সদভ্যাস, সদ্‌গুণ, নূতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে জীবনে। আর, এই শ্রেয়-শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে একটা পারস্পরিক প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নতর বর্ণের যেমন থাকবে শ্রদ্ধা, নিম্ন বর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণেরও তেমনি থাকা চাই আন্তরিকতাপূর্ণ স্নেহল আত্মীয়তার বোধ। পরস্পরের মধ্যে সংযোগ যত বেশি থাকবে ততই জাতি শক্তিমান হ'য়ে উঠবে। সামাজিক ঐক্যবিধানে একাদর্শে আনতি ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। তা'ছাড়া, মানুষ ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে সুনিষ্ঠ থেকে যত রকমারি বৈশিষ্ট্যবান মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকে, ততই তার পক্ষে লাভ। এতে তার চরিত্র, অভিজ্ঞতা ও বোধবিভূতি আরও সমৃদ্ধ, সমঞ্জসা ও উদার হ'য়ে ওঠে।

বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর নির্ভরশীলতা

চতুর্ব্বর্ণের সাংগঠনিক কাঠামোই এমন যে এতে বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া, সম্মান, প্রভুত্ব, অর্থ বা দেহবলের দম্ভে কেউ যাতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অন্যকে উপেক্ষা করতে না পারে, তারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে এর মধ্যে। বিপ্র তার ত্যাগপূত চরিত্র ও সেবার বলে

শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদার অধিকারী। সমাজের উপর তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। কিন্তু এই বিপ্রের হাতে ধন-সম্পদ নেইকো, লোক-সম্পদই তার একমাত্র সম্পদ্। তার একদিকে যেমন আছে আশাতীত সামাজিক সম্মান, অন্যদিকে তেমনি আছে অকিঞ্চনতা। যার ফলে লোকের প্রীতি-অবদানই তার উপজীব্য। তাই, মর্য্যাদা তাকে আত্মহারা করার সুযোগ পায় কমই। ক্ষত্রিয়েরা রাজার জাত। তাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা। কিন্তু তারা ধনের মালিক নয়। ধনের মালিক বৈশ্য। তাছাড়া, লোকস্বার্থী বিপ্র বা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনুশাসন মেনে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে হবে তাদের। তাই, রাজকীয় প্রভুত্ব তাদের দুর্ব্বিনীত ক'রে তোলার সুযোগ পায় না। আবার, বৈশ্যের হাতে ধন থাকলেও ব্রহ্মণ্যশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির পরিচালনাধীন হ'য়ে চলতে হবে তাকে। নইলে, তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনের তলে প'ড়ে যেতে হবে। তাই, অর্থ থাকলেও বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থার অধীনে বৈশ্যের যথেচ্ছ চলনের অবকাশ বিরল। শূদ্র বাহুবলসমন্বিত হ'লেও তাকে সমাজশক্তি ও সমাজকল্যাণের অনুগত থাকতে হবে। তাই, একটা সামগ্রিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বজায় থাকে এতে, যেমন থাকে আমাদের দেহ-বিধানে। মস্তিষ্ক, হৃদয়, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা, হস্ত-পদ ইত্যাদি যেমন পরস্পরের ধারক, পালক, সহায়ক ও পরিপূরক হ'য়ে দেহবিধানকে সঞ্জীবিত ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে, বিভিন্ন বর্ণের সুসমন্বিত চলন বর্ণাশ্রমী সমাজ এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন বর্ণকেও তেমনি অক্ষত রাখে।

বর্ণবিধানে ইচ্ছামত জীবিকা-নির্ব্বাচন নিষিদ্ধ কেন?

কেউ-কেউ বলেন, বর্ণবিধানে মানুষের উন্নতি ও স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা হয়। কারণ, এতে বর্ণোচিত কর্ম্মে আবদ্ধ থাকতে হয় প্রত্যেককে। তার ইচ্ছামত যে-কোন জীবিকা গ্রহণ করতে পারে না সে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করেছি। তবে আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। বংশানুক্রমিক সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী জীবিকার ব্যবস্থা ব্যষ্টি, বংশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, দক্ষতা, নিরাপত্তাবোধ, ক্রমবিবর্ত্তন, পারস্পরিক সামঞ্জস্য, প্রগতির স্থৈর্য্যশীলতা, শরীর-মনের নিগূঢ় আগ্রহদীপনা ও উপযোগিতার সঙ্গে কর্ম্মজীবনের সঙ্গতি, ব্যর্থ-কল্পনা ও প্রয়াসের স্থগিতি, অযথা প্রতিযোগিতা ও বৃত্তিহরণ-জনিত বেকার-সমস্যার সমাধান, শান্তি, সন্তোষ, শৃঙ্খলা, স্থিরলক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতি, আত্মপ্রত্যয়,

হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সা ও প্রবৃত্তিতাড়িত লালসার নিরাকরণ ইত্যাদি কত দিক দিয়ে যে সুফলপ্রসূ তা' ব'লে শেষ করা যায় না। সাত্বত চলনের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা অবাধ, কিন্তু প্রবৃত্তি-চলনের স্বাধীনতাকে যদি খর্ব্ব না করা হয়, তবে তার ফলে ব্যষ্টির নিজের ও সমষ্টির জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে চলে। স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব-স্ব প্রকৃতিনির্দ্ধারিত সীমারেখাকে মেনে চলার ভিতরই নিহিত আছে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। ঈর্ষ্যা, আক্রোশ ও হীনত্ববুদ্ধির প্ররোচনায় বৈশিষ্ট্য ও বিধিবিসৃষ্ট অধিকারভূমিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, নিজত্বকে বরবাদ করে আর একজনের মত হ'তে চেষ্টা করায় কারও কোন লাভ নেই। ওতে মানুষ হয় অসুখী ও স্বস্তিহারা। দৈন্যদুষ্ট অসন্তোষ, গর্ব্বেপ্সা, আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিভূতি, অপরিমেয় লোভ, ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বৈশিষ্ট্যবিলোপী অন্ধ অনুকরণপ্রবণতা আজ সংক্রামক ব্যাধির মত সবাইকে আক্রমণ ক'রে উৎক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত, দিশেহারা, বিবেকবর্জ্জিত ও মনুষ্যত্বহীন ক'রে তুলছে। ঐ প্রবল আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, সারাবিশ্ব; খান-খান হ'য়ে যাচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তির অখণ্ড ভাগবত সত্তা।

জীবনের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণত্বলাভ

সুনির্ম্মল স্বরূপ-সত্তাকে যদি আমরা ভুলে যাই, আত্মিক ঐশ্বর্য্যকে যদি আমরা অবদলিত করি, তাহ'লে আমরা বাঁচব কী নিয়ে, সুখী হ'ব কী দিয়ে, শান্তি পাব কী ক'রে? বাঁচবই বা কেন? কিসের জন্য? শুধু পাশব-লালসা চরিতার্থ করবার জন্য? না, না, না। আমরা সেজন্য মানুষ হ'য়ে জন্মিনি। পশুজীবন অতিক্রম ক'রে আমরা মানুষের দেহ লাভ করেছি, মানবজীবন নিয়ে বেঁচে আছি এক ভিন্নতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা চাই প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব অর্জ্জন ক'রে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব ক'রে, স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যাশাহীন অন্তরে পরিবেশের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে অমৃতময় ক্রমবৃদ্ধিশীল একসূত্রসঙ্গত প্রেমপূর্ণ বৃহৎ জীবনের অধিকারী হ'তে। আর, তাকেই বলে ব্রাহ্মণত্বলাভ।

ব্রাহ্মণত্বলাভের পথ সকলের জন্যই উন্মুক্ত

এই ব্রাহ্মণত্বলাভের পথ চার বর্ণের প্রত্যেকের জন্যই উন্মুক্ত। আর, তাতেই

মানবজীবনের পরম সার্থকতা। এই ব্রাহ্মণত্বলাভ করতে হবে কিন্তু স্বকর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম অর্থাৎ সহজাত-সংস্কার-সম্মত শ্রেয়োমুখী চলনকে অনুসরণ ক'রে। যখন আমরা ইষ্টে সুনিষ্ঠ হ'য়ে, ইষ্টার্থী পরার্থিতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ভগবদ্দত্ত বৈশিষ্ট্যানুগ গুণপনা ও কর্ম্মক্ষমতাকে ইষ্টপ্রীত্যর্থে লোকসেবায় নিয়োগ করি—তাঁরই ইচ্ছাপূরণ ও স্বার্থপ্রতিষ্ঠাকে মুখ্য ক'রে;—তখনই আমাদের মধ্যে উন্মেষ হয় ভাগবত জীবনের। এরই ক্রমপরিণতিতে আসে ঘটে-ঘটে ইষ্টসন্দর্শন বা আত্মবোধ। তখন আমাদের অস্তিত্বই হ'য়ে ওঠে বিশ্বের প্রতিটি সত্তার পক্ষে পরম আশীর্ব্বাদস্বরূপ। প্রতিনিয়ত অতন্দ্রভাবে পরমদরদে প্রত্যেকের সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে সর্ব্বপ্রকারে বিকশিত ও বিস্ফারিত ক'রে চলাই হয় আমাদের জীবনতপ। তাতেই আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত হয়। এই পরমপরিণতির পথ প্রত্যেকের জন্য যখন খোলা, তখন এ-কথা বলা চলে না যে, বর্ণ-বিধানে মানুষের উন্নতির পথ রুদ্ধ। আর, এই পথে কেউ যদি চলে তার জাগতিক অভ্যুদয়ও অবধারিত। তার সুবিপুল, সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা তার ঐহিক, বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাকেও যে প্রতুল ও স্থিতিশীল ক'রে তুলবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একজন শূদ্র নিষ্ঠানন্দিত ছন্দে স্বকর্ম্মের অনুসরণে যদি ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞত্ব লাভ করে, তাহ'লে সে কিন্তু বিপ্রেরও গুরু হ'তে পারে। তাই, প্রত্যেকের অধিকারভূমি কতখানি বিস্তৃত তা' সহজেই অনুমেয়।

ব্রাহ্মণত্ব ও বিপ্রত্ব

কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞত্ব লাভ করেছে ব'লে ঐ শূদ্র কোন উচ্চবর্ণের কন্যা বিয়ে করতে পারে না। কারণ, একজীবনের সাধনায় তার পিতৃপরম্পরাগত বীজসম্পদ বা জনি-বিন্যাস উন্নত বিবর্ত্তন বা রূপান্তর লাভ করে না। আর, আদৌ যদি কোন সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন তার বীজসত্তায় সংঘটিত হয়, তাও স্থৈর্য্যসমন্বিত স্থায়িত্ব লাভ করে না। ঐ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন বীজসত্তায় স্থৈর্য্যসমন্বিত স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে—যদি কিনা বহুপুরুষ ধ'রে পুরুষপরম্পরায় তার সন্ততিধারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'রে চলে। তখন ঐ বংশ বিপ্রবর্ণে উন্নীত হ'তে পারে। শোনা

যায়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যদি বংশপরম্পরায় যথাক্রমে পাঁচপুরুষ, সাতপুরুষ ও চৌদ্দপুরুষ অবিচ্ছিন্নক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, তবে তারা বিপ্রবর্ণে উন্নীত হবার অধিকার লাভ করে।

চৌকস মানুষ গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা

আর একটা কথা। বিভিন্ন বর্ণের জীবিকা নির্দ্দিষ্ট থাকলেও শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক বর্ণ তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অন্যান্য বর্ণের কর্ম্মকলার অনুশীলন ক'রে সর্ব্বতোমুখী চৌকস অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পথে অগ্রসর হ'তে পারে। এতে আপৎকালে এক বর্ণের অন্য বর্ণের কাজে সাহায্য করার পক্ষে সুবিধা হয়। তাছাড়া, কোন বর্ণ যদি কখনও একযোগে ইষ্ট-কৃষ্টি ও সমাজবিরোধী চলনায় চ'লে সমাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বা অসহযোগিতা করে, তখনও সমাজকে ঠেকে পড়তে হয় না, যদি অমনতর ব্যবস্থা চালু থাকে।

বর্ণাশ্রমের বিকৃতি

এখন কথা উঠতে পারে—বর্ণবিধান যখন এতই সার্ব্বজনীন, চিরন্তন, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার ও এতই সর্ব্বতোমুখী সমাধান-সমন্বিত, তখন তা' হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ পূর্ণগৌরবে অধিষ্ঠিত নয় কেন? আর, তা' মেনে চলা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের আজ এই শতধাবিচ্ছিন্ন দীন মলিন মূর্ত্তি কেন? তার উত্তরে আমরা বলব, কোন জীবন নীতি যতই কার্য্যকরী হোক না কেন, তা' মানা না-মানা মানুষের ইচ্ছাধীন। আর, তার পূর্ণ সুফল পেতে গেলে দেশকাল-পাত্রানুযায়ী তা' বিধিমাফিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসরণ করা চাই। বর্ণবিধানের অনুসরণ ক'রে আমরা অমঙ্গলের অধিকারী হইনি, অমঙ্গল যদি কিছু ঘ'টে থাকে তা' ঘটেছে বর্ণবিজ্ঞানকে অমান্য করার ফলে, তাকে বিকৃত করার ফলে। ন্যাংড়া আমের বিশুদ্ধ বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদের পরিচয় যদি পেতে হয়, তা' একটা পচা ন্যাংড়া আম থেকে মিলবে না। তা' বরং আমাদের জুগুপ্সাকেই উদ্রিক্ত করবে। তাই, বর্ণাশ্রমী সমাজের আদর্শ হিসাবে যদি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজকে তুলে ধরা হয়, তা' থেকে অবিকৃত সত্য পরিচয় পাওয়া যাবে না।

মানবসমাজের ভবিষ্যৎ

তবে পরম ভরসার কথা এই যে, বর্ণাশ্রমী সমাজের মধ্যে তপঃপ্রাণতা ও বিবাহধারা যে-সব পরিবারে বরাবর ঠিক আছে, তাদের মধ্যে যে উন্নত বীজসত্তা বিদ্যমান, তা' ভবিষ্যৎ মানবকল্যাণের পক্ষে এক মহামূল্য সম্পদ-বিশেষ। এই পূতবীজসত্তাকে আশ্রয় ক'রেই বার-বার লোকপাবন মহামানবের আবির্ভাব হচ্ছে হিন্দু-সমাজের মধ্যে। অন্যত্রও যেখানে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছে বা হচ্ছে, তারও ক্ষেত্র জুগিয়েছে পবিত্র কুলসম্ভূত পূতদম্পতির দল। অজ্ঞাতসারে সে-সব পরিবারে বর্ণাশ্রম-উদ্দিষ্ট তপঃপ্রাণতা ও সঙ্গতিশীল বিবাহের ধারা অনুসৃত হয়েছে। দিব্যজনন বা শুভজনন যেখানেই সংঘটিত হয়, তা' বিহিত বিধির অনুবর্ত্তনেই সম্ভব হয়। এ হ'ল অপরিবর্ত্তনীয় বিজ্ঞান। এর মধ্যে ভাবালুতার কোন স্থান নেইকো। বর্ণাশ্রম আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে সেই গুপ্ত চাবিকাঠি, যার প্রয়োগে মহৎ-মানুষের জনন সম্ভব হয় ও তাকে মহত্তর ক'রে গ'ড়ে তোলা যায় বিহিত সম্পোষণায়। আজকের দিনে পৃথিবীতে এই প্রয়োজনই সব চাইতে বেশি। জীবনধাত্রী সসাগরা ধরিত্রী চন্দ্রতপনতারা সবাই সাগ্রহে তাকিয়ে আছে শুভ-সংস্কারসম্পন্ন নূতন মানবকুলের প্রতীক্ষায়। সেই প্রতীক্ষার স্বর্ণসম্ভাবনাময় সফলতা মানবসমাজে ব্যাপকভাবে বর্ণাশ্রমের বিধিবিধানের বাস্তবতাসম্মত বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল। বর্ণাশ্রমের এই অমর অবদান ও অফুরন্ত সম্ভাব্যতার কথা স্মরণ ক'রে বার-বার সেই সব ত্রিকালদর্শী নিখিলমঙ্গল-বিধায়ক ঋষিমহাপুরুষের চরণে ভুলুণ্ঠিত প্রণাম জানাই—যাঁরা এর দ্রষ্টা, প্রবক্তা, প্রবর্ত্তক, আবিষ্কর্ত্তা ও সংস্থাপয়িতা মানবসমাজে।

আশ্রম-চতুষ্টয়

আমরা এত সময় প্রধানতঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য-সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। এইবার আমরা চতুরাশ্রমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। তাহ'লেই বর্ণাশ্রম সম্পর্কে আলোচনা মোটামুটিভাবে আমাদের মত ক'রে সুসম্পূর্ণ হবে। বর্ণবিভাগকে যদি বলা যায় সামাজিক জীবনের পরিকল্পনা, তবে আশ্রমবিভাগকে বলা যায় ব্যক্তিগত জীবনের পরিকল্পনা। যে-সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির জীবন সুষ্ঠু, সুসঙ্গত ও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়, সেই সমাজব্যবস্থাকে নিখুঁত ব'লে বিবেচনা করা যায়। বর্ণাশ্রমী সমাজব্যবস্থায় সেই লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট এবং তার জন্যই চতুরাশ্রম বিধান। চতুরাশ্রম প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের চারটি অধ্যায়। আশ্রম কথার তাৎপর্য্য হ'ল যেখানে বিহিত শ্রম ক'রে উৎকর্ষে উপনীত হ'তে হয়। আমরা প্রতিটি আশ্রম-সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য্যের তাৎপর্য্য

জীবনের প্রথম অধ্যায় হ'ল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম মানে ছাত্রজীবন। এটা হ'ল শিক্ষার কাল, প্রস্তুতি-পর্ব্ব। ব্রহ্মচর্য্য কথার মানে ব্রহ্মমুখী অর্থাৎ বৃদ্ধিমুখী চলনচর্য্যা। এই বৃদ্ধিমুখীনতার জীয়ন্ত প্রতীক হচ্ছেন গুরু, ইষ্ট বা আচার্য্য। তাই, ইষ্টকেন্দ্রিক চলনই ব্রহ্মচর্য্য। এতে মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তি স্বতঃই সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে এবং চরিত্রও হ'য়ে ওঠে সুগঠিত। গুরুগৃহে বাস, গুরুভক্তি এবং গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রধান অঙ্গ। আর্য্য-দ্বিজমাত্রেরই উপনয়ন-সংস্কার অবশ্য পালনীয়। উপনয়ন কথার মানেই হ'ল, গুরুসমীপে উপনীত হ'য়ে কৃষ্টির স্মারকচিহ্ন-স্বরূপ যজ্ঞসূত্র এবং আত্ম-নিবেদনের প্রতীক-স্বরূপ শিখা ধারণ করা। গুরু বা আচার্য্যই হলেন ব্রহ্মের ব্যক্ত মূর্ত্তি। তাঁর অভ্যাস-ব্যবহার, চলনচর্য্যা ও গুণাবলীকে স্ব-বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আয়ত্ত করতে গেলে প্রয়োজন শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সঙ্গ ও সেবা করা, প্রসঙ্গ ও পরিপ্রশ্নের ভিতর-দিয়ে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা, তাঁর আদেশ পরিপালন করা, ইচ্ছা পরিপূরণ করা ও তাঁর নির্দ্দেশ-অনুযায়ী অনুশীলন করা। আচার্য্যকে বলা হয়েছে ব্রহ্মদ পিতা, অর্থাৎ তিনি আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। অবশ্য, এ জিনিস দান করার বস্তু নয়, তপস্যার ভিতর দিয়ে অধিগত করবার বস্তু। স্বরূপতঃ জীব হয়তো ব্রহ্ম। কিন্তু সেই স্মৃতি ও চেতনা তার অবলুপ্ত। তাই, তত্ত্বতঃ এ-কথা সত্য হ'লেও স্বরূপ-উপলব্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তা' কথার কথা মাত্র। চাই বাস্তবে ব্রহ্মভূমিতে উপনীত হওয়া, সেখানে নিত্য স্থিতিলাভ করা, বিচরণ ও বিহার করা। সেই যে পরমজীবন, যে-জীবনে পরিবেশের প্রতি একাত্মবোধ নিয়ে সকলকে সেবায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে একসূত্রসঙ্গত জীবনবৃদ্ধির অধিগমন অতন্দ্র ও নিরন্তর হ'য়ে ওঠে,—তারই জন্য কিন্তু মানবদেহ লাভ। সেই মহাজীবনের সূত্রপাত হয় আচার্য্যকে গ্রহণ করার ভিতর-দিয়ে। তাই, একে বলা হয় নবজন্ম, দ্বিতীয় জন্ম বা পুনর্জন্ম। সেই মানুষটির কাছে না আসলে আমরা যতই পড়ি-

শুনি, যতই বিচার-বিতর্ক করি, যতই ধ্যান-ধারণা-চিন্তা করি ব্রাহ্মীজীবনের বাস্তব ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি যে কেমন, তা' আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠে না। আর, যা' আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না, তা' আমাদের বোধগ্রাহ্য বা চরিত্রগত হ'য়ে উঠতেও পারে না। তাই ব্রহ্মের ঐ সাকার বিগ্রহটি আমাদের চাই-ই। আর চাই তাঁতে নিষ্ঠা-নিপুণ-অনুরাগ। এইটিই হ'ল মূল ও মোক্ষম প্রয়োজন মানুষের। এই সম্বল হাতে থাকলে ভবসমুদ্রে আর কোন ভাবনা নেই মানুষের। সে নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও অপরাজেয় হ'য়ে উঠতে পারে জীবনযুদ্ধে। কেমন ক'রে এটা সম্ভব হয়, তাই-ই আমরা আলোচনা করব এখানে।

সংযম-সাধনা

মানুষের শক্তির সবচেয়ে বেশী অপচয় হয় প্রবৃত্তির দৌরাত্ম্য, বিক্ষোভ ও দানবীয় লীলায়। অসংযত চলনে ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মানুষের জীবন যেভাবে বিপন্ন, বিধ্বস্ত ও দুঃখদীর্ণ হয়, অমনতর আর অন্য কিছুতে হয় না। প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ জানে না কেমন ক'রে পরিবেশের সঙ্গে সাত্বত সঙ্গতি বজায় রেখে চলতে হয়। অহঙ্কার, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা, অসাধুতা, দুর্নীতিপরায়ণতা তাকে পরিবেশের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। অস্থিরতা, মানসিক চাঞ্চল্য, দুর্ব্বলতা, আত্ম-অবিশ্বাস, উদ্বেগ, ভয়, ব্যর্থতাবোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুরাশা, নৈরাশ্য, অতিলোভ, ভোগলিপ্সুতা, জড়তা, মূঢ়তা, অধীরতা, সাম্যহারাভাব ইত্যাদি নানা উপসর্গ তার শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ ও কর্ম্মক্ষমতা হরণ ক'রে নেয়। মৃত্যুদূতস্বরূপ এই সব প্রবণতাই অমৃতের উৎস-স্বরূপ হ'য়ে উঠতে পারে যদি সেগুলি সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে। আর, এই সংযম ও সুনিয়ন্ত্রণ অনায়াসসাধ্য হ'য়ে ওঠে যদি আমরা সর্ব্ববৃত্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানের জীয়ন্ত প্রতীক-স্বরূপ আচার্য্যকে ভালবাসি ও তাঁরই ভরণপূরণে যত্নবান হই। তখন তিনি যা' অপছন্দ করেন, আমাদের ভাল লাগলেও তা' আর করতে ইচ্ছা করে না, এবং তিনি যেভাবে চলা-বলা ও ভাবা পছন্দ করেন তা'তে আমাদের কষ্ট হ'লেও, তাঁর তৃপ্তি, তুষ্টি ও খুশির দিকে চেয়ে সেইভাবেই নিজেদের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের মোড় ফেরাবার উদগ্র আগ্রহ হয়।

শুভ সম্বেগের উদ্বোধন

এই শুভ আগ্রহকে দুর্নিবার ক'রে তুলতে সাহায্য করে আচার্য্যের আদর্শ চলন, চরিত্র ও উদাহরণ। মন্দের প্রতি মানুষের যেমন লোভ আছে, ভালর প্রতিও তার লোভ ও আকর্ষণ নিতান্ত কম নয়। সৎ-চলনের প্রতি সেই লোভকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে গেলে চোখের সামনে চাই একজন সৎ-চলনসিদ্ধ শ্রদ্ধার্হ মানুষ। আচার্য্য হলেন তেমনতর একজন মানুষ। প্রেমের যাদুদণ্ড বুলিয়ে সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে কেমন ক'রে মহত্তম জিনিস টেনে বের করতে হয় সে ব্যাপারে তিনি দক্ষহস্ত। পরিবেশের লাখো দোষ কখনও তাঁকে দূষিত করতে পারে না, বিচ্যুত, বিভ্রান্ত করতে পারে না। প্রতিনিয়ত আঘাত খেয়েও তিনি অটল থাকেন, বিষের ছোবল খেয়েও আপন অন্তরের অফুরন্ত অমৃতময় জারকরসে তাকে জীর্ণ ক'রে অমৃতে পর্য্যবসিত ক'রে তোলেন এবং মন্দের প্রতিক্রিয়ায় ভালই করেন এবং অনন্ত প্রেমের প্রেরণায় বিষের পরিবর্ত্তে কেবল অমৃতই বিলান। তাই ব'লে তিনি যে অসৎ-নিরোধে উদাসীন থাকেন, তা' কিন্তু নয়। কিন্তু তার পিছনেও একমাত্র প্রেরণা হচ্ছে লোকের কল্যাণসাধনের বুদ্ধি। এ হেন মানুষকে যদি কেউ একবার কায়মনোবাক্যে ভালবাসে, তার সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবায় যদি নিজেকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখে, তাহ'লে তার চরিত্রের রূপান্তর না হ'য়েই পারে না। গীতায় আছে, 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। যে যাকে শ্রদ্ধা করে, সে কালে-কালে তার মতনই হ'য়ে ওঠে নিজস্ব রকমে। এই শ্রদ্ধা কিন্তু আন্তরিক হওয়া চাই। কোন প্রবৃত্তিচাহিদা পূরণের আশায় সেইটেকে লক্ষ্য ক'রে তা' লাভ করার উপায় হিসাবে বাহ্যতঃ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখালে চলবে না। এতে চরিত্রের গায়ে হাত পড়বে না। আবার, আমাদের প্রবৃত্তি ও পছন্দের সঙ্গে যতটুকু মেলে ততটুকু তাঁকে মানলাম, যেখানে মেলে না, সেখানে প্রবৃত্তি ও পছন্দ-অনুযায়ী চললাম, তাতে কিন্তু কাজ হবে না। চাই, আচার্য্যের কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন, প্রশ্নশূন্য হ'য়ে, নিজের চাহিদা, ইচ্ছা, খেয়াল ও পছন্দের প্রতি নির্ম্মম হ'য়ে তাঁর অনুসরণ।

প্রবৃত্তির অবদমন ও নিয়ন্ত্রণ এক কথা নয়

ব্রহ্মজ্ঞের কাছে নিঃসর্ত্ত, নিঃস্বার্থ ও নিঃশেষ আত্মনিবেদনই ব্রহ্মচর্য্যের মূল উৎস। ভগবানের হাতে গেলেই মানুষ শয়তানের কবল থেকে অনেকখানি

নিস্তার পেতে পারে। নইলে কসরৎ ক'রে ইন্দ্রিয়-বিজয়, সংযম-সাধনা বা প্রবৃত্তির উপর আধিপত্যলাভ হয় না। ওতে মানুষ অনেক সময় ব্যাধি ও বিকৃতির কবলে প'ড়ে যায়। মস্তিষ্ক ও ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। অবদমন ও নিয়ন্ত্রণ এক কথা নয়। একটায় মানুষ অপমানবে পরিণত হয়, আর একটায় মানুষ মহামানব হ'য়ে ওঠার পথে অগ্রসর হয়। দুটোর মধ্যে তফাৎ ঢের। ইন্দ্রিয়-দমনের অতিসচেতন সরাসরি প্রয়াস মানুষকে প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়-চেতনা ও ইন্দ্রিয়চর্য্যার স্তরেই অভিভূত ও আবদ্ধ ক'রে রাখে। চাই মনকে উচ্চস্তরে বেঁধে রাখা, মহৎ, বৃহৎ, বিশাল ও ব্যাপক যা' তার সক্রিয় অনুচর্য্যায় ব্যাপৃত ও ব্যাপ্ত থেকে আনন্দ-বিভোর হ'য়ে চলা। এই যার স্বভাবগত হ'য়ে ওঠে সে কোন্ দুঃখে যাবে সত্তাবিরোধী অসুস্থ ও রুগ্ণ রকমে ইন্দ্রিয়-সেবায় ও প্রবৃত্তিপরিচর্য্যায় গা ঢেলে দিতে? তার কি কিছু দৈন্য বা শূন্যতা আছে যে তার পরিপূরণের জন্য কাঙ্গালের মত প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার ক'রে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষণিক আনন্দলাভের নেশায় উন্মার্গগামী হ'য়ে ছুটবে? তার যে সারা বুকখানা ভরা। অনন্তবিস্তৃত, অতলগহন, সৎ-চিৎ ও আনন্দের রাজ্যে নিরন্তর যে এগিয়ে চলেছে নিত্যনবীন উপলব্ধি, প্রাপ্তি, আবিষ্কার ও দিগ্বিজয়ের অভূতপূর্ব্ব, সদ্যোজাত পুলকশিহরণ দেহমনের কোষে-কোষে ধারণ, বরণ ও বহন ক'রে, জিতেন্দ্রিয়তাও তার কাছে হস্তামলকবৎ। তা' আদৌ কোন কৃচ্ছ্রতা, আত্মনিগ্রহ বা কঠোর ত্যাগস্বীকারের ব্যাপার নয়কো তার কাছে।

এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে প্রবৃত্তির উপর আধিপত্যলাভ ক'রে মাত্রামত প্রবৃত্তির সত্তাপোষণী ব্যবহার যদি করা যায়, তাতে ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। তবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হ'ল প্রস্তুতিপর্ব্ব। চারাগাছ বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। এই সময় এমন কিছু করা ভাল নয় যাতে মন অসংযমের দিকে প্রধাবিত হয়।

দীক্ষা ও শিক্ষা

ফলকথা, দীক্ষা থেকে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা সুরু হয়। কারণ, মানুষের ভিতরে যে সুপ্ত দেবত্ব রয়েছে তার জাগরণ ও সম্পোষণের ব্যবস্থা চাই। তারই জন্য দীক্ষা। দীক্ষা আমাদের জানিয়ে দেয় সেই রহস্য, সিদ্ধবিধি ও মূলমন্ত্র যার নৈষ্ঠিক ও নিয়মিত অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে আমরা সবদিক দিয়ে আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত ক'রে চরম দক্ষতা, যোগ্যতা ও চারিত্রিক বিকাশে উন্নীত হ'তে পারি।

ষট্‌কৰ্ম্ম

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে আচার্য্য-সমীপে উপনীত হ'য়ে দীক্ষিত হ'য়ে তাই নিত্য তপস্যাপরায়ণ হ'য়ে চলতে হয়। তপস্যা মানে সেই সব করণীয় করা, যাতে আমাদের অন্তরের হিমশীতল জড় নিশ্চেষ্টতা, তামসিকতা, নিথরভাব, আলস্য, অবসাদ কেটে গিয়ে সাত্বত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টাশীলতার তাপতপ্ত উষ্ণ আবেগ তরতরে ও গনগনে হ'য়ে ওঠে। এই তপস্যার প্রধান স্তম্ভ হ'ল যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্ম। যজনের সঙ্গে-সঙ্গে চাই যাজন। এ কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। অধ্যয়নের ভিতর-দিয়ে যেমন অনায়ত্ত বিষয়কে আয়ত্ত করতে হবে, তার অধিকার ও দখল লাভ করতে হবে, অধ্যাপনার ভিতর-দিয়ে আবার ঐ লব্ধ জ্ঞান পাকাপোক্ত ক'রে তুলতে হবে, তার প্রয়োগ-সঞ্চারণায় সিদ্ধ হ'য়ে উঠতে হবে। আবার, নিজ বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য-অনুযায়ী যেমন প্রীতির সঙ্গে পরিবেশকে দান করতে হবে, হীনম্মন্যতামুক্ত হ'য়ে পরিবেশের কাছ থেকে আবার তেমনি প্রয়োজনমত গ্রহণ করতে হবে। এই দান ও গ্রহণ দুই-ই কিন্তু সর্ত্তমুক্ত। আত্মীয় যেমন আত্মীয়ের জন্য করে। সমাজে আত্মীয়সুলভ সর্ত্তহীন পারস্পরিক সেবাবিনিময় ও আদান-প্রদানের রেওয়াজ যদি বাড়ে, তাহ'লেই মানুষ অর্থস্বার্থী না হ'য়ে মানুষ-স্বার্থী হ'য়ে উঠবার সুযোগ পায়। তাহ'লেই বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রায়ত্ত, আইনের লৌহনিগড়নিবদ্ধ, শাসনত্রস্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপলাপী, যান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে জেগে উঠবে দেশে স্বায়ত্ত, প্রীতি-প্রবুদ্ধ, প্রাণবন্ত, প্রকৃত সাত্বত সমাজতন্ত্র। সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য সর্ব্বত্র আজ এই জিনিসের প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। তা' করতে গেলে মানুষকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। তার জন্য চাই গুরুগৃহবাস ও গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার প্রবর্ত্তন। বর্ত্তমান মানবসমাজের মহাগুরু যিনি তাঁর অধিনায়কতায় তাই আজ সহস্র-সহস্র লোককে আচারবান শিক্ষাচার্য্যরূপে গ'ড়ে উঠতে হবে, যাতে তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে বিদ্যার্থীরা পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হবার প্রেরণা ও সুযোগ পায়। প্রকৃত শ্রদ্ধার্হ চরিত্র-সম্পন্ন খাঁটি মানুষ চোখের সামনে না পাওয়ায় ছাত্রদের অনেকের শ্রদ্ধাবোধ পোষণের অভাবে বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই মূল ব্যাধির নিরাকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত জগতে মানুষ গড়ার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য

তাই, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্য্য অনুধাবন ক'রে যুগোপযোগীভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে হবে। একটা আলো থাকলে যেমন সেই আলো থেকে শত-শত দীপ জ্বালিয়ে নেওয়া যায়, একজন চরিত্রবান মানুষ থাকলে তেমনি তার সাহচর্য্যে তার প্রতি সক্রিয়ভাবে শ্রদ্ধাবান শত-শত লোকের মধ্যে চরিত্রবত্তা সঞ্চারিত হ'তে পারে। এ ছাড়া চারিত্র্য-সঞ্চারণা বা চারিত্র্য-আহরণের দ্বিতীয় কোন পথ নেই বা হ'তেও পারে না। তাই, আজ চাই পরম আচার্য্যের ছন্দানুবর্ত্তী সিদ্ধচরিত্রের অগণিত শিক্ষক।

পরম-আচার্য্য যাঁর কথা বলছি, তাঁর ভিতর কিন্তু সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বিরাজ করে। তাই তাঁর কাছে এসে মানুষের কোন দিকটাই অস্ফূরিত থাকে না। অবশ্য, প্রত্যেকের বিকাশ হয় তার মত ক'রে—তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। তৎসত্ত্বেও প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভঙ্গীতে চৌকস হ'য়ে উঠবার সুযোগ পায়। এ-সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা-অধ্যায়ে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

গুরুসেবায় দক্ষতা ও চারিত্র্য

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে গুরুগৃহবাসের ফলে মানুষ কেমন ক'রে সহজেই চৌকস ও করিৎকর্ম্মা হ'য়ে ওঠে, সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রথা হ'ল ভিক্ষা ক'রে গুরুকে খাওয়ানো। ভিক্ষার মধ্যে কিন্তু আছে ভজন অর্থাৎ অনুরাগদীপ্ত দান, সেবা, প্রাপ্তি, আহরণ ইত্যাদির অনুশীলন। ব্রহ্মচারী লোকের কাছ থেকে গুরুর জন্যে ভিক্ষা করবে, তার পিছনে চাই লোকের জন্য বাস্তবে করা। কার কী প্রয়োজন, কার কী সমস্যা সে-সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে তাকে—স্বতঃ দায়িত্বশীল অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। শুধু অবহিত হ'লেই হবে না। তার সাধ্যমত বাস্তবে তার নিরাকরণ করতে হবে। এ থেকেই হয় জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়। সঙ্গে-সঙ্গে আসে তার কারণ নির্ণয় ও তা' দূরীকরণের চিন্তা ও চেষ্টা। মনে নানারকমের প্রশ্ন জাগে। থলকুল না পেয়ে একান্ত উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে গুরুর কাছে যেয়ে দাঁড়ায় প্রশ্নের ঝুড়ি নিয়ে। তিনি একের পর এক সমাধান দেন। কখনও আবার স্বাধীন

চিন্তাশক্তি ও অধ্যয়নপরায়ণতা উসকে দেবার জন্য নানারকমের ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশ দেন। সে সেইভাবে লেগে যায়। এমনি ক'রে এক-একটা জীবনগত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে তারা যে কত শেখে, কত জানে, কত বোঝে কতখানি পারঙ্গম হয় তা' ব'লে শেষ করা যায় না। এই শেখাটা হয় সত্তার আকূল আগ্রহ ও সম্বেগ নিয়ে। তাই, তা' অস্থিমজ্জায় মিশে যায়। ভার বা বোঝা হ'য়ে থাকে না, অনাত্মীকৃত থাকে না, অহঙ্কারের উন্মোচন আনে না। এই যে অধিগতকরণ, তার পিছনে অতি মহৎ অনুপ্রেরণা ক্রিয়া করে। সে-অনুপ্রেরণা হ'ল যাজন ও সেবায় পারিপার্শ্বিকের দুঃখ-ব্যথা ঘুচিয়ে, তাদের সুস্থ, স্বস্থ, তৃপ্ত ও দীপ্ত ক'রে তুলে গুরুর জন্য আহরণ করা। আত্মভরণ, আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চিন্তা ও চেষ্টা এখানে বিলকুল গায়েব হ'য়ে যায়। মুখ্য হ'য়ে থাকে গুরুর সেবা, গুরুর স্বার্থপ্রতিষ্ঠা, পরিবেশের গুরুস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখী সেবা। এককথায়, স্বার্থরহিত ইষ্টার্থী কর্ম্মতৎপরতাই তার জীবনকে অভিদীপ্ত ক'রে রাখে। এই চলনই দক্ষতাদেবীর দাক্ষিণ্যকে দিলদরিয়া ক'রে তোলে। লাভ শুধু এইটুকু নয়। গুরু ও পরিবেশের সেবায় নিজেকে যে নিঃশেষে নিয়োগ করতে পারে, স্বস্তি, শান্তি ও মুক্তির চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যায় সে। তখন গুরুই জড়িয়ে থাকেন, ছড়িয়ে থাকেন জীবনের সর্ব্বত্র, সর্ব্ব চিন্তা, চেষ্টা ও কর্ম্মের উদগাতা, উদ্দিষ্ট ও অধিনায়ক হ'য়ে। এই যে কেন্দ্রায়িত ভূমায়িতির কর্ম্মময় অনুশীলন, একেই বলে ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ। বহুধা-ব্যাপ্ত এই যে বিপুল জীবন, সে-জীবনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে নিরন্তর ঐ একের অনুরণন। সবার মধ্যেই সেই এক, সেই একের মধ্যেই সবাই, তাঁর জন্য বাঁচা, তাঁতেই বাঁচা, নইলে জীবন আর বাঁচে না, দুর্ব্বহ, দুঃসহ বোঝা হ'য়ে ওঠে যা' টানা যায় না। এমনতর এককেন্দ্রিকতার ভিতর-দিয়ে যে অভ্যাস, ব্যবহার, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও শক্তি আয়ত্ত হয় তাও কিন্তু অখণ্ড একসূত্রসঙ্গতি লাভ করে। যাকে বলে **dynamic personality** (গতিশীল ব্যক্তিত্ব), তাই-ই হ'য়ে ওঠে সে। কোন বাধা-বিঘ্নই তাকে রুখতে পারে না। সে যুগপৎ অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা, বিরোধের স্থানে মিলন, অনৈক্যের স্থানে ঐক্য, অসঙ্গতির স্থানে সঙ্গতি, অমঙ্গলের স্থানে মঙ্গল, অপারগতার স্থানে পারগতা, শূন্যতার স্থানে পূর্ণতা এবং মৃত্যুর বুক চিরে অমৃতের প্রতিষ্ঠা ক'রে চলে। এই তো ব্রাহ্মীপ্রতিভা ও প্রজ্ঞার বাস্তব নিদর্শন।

মনুষ্যত্ব ও চারিত্র্য-অর্জ্জনের পদ্ধতি

পরিশেষে আবার বক্তব্য যে, মনুষ্যত্ব ও চারিত্র্য অর্জ্জন একটা খোস-খেয়ালের ব্যাপার নয়। এটা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। যে বিধিকে অনুসরণ ক'রে এটা বাস্তবায়িত ক'রে তোলা সম্ভব হ'য়ে ওঠে সেই বিধিকে বর্জ্জন ক'রে তা কখনও সংঘটিত হবে না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে অন্তরের অনুরাগ নিয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁকে অনুসরণ ক'রে না চললে আত্মকেন্দ্রিকতা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার লৌহ-শৃঙ্খল হ'তে কিছুতেই রেহাই পাওয়া যাবে না। গুরুকেন্দ্রিক না হ'য়ে আমরা যদি তথাকথিত সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্ম অবলম্বন ক'রে চলি, তাহ'লেও অনিবেদিত, অনিয়ন্ত্রিত, অসংস্কৃত, অশোধিত মনের ঘানিতে ঘোরার হাত থেকে ত্রাণ পাব না। সোনার শিকলে যদি আমরা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে থাকি, তাহ'লে শিকল সোনার ব'লে আমাদের বন্ধন-যন্ত্রণা কিছু কম হয় না। আবার, আমরা যদি বেওয়ারিশ অবস্থায় থাকি, তখন যেকোন কুৎসিত প্রবৃত্তিও আমাদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কসুর করে না। তাই, গুরুর কাছে আত্মোৎসর্গ ক'রে তাঁর অধীন হ'য়ে থাকা চাই-ই কি চাই। এই-ই হ'ল সাত্বত স্বাধীনতা। গুরুনিষ্ঠার ভিতর-দিয়েই অযৌন-জননের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে। পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে আমাদের যে জন্ম হয় সেটা হ'ল যৌন-জনন। আর, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুতে নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ও শ্রমসুখপ্রিয়তা ন্যস্ত হওয়ার ফলে আমাদের ভিতর যে ব্যক্তিত্ব, চারিত্র্য ও জ্ঞান-জনিত যা' জাত হ'য়ে ওঠে, তাকে বলে অযৌন জনন। যৌন জননের বিধি যেমন অব্যর্থ, অযৌন জননের বিধিও তেমনি অমোঘ। চারিত্র্য-উৎপাদনের এই অমোঘ কৌশল বিশ্বের এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকটের দিনে আমরা যেন সুপরিকল্পিত পন্থায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করি।

গার্হস্থ্য-আশ্রম

বিবাহের যোগ্যতা

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরবর্ত্তী অধ্যায় হচ্ছে গার্হস্থ্য-আশ্রম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সমাবর্ত্তন লাভ করবার পর স্নাতক সহধর্ম্মিণী গ্রহণ ক'রে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করে। সমাবর্ত্তনদানে প্রধান বিচার্য্য হচ্ছে নিষ্ঠানন্দিত চারিত্র্য। বিদ্যাবত্তা, কর্ম্মদক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জ্জন করা সত্বেও কেউ যদি নিষ্ঠানন্দিত চারিত্র্যের অধিকারী না হয়, তাহ'লে সে কিন্তু সমাবর্ত্তনলাভের যোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না। অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র ব্যক্তির বিবাহ ক'রে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করার অধিকার নেই। বিবাহের সঙ্গে জড়িত আছে প্রজনন। তাই, সমাজে যা'তে কুজনন না হ'তে পারে, সেইজন্যই এই সাবধানতা অবলম্বন। আজ সমাজে এই বিচারের বালাই নেই, তাই কত জাতক যে নিষ্ঠাহীনতা ও অসংযমের সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। এর উপর আছে পরিবেশ ও শিক্ষার গলদ। তাই, খুব কম মানুষই আজ মানুষ হ'য়ে উঠতে পারছে।

সংসারাশ্রমের প্রস্তুতি

সংসারাশ্রম অতি কঠোর ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন। এর জন্য যে প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা' যদি ঠিকমত না হয়, তাহ'লে সংসারে প্রবেশ করলে মানুষ লেজে-গোবরে হ'য়ে পড়ে। এই প্রস্তুতির জন্যই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, কাঁঠাল ভাঙ্গতে গেলে আগে হাতে ভাল ক'রে তেল মেখে নিতে হয়, নইলে হাতে এমনভাবে আঠা জড়িয়ে যায় যে তা' সহজে ছাড়ান যায় না। তেমনি সংসার করতে গেলে আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ তেল মেখে নিতে হয়, নইলে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই ব্যবস্থাটুকু চাই। সাঁতার না শিখেই আমরা যদি জল-উপভোগ করবার আশায় সোজাসুজি অথৈ জলে ঝাঁপ দিই, তাহ'লে জল-উপভোগ করার বদলে সলিলসমাধি-উপভোগ করতেই বাধ্য হই।

ইষ্টনিষ্ঠ না হ'য়ে সংসার করতে গেলে অল্পবিস্তর এমনতর দশাই হ'য়ে থাকে। সংসারের মধ্যে থেকেও তার ঊর্দ্ধে কেমন ক'রে থাকতে হয়, সে-কৌশল আর আয়ত্ত করতে পারি না। তাই, সংসারে একেবারে ম'জে যাই বা নিমজ্জিত হই, কিন্তু মজা আর পাই না। কিন্তু 'যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্'। যোগই হচ্ছে সর্ব্বকর্ম্মের কৌশল। ইষ্টযোগযুক্ত হ'লেই সংসারযাত্রা সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়।

সংসার ও ধর্ম্ম

অনেকে বলেন, সংসারী লোকের ধর্ম্ম হয় না। এর উল্টো কথাটাই বরং বেশী সত্য। ধর্ম্মকে অবলম্বন না করলে ঠিকভাবে সংসার করাই যায় না। কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে যারা প্রবেশ না করে, তাদের পক্ষে ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধির নীতি মেনে চলা যতখানি প্রয়োজন, সংসারী লোকের পক্ষেও তার অধীন হ'য়ে চলা তেমনিই প্রয়োজন, বরং আরো বেশী প্রয়োজন। কারণ, সংসারী লোককে অনেক বেশী জটিলতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংকট, সমস্যা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হ'তে হয়। সেগুলি কৃতিত্বের সহিত অতিক্রম করতে গেলে ধর্ম্মই একমাত্র সহায়। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে যেনতেনপ্রকারে সেগুলির সমাধান করতে গেলে সংসার ও সমাজের দশা কী হয়, তার মর্ম্মন্তুদ চিত্র আমরা চোখের সামনে প্রতিনিয়ত দেখছি। শুধু দেখা কেন, পদে-পদে, হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। মনুষ্যত্বের মূল বুনিয়াদে যে ভাঙ্গন ধরেছে তার প্রতিকার না করলে কারও অস্তিত্ব অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ থাকবে না। মানুষের জীবনে পরিবেশ একটা প্রচণ্ড শক্তি। উন্নত পরিবেশ যেমন উন্নতির সহায়ক, অধঃপতিত পরিবেশ আবার তেমনি অবনতির সহচর। পরিবেশকে বাদ দিয়ে যখন বাঁচা অসম্ভব তখন নিজেদের যেমন ধর্ম্মপালন করতে হবে, পরিবেশের ভিতরও তেমনি ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্ম সঞ্চারিত ক'রে, তাদের সুবিনায়িত ক'রে বাঁচা-বাড়ার অনুকূল ক'রে তুলতে হবে। জীবন-চলনার পথে প্রত্যেকের পক্ষে বিশেষতঃ সংসারী লোকের পক্ষে এটা একটা অপরিহার্য্য নিত্যকরণীয়। অত্যন্ত নাছোড়বান্দা হ'য়ে এই কাজ না করলে, টিকে থাকাই দুষ্কর। বর্ত্তমান পরিবেশে সদ্ভাবে বাঁচার জন্য অত্যন্ত উচ্চ মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। সে-মূল্য হচ্ছে নিজে জীবনবৃদ্ধিদ চলনের দৃষ্টান্তস্বরূপ হ'য়ে সক্রিয় প্রচেষ্টায় অপরকেও সদ্ভাবে প্রবুদ্ধ ও প্রভাবিত ক'রে তোলা। এ কাজ অত্যন্ত

দুরূহ। কারণ, মানুষের সংস্কার, চরিত্র, প্রকৃতি ও অভ্যাস বদলাতে চায় না। তবে যদি কিছু হ'বার হয় তাহ'লে ইষ্টনিষ্ঠ চলনের ভিতর-দিয়েই হয়। তাই, সেই দিকেই মানুষকে ঠেলে দিতে হবে।

সুজনন ও ধর্ম্মাচরণ

তারও গোড়ায় আছে সুজনন। গৃহীকে তাই বিশেষভাবে নজর দিতে হবে সুজননের দিকে এবং জাত যারা তাদের ধর্ম্মনিষ্ঠ ক'রে তোলার দিকে। ধর্ম্মপরিপালন ও ধর্ম্মসঞ্চারণার দুরূহতার বিষয় চিন্তা ক'রে আমরা যদি তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত হই, তাহ'লে কিন্তু নিজেদের মরণকবর নিজেরা খুঁড়ব। কারণ, পরিবেশের দোষের ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প'ড়ে দোষের যজন, যাজন ও অনুবর্ত্তন করতে-করতে আমরাও দুষ্ট হব। এই চারিত্রিক অধোগতিই জীবনের সব চাইতে বড় ক্ষতি। এই ক্ষতির ফল জীবাত্মাকে বহন ক'রে চলতে হয় জন্মের পর জন্ম ধ'রে এবং বংশকে বহন করতে হয় পুরুষ-পরম্পরায়—যা' পরিবেশকেও কলুষিত করতে ছাড়ে না। ইষ্টনিষ্ঠা দেয় আমাদের সেই শক্তি, সেই জ্ঞান, সেই প্রেম ও সেই সহনশীলতা যার ফলে আমরা অপরের দোষের ছোবল খেয়েও তদ্ভাবভাবিত, তদাকারাকারিত ও বাস্তব জীবনে ব্যাহত না হ'য়ে পরিবেশের রূপান্তরসাধনে চেষ্টাশীল থাকতে পারি। এই সম্বলটুকু না থাকলে কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে আমরা দিন-দিন জাহান্নমের পথে চলি। শরীরকে বাঁচাতে গেলে, মনকে বাঁচাতে গেলে, চরিত্রকে বাঁচাতে গেলে, পরিবারকে বাঁচাতে গেলে তাই ইষ্টনিষ্ঠায় নিনড় হ'য়ে পরিবেশের ভিতরও তা' তীব্রভাবে সঞ্চালিত করতে হবে। নইলে নিস্তার নেই।

পরিবেশ গঠনের দায়িত্ব

সপরিবেশ চারিত্রিক বিশুদ্ধি আনয়নই মানবোচিত জীবনযাপনের প্রাথমিক সর্ত্ত ও সোপান। নইলে বাঁচতে গিয়ে নিজের অনিয়ন্ত্রিত চরিত্র ও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের চাপের তলায় প'ড়ে পলে-পলে পদে-পদে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাভোগই হবে সার। এ আমার দায়, আপনার দায়, সবার দায়। আর কারও দায় যদি না হয়, তবে একা আমার দায়। কারণ, আমি তো মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আর, কেই-ই বা চান না এটা? তাই, এ মহাদায় সম্বন্ধে যেন তিলেকের তরেও বিস্মৃতি

না আসে আমাদের। তাহ'লেই 'মহতী বিনষ্টি'। অনেক দিনের অকৰ্ম্ম, বিকৰ্ম্ম ও কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আজ আমাদের অতন্দ্র তপশ্চর্য্যায়। এই ব্রত যদি আমরা গ্রহণ করি তাহ'লে আমরা নিজেরাই সবচাইতে বেশী উপকৃত হব। চতুর্দ্দিকের প্রবৃত্তিপরায়ণতার উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভের মধ্যে থেকেও যদি আমরা তার দ্বারা রঞ্জিত না হ'য়ে ইষ্টনেশায় বিভোর থেকে পরিবেশকে ইষ্টানুরঞ্জনে রঞ্জিত ক'রে তুলতে পারি, তাহ'লে আমাদের চরিত্র যে দুর্লভ দীপ্তি লাভ করবে তার তুলনা হয় না। ব্যাপক নৈতিক অবনতির দুর্ভাগ্য হয়তো মনুষ্যত্বের মহত্তর বিকাশের সৌভাগ্যের জন্মদাতা হ'য়ে উঠবে। আর, এটাও মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশ মানে কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-পরিবেশ। তার কারণ, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নয়। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের লোকের আচার-আচরণও আমাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাই, ইষ্টের পতাকাতলে সমবেত হ'য়ে আমাদের এমনভাবে সুগঠিত ও সংগঠিত হ'য়ে উঠতে হবে যা'তে নিজেদের পরিবার ও নিকটতম পরিবেশ থেকে সুরু ক'রে আমরা পৃথিবীর কোণে-কোণে সৰ্ব্বত্র ইষ্টকে সঞ্চারিত করতে পারি। এটা পরোপকার নয়, এটা হ'ল ভালভাবে বাঁচার পটভূমি রচনা। এতখানি ব্যাপক চেতনা ও সুসংবদ্ধ চেষ্টা নিয়ে চলতে হবে আমাদের।

অসৎ-নিরোধ

এই-ই সবখানি নয়। এর সঙ্গে-সঙ্গে চাই অসৎ-নিরোধ। সত্তাপোষণী ও অসৎ-বিরোধী অভিযান একই অভিযানের অচ্ছেদ্য দু'টি দিক। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি একক অসম্পূর্ণ। তাতে সব কাজ হবে না। তাই, সংসারী মানুষের দায়িত্ব অসীম।

সাংসারিক দায়িত্ব ও আত্মোপলব্ধি

এত সব কথা শুনে অনেকে মনে করতে পারেন—এত সব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কাজ কি বাবা? বিয়ে-থাওয়া না ক'রে নিজের মত নিজে চোখ-কান বুজে কোনভাবে জীবনের গোনা দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে পারলেই তো হ'ল। তার উত্তরে বলা চলে—একক যে মানুষ তারও পরিবেশের প্রয়োজন আছে। আর, কাপুরুষের মতো পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সংগ্রামকে যদি এড়িয়ে চলা যায়,

তা'তে কিন্তু ভয়-দুর্ব্বলতাই বৃদ্ধি পায়। আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় না, আত্মোপলব্ধিও হয় না। গার্হস্থ্য-আশ্রম যে একটা অন্তহীন সংগ্রামের আহ্বান নিয়ে আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত হয়, সেটা কিন্তু একটা অভিশাপ নয়। বরং সেটা একটা আশীর্ব্বাদ। ঝঞ্ঝার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমরা নিজেরাই লাভবান হই। পদে-পদে আমরা জগৎকে চিনি, নিজেদের চিনি। আত্মজিৎ হ'তে গেলে, আত্মবিৎ হ'তে গেলে, বিশ্ববিৎ হ'তে গেলে, সাত্বত পন্থায় বিশ্বজিৎ হ'তে গেলে সংসার-সমরাঙ্গন থেকে দূরে থাকলে তা' হবে না। সংসারে পদে-পদে বিঘ্ন, বিপদ, প্রলোভন ও পরীক্ষা। আবার, এইগুলিকে অতিক্রম করাই কিন্তু মহত্তর জীবনে উত্তরণ-লাভের অপরিহার্য্য পন্থা। তাই, একদিক দিয়ে এইগুলিই কিন্তু আত্মোপলব্ধির সুবর্ণ সুযোগ। জীবন-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করতে হবে। বাঁচা ও সংসার করার উদ্দেশ্য নিজের কতকগুলি অসাত্বত, অসার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরেচ্ছা-পূরণ, ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ ধারণ-পালন-পোষণসম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বলাভ। তার বাস্তব পন্থা হচ্ছে সব ব্যাপারেই নিষ্ঠা-সহকারে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাসাধন। এই নিত্য, সনাতন, নিখিলস্পর্শী এষণা যখন আমাদের জীবনচলনার নিয়ামক, নায়ক ও চালক হ'য়ে ওঠে, তখনই কিন্তু মরলোকে থেকেও আমরা অমৃতের অভিযাত্রী হ'য়ে উঠি। ধীরে-ধীরে বিশ্বাত্মবোধে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে পরিবার-পরিবেশসহ নিজের সর্ব্বাঙ্গীণ সাত্বত কল্যাণ-সাধনের সামর্থ্য অর্জ্জন করি।

প্রবৃত্তিতাড়িত সাংসারিক জীবনে পরিণতি

নইলে সংসারের নানা সমস্যা, নানা ধাঁধা, নানা অবস্থা, নানা পরিস্থিতি, নানা চাহিদা, নানা দায়দায়িত্ব, নানা প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের চক্রতলে পিষ্ট হ'য়ে আত্মিক অখণ্ডতা হারিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে পড়ি। ঠাওর পাই না কে আমি, কেন এসেছি এই জগতে, কী করছি, কেনই বা করছি, এই করার সার্থকতাই বা কী আমার চিরন্তন সত্তার পক্ষে। কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, জৈব তাড়না ও পরিবেশের চাবকানিতে অস্থির হ'য়ে আদর্শ ও উদ্দেশ্যভ্রষ্ট অবস্থায় দিশেহারার মত মরীচিকার পিছনে ছুটোছুটি করে ক্রমাগত ক্লান্ত হওয়াই হয় সার। যার এমনতর সত্তা-অপলাপী বেহুঁশ চলন, তার কাছ থেকে পরিবার, পরিবেশ বা জগৎই বা পেতে পারে কতটুকু? তাই, গার্হস্থ্য-আশ্রম বর্জ্জন না

ক'রে আত্মবিকাশ ও সমাজ-কল্যাণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের দৃঢ়ভূমির উপর গার্হস্থ্য-আশ্রমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইষ্টনিষ্ঠার একৈক স্থিতিভূমিতে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে না পারলে জীবনের নানা বাস্তব প্রয়োজন-সাধনী গতি ও কর্ম্ম আমাদের ছিন্ন ও ছন্ন ক'রে তুলবে। জীবনের বিভিন্ন দিক একায়নী জীবনীয় সঙ্গতিসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে সুসমঞ্জস ও সুষমামণ্ডিত হ'য়ে উঠবে না।

গার্হস্থ্য-আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব

চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য-আশ্রম সমাজের প্রাণস্বরূপ। গৃহীরাই ধ'রে রাখে অন্য তিন আশ্রমীকে। তারাই সমাজের বুকে ব'য়ে আনে নূতন মানুষ। উৎপাদন, বন্টন, প্রয়োজনপূরণী নানা কর্ম্মনির্ব্বাহ ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে প্রধানতঃ তারাই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে। এই দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হ'লে প্রত্যেকেরই জীবনচলনার পথ সুগম হয়। গৃহীদের তাই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজ-নিজ কর্ত্তব্য করা দরকার। স্বকর্ম্ম ঠিক-ঠিক ভাবে করার ভিতর-দিয়ে পরমপুরুষেরই অর্চ্চনা করা হয়। কাজ করতে হবে ব্যক্তিগত লাভ ও লোভের জন্য নয়। ইষ্টানুগ সাত্বত সেবায় সমাজকে পুষ্ট করাই হবে কাজের প্রধান উদ্দেশ্য। এর ভিতর-দিয়ে বস্তুতান্ত্রিক প্রাপ্তি যেমন সুগম হ'য়ে ওঠে, তেমনি হয় আত্মশুদ্ধি। জীবিকার্জ্জনী কর্ম্মকে আমরা যদি কর্ম্মযোগে উন্নীত ক'রে তুলতে পারি, তাতে একযোগে আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। ব্যবহারিক জীবনে আমাদের প্রাপ্তিটা ফলাকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে না, বরং তা' নির্ভর করে কর্ম্মদক্ষতার বাস্তব নিয়োগের উপর। স্বার্থপর ফলাকাঙ্ক্ষা বরং কর্ম্মদক্ষতালাভ ও তার বাস্তব নিয়োগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অহংই যেখানে আদিম কর্ত্তা ও ফলভোক্তা, সেখানে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হ'তে গিয়ে তাড়াতাড়িই যেন আমাদের দম ফুরিয়ে যায়। কিন্তু পরমপিতাকে যখন আমাদের একমাত্র মালিক মনে ক'রে তাঁর অধীন হ'য়ে, তাঁর যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে তাঁর প্রীতির জন্য কর্ম্ম করি, তখন দেখতে পাই তিনি যেন ক্রমাগত শক্তি জোগাচ্ছেন। এক অফুরন্ত, অনন্ত শক্তিপ্রবাহের মধ্যে আছি আমরা। তাই, নিষ্কাম অর্থাৎ ইষ্টকাম কর্ম্মের সঙ্গে সকাম অর্থাৎ আত্মকাম কর্ম্মের কোন তুলনাই হয় না। নিষ্কাম মনোভাব যত আসে ততই কর্ত্তব্যপরায়ণতার দিকে নজর যায়, দাবী-দাওয়ার দিকে নজর যায় ক'মে।

রাষ্ট্র ও জনগণের পারস্পরিক দায়িত্ব

দাবীদাওয়া ও বিক্ষোভের এক প্রচণ্ড হাওয়া উঠেছে পৃথিবীর সর্ব্বত্র। কোথাও যেন সন্তোষের চিহ্নমাত্র নেই। এই অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়। তবে এ-কথাও ঠিক, কেউ যদি নিজের করণীয় করা সম্বন্ধে অবহিত না হ'য়ে দাবী-দাওয়া ও বিক্ষোভ নিয়ে মেতে থাকে, সেও যেমন অপরাধী, আবার নিয়োগকর্ত্তা যদি কর্ম্মীর কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও তার সাত্বত প্রয়োজনপূরণে পরাঙ্মুখ হন, তিনিও তেমনি অপরাধী। আজকাল বহু ব্যাপারই রাষ্ট্রের করায়ত্ত। রাষ্ট্র-পরিচালকদের অকর্ম্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতার ফলে দেশের বেশীরভাগ লোকের বাঁচা-বাড়ার প্রচেষ্টা যেখানে নিষ্ফলতার সম্মুখীন হয়, সেখানে কেন তাঁরা দণ্ডিত হবেন না, সেইটেই ভেবে পাওয়া যায় না। তাই, আত্মসংশোধনী ও অন্যায়নিরসনী চেষ্টা একসঙ্গেই চালাতে হবে। নইলে, বিকৃত পরিস্থিতির মধ্যে প'ড়ে গৃহস্থের দল পরিবার-পোষণের দায়ে বিকৃত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। ধর্ম্মের জাগরণ না হ'লে তাই নিস্তার নেই। চাই ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ গৃহীর দল। সঙ্গে-সঙ্গে চাই ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা ও শিক্ষানেতার দল।

অস্তিত্বরক্ষার জন্য করণীয়

আত্মরক্ষা বা অস্তিত্বরক্ষা মানুষের প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু এটা কারও একক চেষ্টার উপর নির্ভরশীল নয়। তার জন্য চাই দেশে ও জগতে সাত্বত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিহিত ধর্ম্মীয়, নৈতিক, কৃষ্টিগত, ঐতিহ্যগত, রাষ্ট্রীয়, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক পরিমণ্ডল ও পটভূমি। এই বুনিয়াদ ঠিক থাকলে, তার উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তির সপরিজন আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারে। তাই, গৃহস্থদের বৃহত্তর পরিবেশের গতিপ্রকৃতি ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে চলবে না। তাদের সজাগ দায়িত্ব নিয়ে চলতে হবে সব ব্যাপারে। জীবন-বিমুখতা, বিশ্ব-বিমুখতা, বাস্তব-বিমুখতা, স্বার্থমগ্নতা, চেতনার জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা, দায়িত্বহীনতা, আলস্য, শৈথিল্য, মানসিক অন্ধতা ইত্যাদির প্রশ্রয় দিলে তার মূল্য দিতে হয় ঢের। বিধিকে অবজ্ঞা করলে, উল্লঙ্ঘন করলে অস্তিত্বই ভাঙ্গা পড়ে। প্রকৃতি অজ্ঞতা, দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতাকে ক্ষমা করে না। সফল বাঁচার জন্য চাই বিশাল জ্ঞান, সর্ব্বতোমুখী দূরদর্শিতা, অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যাপক প্রস্তুতি। অভ্রান্ত জ্ঞানের মালিক হ'লেন ইষ্ট। ইষ্টাশ্রিত হ'য়ে তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে যখন

আমরা জীবন ও জগতের যা'-কিছুকে দেখতে অভ্যস্ত হই, তখনই আমাদের দেখাটা ও বোধটা হয় ঠিক। আর, বিশ্ববিধৃত সামাজিক জীব-হিসাবে আমাদের বাঁচার নির্ভরযোগ্য ভিত্তিভূমি রচিত হয় তখনই, যখনই আমরা সাত্বত সঙ্ঘবদ্ধতা, প্রীতিসঙ্গতি, প্রীতিসংহতি ও প্রীতিপরিচর্য্যাকে অবলম্বন ক'রে সবাইকে বাঁচাবার জন্য বদ্ধপরিকর হই—অসৎ-নিরোধী পরাক্রমকে উদ্দীপ্ত ও উদ্যত রেখে নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক, কারও সত্তা ও সর্ব্বসঙ্গতিশীল সাত্বত স্বার্থ ও অধিকারকে বিপন্ন হ'তে দেওয়া অপরাধ। কোন বিশ্বসংস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সমাজব্যবস্থা যদি তা' করে, তার কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে তার পরিবর্ত্তনসাধন করতে হবে সমীচীন পন্থায়। পরিবার-পরিজনসহ স্বচ্ছন্দে নিরাপত্তা-সহকারে বাঁচা-বাড়ার দায়ের সঙ্গে যে এতবড় বিশ্বব্যাপ্ত বিপুল দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে সে-কথা গৃহীকে ভুললে চলবে না। তার জন্য দরকার বিশ্বকল্যাণরত ইষ্টীপূত সঙ্ঘকে সর্ব্বপ্রযত্নে পুষ্ট ক'রে তোলা। যা' বাঁচলে সবার বাঁচার পথ প্রশস্ত হয়, তাকে বাঁচিয়ে রাখা আত্মপোষণেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ।

নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ

আর, বিশ্বপরিবেশকে বাঁচাবার জন্য প্রত্যেকটি গৃহীকে পালন করতে হবে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ। যজ্ঞ মানে লোকবর্দ্ধনী অনুচর্য্যা। এই নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ হ'ল ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ। অতীত ও বর্ত্তমানের অনেকের স্থূল, সূক্ষ্ম, অগণিত অবদানের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জীবনটা। তাই, প্রত্যেকের প্রতিই আমাদের করণীয় আছে। ঋষিযজ্ঞের বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে 'ইষ্টভৃতি' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ইষ্ট হলেন আমাদের পূর্ণতা-প্রদীপ্ত সত্তার প্রতীক। ইষ্টই দেন আমাদের সত্তার স্বরূপের সন্ধান। এর চাইতে বড় সেবা আর হ'তে পারে না। তাই, তাঁকে আমাদের নিষ্ঠাসহকারে নিত্যভরণ করতে হবে। ঋষিযজ্ঞকে কেউ-কেউ ব্রহ্মযজ্ঞও বলেন। ব্রহ্মযজ্ঞের মানে কেউ-কেউ বলেন বেদাদি শাস্ত্রপাঠ। ব্রহ্মযজ্ঞ মানে বৃদ্ধির যজ্ঞ। নিত্য স্বাধ্যায় জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হয়। তাতে আমাদের অন্তরস্থিত ব্রহ্ম যেমন তুষ্ট-পুষ্ট হন, তেমনি সেই জ্ঞানের প্রয়োগে আমরা সপরিবেশ বৃদ্ধির পথে চলতে পারি। তাই, নিত্য স্বাধ্যায় প্রতিটি গৃহস্থের পক্ষে নিত্য করণীয়।

দেবযজ্ঞ মানে, যাঁরা সেবা ও সাহচর্য্যে মানুষের জীবনবৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে দীপ্তিমান হ'য়ে আছেন মানুষের অন্তরে, তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করা।

পিতৃযজ্ঞ মানে, বিগত পিতৃপুরুষের তর্পণ। এতে তাঁদের স্মরণ-মননের ভিতর-দিয়ে আমরা তাঁদের ঐতিহ্য ও সদ্‌গুণাবলী আয়ত্ত করবার প্রেরণা পাই। পিতামাতা জীবিত থাকলে তাঁদেরও দেবতাজ্ঞানে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তুষ্ট করতে হবে। পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতির কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি যত পোষণ পায়, ততই মানুষ দক্ষ, কৃতি ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। অবশ্য পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি হওয়া চাই ইষ্টানুগ।

নৃযজ্ঞ মানে লোকসেবা, অতিথিসেবা। গৃহীর গৃহ হ'ল অনাশ্রিত জনের আশ্রয়-মন্দির। ক্ষুধিতকে অন্নদান, পিপাসার্ত্তকে জলদান, পীড়িতকে সেবা-শুশ্রূষাদান, ব্যথিতকে সান্ত্বনা দান, হতাশকে আশা দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, নির্ধনকে ধনদান, বিপন্নকে অভয়দান ইত্যাদির কাজ প্রতিটি গৃহস্থের অবশ্য করণীয়। প্রত্যেককে তার সাধ্যমত এ-সব কাজ করতে হবে নিজ অস্তিত্বটাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে, স্বার্থ-প্রত্যাশা না রেখে। সমাজের লোকের মধ্যে যদি এই সেবাপ্রাণতা ও দরদ জাগে, তাহ'লেই কিন্তু মানুষ অনেকখানি নির্ভয় ও দুশ্চিন্তামুক্ত হ'তে পারে।

দেশ ও দশের সেবার দায়িত্বগ্রহণ

আজ আমরা রাষ্ট্রের উপর এ-সব দায়িত্ব সঁপে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হ'তে চাচ্ছি। তাতে কিন্তু আমাদের হৃদয়বত্তা বিকশিত হবার সুযোগ পাবে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গ'ড়ে উঠবে না। রাষ্ট্র যা' করবার তা' করুক। তদুপরি চাই স্ব-স্ব পরিবারে সর্ব্বতোমুখী লোকসেবার উৎসাহ ও উদ্যোগ-আয়োজন। অস্তিত্বরক্ষার জন্য সত্তাপোষণী বাস্তবভোগের যেমন প্রয়োজন আছে, আত্মিক প্রসারণা ও সন্দীপনার জন্য তেমনি প্রয়োজন আছে ত্যাগের। ত্যাগের ভিতর-দিয়ে যে ভোগ হয়, তার তুলনা হয় না। নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার ভিতর-দিয়ে যখন আমরা অপরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি, তখন আমরা জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারি। পরিবারের মধ্যে এই পরার্থপরতার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এই পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠলে ঐ বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে ছেলেপেলেরাও মানুষ

হ'য়ে উঠবে। কে কত বড়, তার মাপকাঠি হ'ল সে কত লোকের স্বার্থে বাস্তবভাবে স্বার্থান্বিত। মানুষের একক বড়ত্বের কোন দাম নেই, যদি তার সেবা-সাহায্যে আর দশজন বড় হ'য়ে না ওঠে। দশজনকে বড় ক'রে তুলবার সম্বেগই মানুষের যোগ্যতাকে ক্রমবর্দ্ধমান ক'রে তাকে উত্তরোত্তর বড় ক'রে তোলে। এই হ'ল বড় হওয়ার পথ। পুত্র, কলত্রের প্রতি মানুষের যে-আসক্তি সে-আসক্তিরও একটা সার্থকতা আছে, যদি সেই আসক্তি অন্য দশজনের উপর ছড়িয়ে পড়ে। তখন সংসার আর বন্ধনের কারণ হয় না, তা' হয় মুক্তির দূত। জীবনের কোন অভিজ্ঞতাই নিরর্থক নয়, মিথ্যা নয়। প্রত্যেকটাই সার্থকতায় সমুন্নত হ'তে পারে। সংসারী মানুষ-হিসাবে আমরা অনেক বিচিত্র রকমের সুখও পাই, দুঃখ-কষ্টও পাই। নিজের বাস্তব অনুভূতির দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি সঙ্কল্প করি যে প্রত্যেকের সুখ যাতে বাড়ে তাই-ই করব, আমাদের থেকে বেশী সুখী যে তার সুখটাকেও নিজের সুখ মনে ক'রে সুখী হব, কাউকে কখনও ঈর্ষ্যা করব না, আবার পরের দুঃখে কাতর হ'য়ে সাধ্যমত প্রত্যেকের দুঃখ লাঘব করতে চেষ্টা করব, কারও কোনদিন দুঃখের কারণ হব না, তাহ'লে আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অনুভূতি কিন্তু আমাদের বিশ্বানুভূতির তোরণদ্বারে পৌঁছে দিতে পারে। 'অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে তুমি পেতে যাহা কর আকিঞ্চন'—এই একটি কথা যদি আমরা মেনে চলতে পারি, তাহ'লে সংসার স্বর্গ হ'য়ে যায়, এই বোধের উৎসারণের জন্যই নৃযজ্ঞ। আমরা মানুষকে প্রতিনিয়ত যোগাব প্রাণ, প্রেরণা, স্বস্তি, শান্তি, তৃপ্তি, আশা, ভরসা, আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সেবা, ভালবাসা। আমাদের গৃহে-গৃহে অপার প্রীতিস্পর্শ পেয়ে পরিবেশের প্রত্যেকটি আশাহত, বুকভাঙ্গা, মৃত্যুমুখী মানুষ মরণজয়ের সঙ্কল্পে উদ্দীপ্ত হ'য়ে আশাআনন্দে বুক ফুলিয়ে চলবে। পৃথিবী থেকে মরণকে অবলুপ্ত ক'রে জীবনকে অভিদীপ্ত ক'রে চলাই হবে আমাদের চিরন্তন অমৃত-অভিযান।

পাওয়ার পথ

ভূতযজ্ঞ মানে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির সেবা। জীবজন্তু ইত্যাদির অবদান আমাদের জীবনে নিতান্ত কম নয়। তাই, যারা আমাদের বাঁচার ব্যাপারে সাহায্য করে, সেবাযত্নে তাদের পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে হবে। এই সচেতনতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি আমাদের সজাগ থাকে, তাহ'লে কিন্তু আমাদের

বাঁচার পথ অনেক সহজ, সরল ও সলীল হ'য়ে উঠবে। না ক'রে বা না দিয়ে পাওয়ার বুদ্ধি অজ্ঞতা ও আসুরিকতারই নামান্তর, এর পিছনে আছে নির্বুদ্ধিতা, অকৃতজ্ঞতা ও শোষণলিপ্সা। বিহিত যা' তা' না ক'রে পরমপিতার অলৌকিক দয়ার উপর নির্ভর ক'রে যারা ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে চায়, তারা নিতান্ত বেকুব। ওর মধ্যে ধর্ম্মের কিছু নেইকো। অনেকে ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকে। কিন্তু ভাগ্যও তো ভজন অর্থাৎ সেবার ফল। কিছু পেতে গেলে যেমন ক'রে তা পেতে হয়, তেমন ক'রেই তা' পেতে হবে। আর, পাওয়ার উৎসকে নিরন্তর পূরণ ক'রে চলাই পাওয়ার পথ। এই-ই হ'ল বৈজ্ঞানিক ও ভাগবত বিধি। এই বিধির পথে জ্ঞানময় চেতন-চলনই কৃতকার্য্যতার কৌশল। সংসারী মানুষকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সাংসারিক জীবনে যে অকৃতকার্য্য তার আধ্যাত্মিক চক্ষুও তমসাচ্ছন্ন। কারণ, সাংসারিক জীবনে অকৃতকার্য্যতার পিছনে অন্য যত কারণই থাকুক, প্রধানতঃ দেখা যায় যে অবিন্যস্ত ও অব্যবস্থ চলন ও চরিত্রই প্রধানতঃ এর জন্য দায়ী। ধর্ম্মের মধ্যে মিথ্যা, মেকী বা ফাঁকির কারবার নেই। আছে সত্যের সাধনা। সত্যের সাধনা মানে অস্তিত্বকে অটুট করার সাধনা। নিজ অস্তিত্বকে অটুট করতে গেলে পরিবেশের অস্তিত্ব যাতে অটুট হয়, সেইদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। তাই, অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে যারা সাংসারিক-জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করতে চায়, তাদের চরিত্র, যোগ্যতা, সন্তান-সন্ততির নীতিবোধ ও পারিবেশিক সঙ্গতি দিন-দিন দুর্ব্বল হ'তে থাকে। এতে মানুষ শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই, গার্হস্থ্য আশ্রমে সততার সঙ্গে ঐহিক সাফল্য ও অভ্যুদয়ের জন্য চেষ্টা করতে হবে। ঐহিক জীবনের জন্য পারত্রিক জীবনকে বিসর্জ্জন দিলে চলবে না। পারত্রিক জীবনের জন্য ঐহিক জীবনকে বিসর্জ্জন দিলেও চলবে না। ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে উভয়-দিকই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

দশবিধ-সংস্কার

গৃহীকে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ যেমন করতে হবে, তেমনি দশবিধ সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠানেও যত্নবান হ'তে হবে। এই সবের উল্লেখ দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে শুধু হিন্দুদের উদ্দেশ্য ক'রেই

এ-সব কথা বলা হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে মানুষের জীবন, জনন ও শিক্ষাকে সার্থক করবার বৈজ্ঞানিক বিধি। এই বিধিগুলিকে স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ-অনুযায়ী যেখানে যেমনভাবে প্রবর্ত্তন ও প্রয়োগ করা চলে—সাত্বত বৈশিষ্ট্য ও কুলাচারের সঙ্গে সুসমন্বিত ক'রে সেখানে সেইভাবেই তা' করতে হবে। কারও ভাবে ব্যাঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাতে লাভও নেই কিছু। প্রত্যেকের জীবন যদি বৈশিষ্ট্যসম্মত পন্থায় সমৃদ্ধতর হ'য়ে ওঠে, তাতে তারও লাভ, পরিবেশেরও লাভ। দলাদলির মধ্যে ধর্ম্ম নেই, ধর্ম্ম আছে নিষ্ঠানন্দিত সত্তা-সম্বর্দ্ধনী চলনের মধ্যে। সেই চলনটুকু কিন্তু মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠা চাই। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী রকমফের থাকলেও, নাম, রূপ ও ভাষার বিভিন্নতা থাকলেও, তত্ত্বতঃ ও বস্তুতঃ তা' কিন্তু সর্ব্বত্র এক ও অভিন্ন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্তাসম্বর্দ্ধনা অধিগত করবার সর্ব্বসঙ্গতিঋদ্ধ, সর্ব্বোত্তম পন্থার সন্ধান আমরা পাই যুগপুরুষোত্তমের কাছে। তাই, যে যা' শিখেছি, যে যা' জেনেছি, যে যা' নিয়ে চলেছি, যুগেশ্বরের সান্নিধ্যে এসে তাকে একটু ঝালাই ক'রে নিয়ে আরোতর বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলায় দোষ কী? আমরা বুঝি এতে দোষ তো নেই-ই কিছু, এটা না করাই বরং দোষ। এতে আমরা বিবর্ত্তনের ধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে পিছিয়ে পড়ব। সাত্বত প্রগতিপন্নতার অধুনাতন জীবন্ত অধ্যায়ের সঙ্গে যদি আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও যোগ না থাকে, তাহ'লে কালের জীয়ন্ত কুটিল প্রবাহ কিন্তু আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে কসুর করবে না এবং আমরা তাতে যে কোথায় ভেসে যাব, তার ঠিক নেইকো। সাত্বত চলনের সঙ্গে জীবনের বাস্তব সমস্যা-সমাধানের সঙ্গতি কোথায় তা' খুঁজে না পেয়ে হয়তো প্রবৃত্তি-অভিভূতির কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হব। তা' কি আমরা চাই? তা' আমরা কখনও চাই না।

গার্হস্থ্য-আশ্রম সম্পর্কিত বহু প্রয়োজনীয় কথাই আমরা 'দাম্পত্য জীবন' ও 'পারিবারিক জীবন' এই দুই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গার্হস্থ্য-আশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যারা মোটামুটিভাবে জানতে চান তাদের পূর্ব্বোক্ত দুটি অধ্যায়ও সেই সঙ্গে পাঠ করতে অনুরোধ করি।

গার্হস্থ্য-আশ্রম পরীক্ষার স্থল

পরিশেষে আবার বলি—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম কিন্তু সার্থক হ'য়ে ওঠে গার্হস্থ্যাশ্রমে। সর্ব্ব-অবস্থায় ব্রহ্মে বিহার বা বিচরণ করবার ক্ষমতা কার কতটুকু হয়েছে তার পরখ হয় গার্হস্থ্য-আশ্রমের প্রচণ্ড আবর্ত্তের তলছা টানের মধ্যে। সংসারের দুর্ব্বার নিম্নাভিমুখী টান ও চাপকে সবলে প্রতিহত ক'রে সর্ব্বদা যে ঊর্দ্ধগ আকৃতি নিয়ে চলতে জানে—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধার, সম্পদ-বিপদ, উত্থান-পতন, আনন্দ-বেদনা, জয়-পরাজয়, প্রশংসা-নিন্দা, মিলন-বিরহ, জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতির দ্বন্দ্বদোদুল গোলকধাঁধাকে ভেদ ক'রে, সেই-ই কিন্তু জিত ক'রে গেল জগতে এসে। সংসারটা তার কাছে একটা আনন্দের খেলা। শয়তানকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে জীবনের বাস্তব আচরণ দিয়ে এই কথাই সপ্রমাণ ক'রে যায় যে ভগবানের সঙ্গে যার ভাব হয়, শয়তান তারে নাগাল পায় না।

বানপ্রস্থ-আশ্রম

বানপ্রস্থ আশ্রমের তাৎপর্য্য

বানপ্রস্থ-আশ্রম হ'ল মানবজীবনের তৃতীয় আশ্রম। বানপ্রস্থ কথার তাৎপর্য্য হ'ল বিস্তারে গমন। গার্হস্থ্য-আশ্রমের পর আসে বানপ্রস্থ-আশ্রম। গার্হস্থ্য-আশ্রমে পরিবেশের সেবা থাকলেও, নিজ পরিবারের ভরণ, পোষণ, সর্ব্বপ্রকার দায়দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপালন, উন্নতিসাধন, ও বিহিত ব্যবস্থাপনা সেখানে মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় অনেকখানি গ্রাস ক'রে নেয়। শেষপর্য্যন্ত সেখানে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হয় মানুষকে। কিন্তু মানুষের জীবনে চাই ক্রমিক বিস্তার। তাই, গার্হস্থ্য-আশ্রমে পুত্র উপযুক্ত হ'য়ে উঠলে তার উপর সংসারের ভার দিয়ে নিজে বেরিয়ে পড়তে হয় বৃহত্তর পরিবেশের সেবার জন্য। সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকা সম্ভব না হ'লেও সময়, মনোযোগ ও শ্রম নিয়োগ করতে হয় নিবিড় তপস্যা ও সমাজসেবায়। মানুষের মনটা বাস্তবে যত বেশী ইষ্টঝোঁকা ও পরার্থপর হয়, ততই তার সত্তার লাভ। যখনই আমি ইষ্টের, তখনই আমি সবার। সবাই তখন আমার আপনজন, আমার পরমাত্মীয়। প্রত্যেকের জন্য আমি আমার অফুরন্ত করণীয়, প্রত্যেকের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের জন্য আমি দায়ী, যেমন দায়ী আমি আমার সন্তানের উন্নতিবিধানের জন্য। মমতা ও দায়িত্বের এই ভূমায়িত বিস্তার ও ব্যাপ্তি সাধনের জন্যই মানবজন্ম। এইটি উপলব্ধি করা চাই যে, আমার আমিত্ব প্রতিটি সত্তাকে নিয়ে। যত বেশী সত্তার মধ্যে আমি ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়তে পারব আপনত্বের বোধ নিয়ে, সাত্বত সেবা ও স্বার্থানুকম্পা নিয়ে, ততই আমি আমার হারান বিরাট আমিটাকে খুঁজে পাব। সেই বিরাট আমিরই পূর্ণতম প্রকট মূর্ত্তি আমরা দেখতে পাই ইষ্টের ব্যক্তিত্বে। তাই, আমাদের বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য-অনুযায়ী আমাদের ব্যক্তিত্বকেও ইষ্টানুগ ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে তুলতে হবে। তার জন্যই বানপ্রস্থ আশ্রমে অন্যান্য পিছু টান ছেড়ে ইষ্ট ও সমাজের সেবায় অতো একান্ত ও গভীরভাবে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ার কথা, যাতে সব মনন, সব করণ, সব কথন, ক্ষুদ্র স্বার্থলেশশূন্য হ'য়ে বিরাটের চরণে নিবেদিত হ'য়ে ধন্য হয়।

বানপ্রস্থীর করণীয়

সংসার-আশ্রমে থাকাকালীন প্রধানতঃ একটা সংসার নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি। বানপ্রস্থ-আশ্রমে সবার সংসারই আমাদের নিজেদের সংসার। পরিবেশের প্রত্যেকটি সংসার যাতে সুশৃঙ্খল ও উৎকর্ষ-অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে, সেদিকে তখন আমাদের শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে চলতে হয়। তখন আমরা বড় রকমের সংসারী। ইষ্টার্থী পরার্থপরতাই তখন আমাদের একমাত্র স্বার্থ। জাতির মঙ্গল, সমাজরক্ষা, সমাজসেবা ও সমাজের উন্নতিবিধানের ব্যাপারে উদাসীন থেকে বানপ্রস্থাশ্রমী যদি শুধু সাধন-তপস্যায় সময় কাটান তাহ'লে কিন্তু তার আশ্রম-ধর্ম্ম সম্যক পালন করা হয় না। দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবেশ ঠিক না থাকলে মানুষের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাই, স্বতঃদায়িত্বে পরিবেশকে না দেখলে, জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষেই ব্যাঘাত হয়।

ব্যক্তিগত সাধনা ও সেবার সমন্বয়

তা'ছাড়া, সাধনার ক্ষেত্রে মনন ও কর্ম্ম, চিন্তাপ্রবাহী ও কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু যদি একযোগে সমসূত্রতায় কাজ না করে তাহ'লে ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বস্তি, সমতা ও স্বস্থতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হ'তে পারে। এতে সাধনায় উন্নতি দূরে থাকুক, বরং একটা একঘেয়েমি, নীরসতা ও শুষ্কতার আবির্ভাবে নিথর ভাব দেখা দেয়। মননহীন কর্ম্মের পরে আসে কর্ম্মহীন মননের ঝোঁক। আবার, কর্ম্মহীন মননশীলতার পরে আসে মননহীন কর্ম্মপ্রবণতার ঝোঁক। এমনতর একপেশে প্রতিক্রিয়াশীল রকম চলতে থাকলে কর্ম্মপ্রবণতা ও মননশীলতা দুটোই হয় সত্তা-সঙ্গতিহারা অভিভূতির ব্যাপার। কোনটা দিয়েই সত্তা উপকৃত ও সমৃদ্ধ হয় না। প্রত্যেকটাই অস্তিত্বের পক্ষে একটা সার্থকতাশূন্য জোর ক'রে চেপে বসা ব্যাপারের মত হয়, যা' দিয়ে সত্তার সুখ হয় না, অথচ যা' এড়ানোও দায়। সাম্যহারা চলনই যেন তখন বিধিলিপি হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই, অভিভূতিমুক্ত হ'য়ে সুকেন্দ্রিক বিস্তারমুখী মননশীলতা ও কর্ম্মপ্রবণতার মিতালি সাধন ক'রে চলতে হবে জীবনের সব অধ্যায়ে, বিশেষতঃ এই অধ্যায়ে। নইলে অনেককে দেখা যায় সাধনশীলতার নামে একটা নিষ্ক্রিয় দার্শনিকতা, ভাবমুগ্ধতা, সূক্ষ্মচিন্তা ও তাত্ত্বিক বিলাসিতার বিলোল উপভোগে মত্ত থাকতে। তাতে

চরিত্রের কতটা রূপান্তরসাধন হয়, তা' বলা শক্ত। চরিত্রের উন্নতি হয় চারিত্রিক দুর্ব্বলতার অভিভূতিকে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে অতিক্রম করায়। তার কাছে আত্মসমর্পণ করায় দুর্ব্বলতাই দৃঢ়তর হয়, চরিত্রের হয় অধোগতি। তা'ছাড়া, স্বার্থপর স্থূল অপবিত্র ভোগ-অভিভূতিও যেমন দূষণীয়, স্বার্থপর সূক্ষ্ম পবিত্র ভোগ-অভিভূতিও তেমনি নিন্দনীয়। ঐ অভিভূতির খোলস ভেঙ্গে আমাদের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে ইষ্টের সম্মুখে। দেখতে হবে তিনি কী চান। তিনি কিসে খুশি হন। নিজের ভাললাগা, মন্দলাগাকে উপেক্ষা ক'রে সানন্দে তাঁর চাহিদা, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা ও প্রয়োজনপূরণে নিজেদের ঢেলে দেওয়ার ভিতর-দিয়েই আমাদের দুর্ব্বলতার গিঁটগুলি ভাঙ্গতে থাকে। আর, তার ভিতর-দিয়েই হয় আমাদের জীবনের সর্ব্বোত্তম সদ্ব্যবহার। কারণ, ইষ্ট আমাদের এমনভাবে পরিচালিত করেন যাতে পরিবেশসহ আমাদের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ হয়। যে মানব-সমাজের অঙ্গীভূত হ'য়ে বংশপরম্পরায় আমাদের জীবন বিধৃত ও পরিপুষ্ট হ'য়ে অনন্তের অভিসারে চলে, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধতর হ'য়ে মানব-মনীষার নব-নব দিগন্ত উন্মোচিত করে, সেই মানবসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন—সে যে স্বীয় সত্তারই সেবা, স্বীয় আত্মারই সেবা, সকলের মধ্যেই যে আমি, আমার মধ্যেই যে সকলে। যাকে অপর বলি, সেও তো অপর নয়। আমারই এক-এক ভিন্ন রূপ। সকলের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। সকলের উন্নতিতেই আমার উন্নতি। পরিবেশের উন্নতি বাদ দিয়ে আত্মোন্নতির দাম নেই। সবার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করাই প্রকৃত আত্মোন্নতি। তেমনতর আত্মোন্নতির সাধনায় নিমগ্ন হওয়াই বানপ্রস্থের তাৎপর্য্য। তাই, নিজে ইষ্টময় হ'য়ে সকলের মধ্যেই ইষ্টকে সঞ্চারিত করাই তখনকার প্রধান করণীয়।

সমাজের সাত্বত সম্পোষণা

সমাজকে উন্নত চেতনা ও চলনে অধিষ্ঠিত করবার জন্য কতকগুলি চরিত্রবান মানুষ যদি এইভাবে ব্রতী না হয়, তাহ'লে সমাজ সাত্বত সম্পোষণার অভাবে দিন-দিন নেমে যেতে থাকে। সেই বিপদ ও বিপথ থেকে সমাজকে উদ্ধার করবার জন্য বানপ্রস্থাশ্রমীদের স্বতঃ-দায়িত্বপূর্ণ সেবা অপরিহার্য্য।

আজ সমাজের যেসব গলদ ও দুর্নীতি নিয়ে সমাজহিতৈষীরা মাথা ঘামাচ্ছেন, সভাসমিতি ক'রে বা নিন্দা-সমালোচনা ক'রে তার প্রতিকার হবে না। তার

প্রতিকারের পথ হচ্ছে কতকগুলি বহুদর্শী ইষ্টপ্রাণ ব্যক্তির অনন্যব্রত হ'য়ে সেবা ও যাজন নিয়ে সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া। এ-কাজ পোষাকী কাজ নয় এবং এক-আধজনের কাজও নয়। অগণিত লোককে বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রম ক'রে, অপরিসীম সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে অতন্দ্র কর্ম্মী হ'য়ে এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাই, বানপ্রস্থের উপযুক্ত যারা, তাদের আজ ক্ষুদ্র সংসারমগ্ন হ'য়ে থাকলে চলবে না। সন্তানসন্ততিরা যাতে পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ভাল ক'রে সংসার করতে পারে, সেইজন্য তাদের সব শক্তি উজাড় ক'রে দিতে হবে সমাজের জঙ্গল সাফ করবার জন্য এবং সুখকর পরিবেশ রচনার জন্য।

সন্ন্যাস-আশ্রম

আশ্রম-পারম্পর্য্যহীন সন্ন্যাসের ফল

জীবনের সর্ব্বশেষ আশ্রম হ'ল সন্ন্যাস-আশ্রম। সন্ন্যাস মানে সৎ-এ অর্থাৎ ইষ্টে নিজেকে সম্যক প্রকারে ন্যস্তকরণ। এই সন্ন্যাস আসে জীবনের ক্রমপরিণতির ফলস্বরূপ। এটা একটা স্বাভাবিক বিবর্ত্তন। তাই, আশ্রম-পারম্পর্য্যহীন সন্ন্যাস যুক্তিযুক্ত নয়। অনধিকারীর সন্ন্যাস গ্রহণে তার নিজেরও মঙ্গল হয় না, সমাজেরও মঙ্গল হয় না, বরং সন্ন্যাস আশ্রমেরই মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। জীবন-সংগ্রামে পরাভূত যারা, পরাঙ্মুখ যারা তাদের জন্য সন্ন্যাস নয়। শুধু একটা নেতিবাচক ভাব নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, সে সন্ন্যাসের মধ্যে বাস্তব সার পদার্থ কমই থাকে, শূন্যতাই হয় তার উপজীব্য—যা' জীবনকে কখনও পূর্ণতার পথে পরিচালিত করে না। সংসার বিরাগ হ'ল একটা নেতিবাচকভাব, যার নিজস্ব কোন মহৎ তাৎপর্য্য নেই। এটা একটা চিকিৎসাযোগ্য রুগ্ন মনোবৃত্তির লক্ষণও হ'তে পারে। যা' হ'ল মূল্যবান বস্তু, যা' হ'ল জীবনের উপজীব্য, উপভোগ্য ও বর্দ্ধনসন্দীপী, তা হ'ল ঈশ্বরানুরাগ, ইষ্টনিষ্ঠা। অনুরাগ যেখানে থাকে, সেখানে তার পরিপন্থী যা' তার প্রতি বিরাগ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু গার্হস্থ্য-আশ্রম কখনও ঈশ্বরানুরাগ ও ইষ্টনিষ্ঠার পরিপন্থী হ'তে পারে না। আমাদের জীবন ও সংসার যদি হয় ঈশ্বরার্থে, ইষ্টার্থে তবে সাংসারিক জীবন ইষ্টের প্রতিকূল হবে কেন? অনেকে অবশ্য ঈশ্বরবিমুখ হ'য়ে নিজ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য সংসার করেন। তেমনতর সংসারাশ্রম চিরকালই নিন্দনীয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে, তাকে সংসারাশ্রম বলা চলে না। ওটা সংসারাশ্রমের বিকৃতি ও ব্যভিচার। প্রকৃত সংসারাশ্রম কী, সে-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। তাই বলছিলাম আশ্রম-পারম্পর্য্যের ভিতর-দিয়ে স্বাভাবিক-ভাবে সন্ন্যাসে উপনীত হবার কথা। নইলে, প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার শুভ বিন্যাস না হ'য়ে অবদমন হ'তে পারে, কিংবা অসমাহিত অবস্থায় সেগুলি চেতনার দেউড়ির বাইরে লুকিয়ে থাকতে পারে, এবং তাতে জীবনের মূলে ঘূণ ধ'রে যেতে পারে।

সার্থক গার্হস্থ্য-আশ্রম সন্ন্যাসের পথ প্রশস্ত করে

আর, এতে জীবনের অভিজ্ঞতার দিক দিয়েও খাঁকতি থেকে যায়। সন্তানের প্রতি যে কী গভীর মমতা মানুষের হয়, তা' শুধু কল্পনার ভিতর-দিয়ে সাধারণতঃ বোঝা যায় না। আরো বহু ব্যাপার সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। রক্তমাংস-জড়িত তীব্র আসক্তি ও মমতা বস্তুটি কী তা' প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার একটা সত্য মূল্য আছে। ঐ উপলব্ধিকে ইষ্টানুগ পন্থায় সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েই আমরা জীবনের মূল সত্যের সন্ধান পেতে পারি। জৈবী ও আত্মিক অনুরাগের নিবিড়তম সসম্পূর্ণ বাস্তব পরিচয় যদি আমরা নিজ জীবনে না পাই, তবে জগৎ-সংসারকে মিথ্যা বলতে-বলতে আমাদের নিজ জীবনও মিথ্যা ও ফাঁকা হ'য়ে যাবে। সবই হ'য়ে উঠবে নিরর্থক। 'জগৎ মিথ্যা' এই নেতিবাচক কথার উপর জোর না দিয়ে বরং এই কথার উপর জোর দেওয়া ভাল যে, 'ব্রহ্মসত্য' এবং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সবই ব্রহ্ম এই কথা শুধু মুখে বললে চলবে না। এই বোধে উপনীত হ'তে হবে। এবং জীবনের ও জগতের সবকিছুকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যাতে তা' বৃদ্ধির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তবেই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান সার্থক হবে। সংসারকে বৃদ্ধির সুরে ভরপুর ক'রে তুলতে হবে, অনিত্যকে নিত্যের ছন্দানুবর্ত্তী ক'রে তুলতে হবে। তাতেই তো প্রয়োজন হয় প্রতিভার। নইলে ছাড়বই বা কী? ধরবই বা কী? সবই তো তাঁর। সব তাঁর হ'লেও যাকে ইষ্টপোষণী ক'রে তুলতে না পারব, তাই-ই তো অনর্থের সৃষ্টি ক'রে তুলবে। অবশ্য, এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে যে ইষ্টার্থী না হ'লে সংসারও যেমন অনর্থের কারণ হয়, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ত্যাগ ও সন্ন্যাসও তেমনি অনর্থের কারণ হ'য়ে উঠতে পারে। তাই, ইষ্টার্থী হ'য়ে সংসার করায় দোষ কোথায় তা' আমরা বুঝতে পারি না।

বিবাহ না করায় কী হয়

এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে। প্রত্যেকটি মানুষ তার পিতৃপুরুষের জনিবাহী একটি জীব। জনিগুলি হ'ল বংশগত ও ব্যক্তিগত বিশেষ গুণাবলীর ধারক ও বাহক। এই গুণাবলী সহস্র-সহস্র পুরুষের ফল। বিবাহ না করা বা গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ না করা মানে পিতৃপুরুষের যে বিশিষ্ট জনিমালার অছি আমি, তাকে আমার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে চিরতরে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া,

তার ধারাবাহিকতা খতম ক'রে দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ সমাজকে তার পরিণত অবদান থেকে বঞ্চিত করা। আমার কী অধিকার আছে পিতৃপুরুষের সাধনার ধনকে এইভাবে চিরতরে বিলুপ্ত ক'রে দেবার? কে জানে বিহিত বিবাহ, তপস্যা ও সুজননের ধারা বেয়ে এই জনিমালা একদিন জগৎকে মহা-মহা উপকারী মানুষ উপহার দেবে না?

মনুসংহিতার দু'টি শ্লোকও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ-স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।"

আর একটি শ্লোক হচ্ছে—

"অনধীত্য দ্বিজো বেদান্ অনুৎপাদ্য তথা সুতান্
অনিষ্টবা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ।"

ফলকথা, প্রতিটি আশ্রমের করণীয়গুলি বিহিতভাবে পরিপালন করার ভিতর-দিয়ে আমাদের এই জৈবী দেহ ধীরে-ধীরে ব্রাহ্মীতনুতে রূপান্তরিত হয়। আবার, সেগুলির অনুষ্ঠান না ক'রে মোক্ষলাভের ইচ্ছা করলে অধোগতি লাভ করতে হয়। জীবনের বিকাশলাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আশ্রমেরই একটি সুনির্দ্দিষ্ট ভূমিকা, মূল্য, প্রয়োজন ও অবদান আছে। তার কোন একটিকে অবহেলা বা অস্বীকার করলে, বেশী বা কম গুরুত্ব দিলে আত্মবিকাশ ব্যাহত হ'তে বাধ্য। প্রত্যেকটি আশ্রমকে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও বরণ করতে হবে। তার করণীয় যা' তাও নিষ্ঠাসহকারে উদ্‌যাপন করতে হবে। জলদিবাজীতে বা অসহিষ্ণুতাবশতঃ অবিধিপূর্ব্বক কিছু করলে চলবে না। ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পিছনে ছুটলেও চলবে না। আর, ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ জগৎ-সংসারকে নস্যাৎ ক'রে ব্রহ্মের পিছনে ছুটলেও কাজ হাসিল হবে না। ব্রহ্মাণ্ডের থেকে ব্রহ্ম অনেক বড়, কিন্তু জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের একজন হ'য়ে জগৎকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মে পৌঁছান যাবে না। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই। তাঁকে বাদ দিয়ে নয়। তবে এ-কথা ঠিক, মূর্ত্ত-ব্রহ্ম অর্থাৎ ইষ্টকে জীবনে যথাস্থানে রেখে যা'-কিছু করতে হবে। তবেই আমরা যেখান থেকে বিহিত প্রাপ্য যা' তা' পাব। নইলে অন্য কোন-কিছুকে মুখ্য ক'রে আঁকড়ে ধরতে গেলে তা' আমাদের অস্তিত্বকে আছড়ে মারবে। আশ্রম-পারম্পর্য্যের সাধারণ নিয়মের বিষয় আমরা বলছিলাম। তবে সাধারণ নিয়ম এই হ'লেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ইষ্ট বা আচার্য্য যাকে যেভাবে চলতে বলেন,

তার সেইভাবে চলাই শ্রেয়। কারও-কারও পক্ষে সংসারাশ্রমে প্রবেশ না করাই হয়তো ঠিক। ইষ্ট যদি কাউকে তেমনতর নির্দ্দেশ দেন, তার পক্ষে তাই করাই সমীচীন।

সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য

সন্ন্যাস-আশ্রমের সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, ইষ্টই সব মন-প্রাণ অধিকার ক'রে থাকবেন। তিনিই নিঃশেষে পেয়ে বসবেন আমাদের। ইষ্টার্থে-অন্বিত নয় এমন কোন চিন্তা থাকবে না, এমন কোন ধাঁধা থাকবে না, জীবনের যাবতীয় যা'-কিছুকে ইষ্টে অর্থান্বিত ক'রে তুলতে হবে। নিরন্তর তিনিই সত্তাকে জুড়ে থাকবেন। বিক্ষেপহীন ও বিক্ষোভহীন হ'য়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁতেই লেগে থাকতে হবে সক্রিয়ভাবে।

সন্ন্যাস ও কর্ম্ম

অনেকে বলেন, সন্ন্যাস-আশ্রমে মানুষের কোন কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু যিনি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টগত-চিত্ত হন, তাঁর কোন প্রবৃত্তিপ্রসূত কর্ম্ম না থাকলেও ইষ্টকর্ম্ম থাকেই। ইষ্টীপূত লোকসংগ্রহ ও লোকসেবার কর্ম্ম তাঁকে কখনও ছাড়ে না। প্রবৃত্তি-অভিভূতির হাত থেকে মানুষ যখন রেহাই পায়, তখনই তো তার অখণ্ড মন নিয়ে কাজ করবার শক্তি গজায়। অবশ্য, শারীরিক পটুতা হয়তো এই সময় কম থাকে। কিন্তু জ্ঞানের এত বিবৃদ্ধি ঘটে যে, জায়গায় ব'সেই তিনি অঙ্গুলি-হেলনে অসম্ভব সম্ভব করতে পারেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের আর এক নাম প্রব্রজ্যা-গ্রহণ। প্রব্রজ্যা শব্দের মানে হচ্ছে প্রকৃষ্ট গতি। ব্রজ্-ধাতুর অর্থ গমন। জীবনের চলনটা যখন হয় শুধুমাত্র ইষ্টার্থে, অন্য কোন উদ্দেশ্য যখন আর মানুষকে চালিত করতে পারে না, তখনই হয় প্রব্রজ্যা। ইষ্টীচলন যখন মানুষের একমাত্র চলন হয়, অন্য সব চলন যখন মানুষের স্থগিতি লাভ করে, তখন ইষ্টানুগ লোককল্যাণ সাধনই হয় তাঁর একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা। তাঁর প্রতিটি চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম মায় প্রতিটি নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ইষ্টে সংন্যস্ত। তাই, তা' দিয়ে মানুষের শুধু মঙ্গলই হয়। তাঁর গায়ের হাওয়া যেখানে যেয়ে পৌঁছে, সেখানেও মঙ্গলস্রোত প্রবাহিত হয়। এ-হেন সন্ন্যাসীরাই প্রকৃত লোকশিক্ষক। ইষ্ট-সংন্যস্ত, সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন, ধৃতিপোষণী জীয়ন্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁরা। তাঁদের সঙ্গ-সাহচর্য্যে

মানুষের হৃদয় পবিত্র হয়, মস্তিষ্ক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। সন্ন্যাসীর জীবন বাস্তবে কতখানি ইষ্ট-সংন্যস্ত, তার পরখ হচ্ছে তাঁর সান্নিধ্যে এসে কত মানুষের জীবন ইষ্টানুরাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে সুবিনায়িত ও সুযোগ্য হ'য়ে উঠলো, সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মানুষ যদি নানাভাবে সত্তাপোষণী পরিচর্য্যা না পায় তাহ'লে তার ইষ্ট-ন্যস্ততা বা সৎ-ন্যস্ততা একটা কথার কথা হ'য়ে দাঁড়ায় মাত্র। সেই সন্ন্যাসের সার্থকতা কোথায় তা খুঁজে পাওয়া যায় না। যাঁর সমগ্র সত্তা ঈশ্বরে সক্রিয় সমাহিতি লাভ করে, তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতাই হ'য়ে দাঁড়ায় প্রতিটি সত্তার ধারণ, পালন ও পোষণরূপ ব্যাপ্তিযজ্ঞে নিজেকে ব্যাপৃত করা। একমাত্র ঈশ্বরের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে চলাই সন্ন্যাস। আর, এই চলনই জীবন্মুক্তির পথ।

শিক্ষা

শিক্ষার ভিত্তি ও উদ্দেশ্য

সমাজ-জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু মানুষের একটা প্রধান প্রয়োজন শিক্ষা। আমরা সেই সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ও বিকশিত ক'রে তাকে সমাজের প্রয়োজন-পূরণের উপযোগী ক'রে জীবন, বৃদ্ধি ও আত্মোপলব্ধির পথে পরিচালিত করা। মানুষের জীবনে প্রধান জিনিস হচ্ছে তার যোগাবেগ অর্থাৎ সত্তা-অনুস্যূত টান। এই সক্রিয় টান যেখানে নিবদ্ধ হয়, মানুষ হ'য়েও ওঠে তেমনতর। পূর্ণতা-পিয়াসী মানুষের পূর্ণতার পিপাসা মিটতে পারে, যদি তার টান পূর্ণতার প্রতীক-স্বরূপ কোন মানুষে নিয়োজিত হয়। এমনতর মানুষের কাছে আত্মনিবেদন ক'রে তাঁর নীতি, নির্দ্দেশ ও উপদেশমত চলতে ব্রতী হওয়াকেই বলে দীক্ষাগ্রহণ। আত্মশক্তির উদ্বোধন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত অপরিহার্য্য তা' আমরা পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে, দীক্ষাই হ'ল শিক্ষার মূল ভিত্তি। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সূত্রপাত হয় এর ভিতর-দিয়েই।

সুবিবাহ ও সুজননই সুশিক্ষার মূল ভিত্তি

তারও গোড়ায় আছে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা। এগুলি জন্মের পরের ব্যাপার। কিন্তু মানুষ যদি সুজাত না হয়, তাহ'লে তার পক্ষে সুশিক্ষিত হওয়া কঠিন। সেইজন্য শিক্ষা-সংস্কার করতে গেলে আগে চাই বিবাহ-সংস্কার। নারীর বর-নির্ব্বাচন ও পুরুষের সহধর্ম্মিণীগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ যদি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গতিশীল ও বিহিত রকমে না হয়, তাহ'লে সুজাতকের আবির্ভাব অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। স্বামীর থাকবে ইষ্টের উপর প্রবৃত্তিভেদী টান এবং স্ত্রী হবে তার মনোবৃত্ত্যনুসারিণী এবং তার থাকবে স্বামীর উপর প্রবৃত্তি-ছাপান টান। এমনতর শুভ সমাবেশ যেখানে হয়, তাদের সন্তান-সন্ততি স্বভাবতঃই মাতৃভক্তি,

পিতৃভক্তি এবং শ্রেয়-শ্রদ্ধাপরায়ণতার সংস্কার নিয়েই জন্মে। এই সুকেন্দ্রিকতার ঝোঁকই মানুষের জীবনের প্রধান সম্বল। তাই-ই মানুষকে আপাতমধুর প্রলোভন ও প্রবৃত্তি-পরায়ণতার পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে জীবন-বৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। এমনি ক'রে মানুষ আত্মজয়ী হয়। যে আত্মজয়ী হয়, সেই-ই বিশ্বজয়ের সাত্বত শক্তি লাভ করে। আত্মজয়ের ভিতর-দিয়েই আসে আত্মজ্ঞান। আর, আত্মজ্ঞান যার হয় বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান ধীরে-ধীরে তার করতলগত হয়। শিক্ষার মূল রহস্য নিহিত আছে এর মধ্যে।

শ্রদ্ধা

তাই, শিক্ষাকে সঞ্জীবিত করতে গেলে প্রথমে চাই বিদ্যার্থীর মনে শ্রদ্ধাবোধকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলা। আর, পিতামাতা এবং শিক্ষকের চলনচরিত্র যত শ্রদ্ধার্হ হয়, সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের শ্রদ্ধাপ্রবণতাও তত পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। এর ভিতর-দিয়ে হয় শিক্ষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শিক্ষা একটা জীবন্ত ব্যাপার, যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। শিক্ষকের জীবন থেকে তা' ছাত্রের জীবনে সংক্রামিত হয় পারস্পরিক আগ্রহ ও অনুরাগের সূত্র বেয়ে। এই প্রাণবস্তুর অভাব যেখানে, প্রাণপূর্ণ যোগাযোগের অভাব যেখানে, শিক্ষা কখনও সার্থক হ'য়ে ওঠে না সেখানে। শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্ক যেখানে নিবিড় অথচ সম্মানযোগ্য দূরত্ব-সমন্বিত, সেখানে শুধু ছাত্রই উপকৃত হয় না, শিক্ষকও উপকৃত হন প্রতিটি ছাত্রের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও বোধবিভার অনুধাবনে।

শিক্ষকের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

শিক্ষকের চাই আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব, সুগঠিত চরিত্র, সুবিনায়িত অভ্যাস-ব্যবহার, অতন্দ্র জ্ঞান-তপস্যা, আগ্রহদীপ্ত সেবাবুদ্ধি, অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা যাতে ছাত্রের স্বতঃই ভাল লাগে তাঁকে। তাঁকে মেনে চলতে পারলে, তাঁকে খুশি করতে পারলে ছাত্র যেন ব'র্তে যায়। তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য ছাত্র যেন আকুল হ'য়ে থাকে।শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই সাত্বত সম্মোহনী প্রভাব তখনই জাগে, যখনই তিনি সক্রিয় আদর্শপ্রাণতায় বিভোর হ'য়ে চলেন। শিক্ষকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব যদি ঊর্দ্ধটানে বিধৃত হ'য়ে থাকে, তখনই তাঁর মধ্যে এমন একটি চৌম্বকশক্তির সৃষ্টি হয় যে ছাত্রেরা তাঁর পিছনে না ছুটে পারে না। অবাধ্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা

ছাত্রের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার। কিন্তু দেখতে হবে শিক্ষক তাঁর নিজ-জীবনে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিয়ে নিজের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল ক'রে তোলার সাধনায় ব্রতী আছেন কিনা। যখনই আমরা শ্রেয়ানুগত্য নিয়ে চলি তখনই আমরা আশা করতে পারি যে কনিষ্ঠেরা আমাদের মেনে চলবে। যে-সব শিক্ষক ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে খুব মাথা ঘামান, তাঁদের এই দিকটা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

পাঠানুরাগ সঞ্চার

ছাত্রদের পাঠানুরাগ ক'মে যাচ্ছে, এ সম্বন্ধেও আজকাল অনেক অনুযোগ শোনা যায়। কিন্তু শিক্ষকদের ছাত্রত্ব ও পাঠানুরাগ যদি আজীবন অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তাঁদের সঙ্গে যদি ছাত্রদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত থাকে, তাহ'লে অজ্ঞাতসারে তাঁদের পাঠানুরাগ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে যেতে পারে। উপদেশে বিশেষ কোন ফল হয় না, ফল হয় উদাহরণে। শিক্ষক যদি পড়াশোনায় আনন্দ পান, রস পান, সেটা যদি তাঁর কাছে একটা নেশার বস্তুর মত হয়, তবে তিনি পাঠ্যবিষয় এমন ক'রে উপস্থাপিত করতে পারেন, যাতে ছাত্র তার অনুশীলন না ক'রেই পারে না। বিদ্যানুরাগ যদি শিক্ষকের চরিত্রগত না হয়, নিতান্ত পেটের দায়ে যদি তিনি শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন, এবং অধিকতর অর্থাবহ বৃত্তি গ্রহণ করতে না পারার দরুন যদি অসন্তোষ, ক্ষোভ ও হতাশা পেয়ে বসে তাঁকে, তবে তাঁকে দিয়ে ছাত্রের শিক্ষা ও জীবন ব্যাহত ছাড়া উন্নত হয় না। নিষ্ঠাবান শিক্ষক তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা, প্রীতি, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে প্রতিটি ছাত্রকে যে কত বড় ক'রে তুলতে পারেন, তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

শিক্ষকের করণীয়

প্রতিটি ছাত্রের শক্তি ও সম্ভাব্যতার উপর শিক্ষকের আস্থা থাকা চাই। শিক্ষক কোন ছাত্র-সম্বন্ধে কখনও নিরাশ হবেন না। প্রতিটি ছাত্রের কোন-না-কোন দিক দিয়ে ফুটে ওঠার সম্ভাবনা আছে। মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ যদি শিক্ষকের অন্তর অধিকার ক'রে না থাকে, তাহ'লে তার শিক্ষকতা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষকের একটি বাক্য বা ইঙ্গিত যেমন ছাত্রকে আশায় উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে, তেমনি

তাঁর একটি বাক্য বা ইঙ্গিত ছাত্রের উন্নতিকে খতম ক'রে দিতে পারে। তাই, শিক্ষকের প্রতিপদক্ষেপে সাবধান হ'য়ে চলা প্রয়োজন। শিক্ষক যদি অত্যন্ত দরদী, সহনশীল, বিবেচক ও সহানুভূতিপ্রবণ না হন, তাহ'লে তাঁর যতই দক্ষতা থাকুক না কেন, তাঁকে দিয়ে ছাত্রের উপকারের থেকে অপকারই বেশী হয়। শিক্ষক হবেন একাধারে ছাত্রের মাতা ও পিতা, তিনি হবেন তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল-স্বরূপ। তাঁর কাছে এসে তাদের বুক ভ'রে উঠবে পুণ্যপ্রদীপনায়। তবেই তো শিক্ষকতা! প্রতিটি ছাত্রের জীবনের অকৃতকার্যতার জন্য শিক্ষক যদি নিজেকে দায়ী মনে করেন, এবং তাকে সর্ব্বতোভাবে কৃতি ক'রে তোলার জন্য তিনি যদি বদ্ধপরিকর হন, তাহ'লে দেখা যাবে, এক-একজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে কত ছেলে যে মানুষ হ'য়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই।

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার নিরাকরণ

ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার নিরাকরণ যদি করতে হয় তবে অভিভাবক, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষ, সমাজসেবক, দেশনেতা ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের একযোগে দরদের সঙ্গে চিন্তা ও চেষ্টা করতে হবে, কেমনভাবে প্রতিটি ছাত্র তার বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য-অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রে জীবনে সার্থক, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে। শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, জীবিকা-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এমনতর হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রতিটি ছাত্র বোধ করতে পারে যে তার উন্নতি ও বিকাশের জন্য সমগ্র পরিবেশ উদগ্র, সক্রিয় ও বদ্ধপরিকর। এই আন্তরিকতাপূর্ণ আপ্রাণতার উষ্ণস্পর্শ যদি চতুর্দ্দিক থেকে তাকে ক্রমাগত সস্নেহে আলিঙ্গন করে, তবে সেই দরদভরা আবেষ্টনীকে সে বিধ্বস্ত করতে চাইবে কোন্ দুঃখে? আশাবাদী, সৃজনাত্মক, সংগঠনমূলক, সংহতি-সন্দীপী প্রচেষ্টাই তো তাকে পেয়ে বসবে। তবে জন্মগত অপরাধপ্রবণতা যদি কারও থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা। তাদের সাধারণ ছাত্র-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাদের জন্য আলাদাভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। আর, কোন মতলববাজ রাজনৈতিক নেতা যদি ছাত্রদের আত্মশুদ্ধি, আত্মপ্রস্তুতি, গঠনমূলক কাজ ও কল্যাণকর সমাজসেবারূপ সাত্বত ছাত্রনীতি, জীবননীতি ও ছাত্রোচিত রাজনীতি থেকে বিচ্যুত ক'রে বিরোধ, বিদ্বেষ, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পথে পরিচালিত করতে চান, তা' দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হওয়া উচিত। মূলকথা এই যে,

শৃঙ্খলাবোধের উৎস হ'ল শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আস্থা। তাই, ছাত্রদের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, তাঁদের চরিত্র, চলন ও নীতি এমনতর হওয়া চাই যাতে তা' ছাত্রদের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আস্থা আকর্ষণ করতে পারে। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। চরিত্রে ফাঁক বা ফাঁকি থাকলে বুদ্ধি ও কথার জোরে তা' ঢাকা পড়বে না। ছাত্রসমাজ সবচাইতে যা' ঘৃণা করে তা' হ'ল, কপটতা, ভান, চালিয়াতি, উন্নাসিকতা, উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও ভীতিপ্রদর্শন। কিন্তু দরদী শাসন তা'রা মাথা পেতে নিতে রাজী। দুনিয়ার দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। যুগ বদলে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আজ অধিকার-সচেতন, আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ে জাগ্রত। এ-সম্বন্ধে কোন চ্যালেঞ্জ তারা বরদাস্ত করতে নারাজ। এই যুগমানসিকতা আজ ছাত্রসমাজেও প্রতিফলিত। তাই, ছাত্রদের নিয়ে যাঁরা কারবার করবেন তাঁদের নয়া জমানার নাড়ীর স্পন্দনটি সঠিকভাবে অনুভব করা চাই। আত্মাভিমান-প্রবল স্পর্শকাতরতার বশে এই বাস্তবতাকে বিকৃতি ব'লে নস্যাৎ ক'রে দিতে চাইলে চলবে না। একে সমীচীন স্বীকৃতি দিয়ে বিহিত পন্থায় ছাত্রসমাজকে দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। কিছু সংখ্যক অশ্রদ্ধাপরায়ণ, দুর্ব্বিনীত ছাত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করবার সুযোগ আমার হয়েছে। দেখেছি, যাদের তারা শ্রদ্ধা করত তাদের অবাঞ্ছনীয় আচরণে তাদের শ্রদ্ধাবোধ থেঁতলে গেছে এবং তাই-ই তাদের ক্ষিপ্ত ও বিকারগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। তারা শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে অসুখী, তাই তারা অন্তরে-অন্তরে শ্রদ্ধার্হ খাঁটি মানুষের সঙ্গ কামনা করে। শিক্ষক-সমাজ ও নেতৃবৃন্দ যদি ছাত্রদের এই অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে না পারেন, তবে শিক্ষার সমস্ত ঠাট-বাট ও আয়োজন এক মস্তবড় প্রহসনে পরিণত হবে।

ছাত্রের চরিত্রগঠনের জন্য করণীয়

শিক্ষার প্রধান জিনিস হচ্ছে চরিত্রগঠন। কতকগুলি ভাল-ভাল কথা আমরা লিখলাম, জানলাম, অথচ সেগুলি আমাদের চরিত্রগত হ'ল না, তাতে আমরা কিন্তু চিনির বলদের মত হ'য়ে থাকি। শিক্ষার কোন সুফল নিজ জীবনে ভোগ করতে পারি না। সুনীতি বা সদ্‌গুণের উপকারিতা সম্বন্ধে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝলে, জানলে বা ব্যাখ্যা করতে পারলে হবে না। চাই সেগুলি অভ্যাসে আয়ত্ত করা

এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা। তবেই সে জ্ঞান আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। সংযম-সম্বন্ধে আমি হয়তো ঝুড়ি-ঝুড়ি সারগর্ভ কথা লিখে ও ব'লে মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে পারি, মানুষের বাহবাও কুড়াতে পারি। কিন্তু আমি নিজে যদি সংযমী না হই, তবে সংযমজনিত যে স্বস্তি, শান্তি ও তৃপ্তি তাও আমি পাব না এবং অসংযমজনিত যে জ্বালা, যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ তাও এড়াতে পারব না। এতে শুধু আমারই ক্ষতি নয়, পরিবেশেরও ক্ষতি। তাই, সৎ-অভ্যাস ও সৎ-আচরণ অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধিদ অভ্যাস ও আচরণ যাতে প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে, শিক্ষার মধ্যে সেই দিকে বিশেষ ক'রে নজর দিতে হবে। সেখানেও আসে ঐ আচারবান শিক্ষকের কথা এবং শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা-ভালবাসার কথা। তাহ'লে প্রীতিপরবশ হ'য়েই ছাত্ররা সদভ্যাস অর্জ্জন করে। প্রীতির থেকে মানুষ যা' করে, সেইটেই মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়। জোর ক'রে উপর থেকে কিছু চাপালে, মানুষ সুযোগ পেলেই তা' ঝেড়ে ফেলতে চায়। অবশ্য অভ্যাসের একটা নিজস্ব শক্তি আছে। অভ্যাস-গঠন আবার নিয়মিত অনুশীলন-সাপেক্ষ ও সমাজ-সাপেক্ষ ব্যাপার। তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশও প্রয়োজন। সেইজন্য ছিল আগে গুরুগৃহবাসের প্রথা। বর্ত্তমানেও তার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য আদর্শপ্রাণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আবাসিক বিদ্যালয়ে থেকে শিক্ষাগ্রহণ অনেক সময় সুফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে। তা' সম্ভব না হ'লে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ে যোগাযোগ রেখে ছাত্রের বদভ্যাস প্রত্যাহার ও সদভ্যাস গঠনে যদি মনোযোগী হন, তাহ'লে অনেকখানি কাজ হ'তে পারে। অবশ্য, সামাজিক পরিবেশ ও সঙ্গীসাথী যদি ভাল না হয়, তাহ'লে শুধু শিক্ষক ও অভিভাবকের যুক্ত প্রচেষ্টায় সব কাজ হবে না। আর, মূলতঃ জিনিসটা নির্ভর করে ছাত্রের নিজের ইচ্ছার উপর। শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ে চেষ্টা করবেন ছাত্রের মধ্যে ভাল হওয়ার ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে তুলতে। আর, তা' সম্ভব হবে যদি তাঁরা উভয়ে আদর্শপ্রাণ হন, আদর্শের মনোমত হ'য়ে চলতে চেষ্টা করেন এবং ছাত্রকেও সুকৌশলে আদর্শের দিকে আকৃষ্ট ক'রে তোলেন। আদর্শরূপ সোণার কাঠির পরশেই মানুষের ঘুমন্ত সদিচ্ছা দুর্ব্বার হ'য়ে জেগে ওঠে। শিক্ষাটা পুঁথিগত ব্যাপার না হ'য়ে যাতে জীবনগত ও আচরণগত ব্যাপার হ'য়ে ওঠে, সেইদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। তাতেই সমাজ প্রকৃত মঙ্গলের অধিকারী হবে।

ঝোঁক বুঝে শিক্ষা দিতে হবে

আবার, প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হবে তার ঝোঁক ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। প্রত্যেকটা মানুষ জন্মে বিশেষ প্রবণতা ও সহজাত-সংস্কার নিয়ে। সব মানুষের মস্তিষ্ক-কোষ, স্নায়ু-বিধান, মানসবিন্যাস ও ঔপাদানিক সংস্থিতি সমান নয়। প্রত্যেকেই তার মত। এর সঙ্গে বংশানুক্রমিকতার কিছুটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বংশানুক্রমিকতা দিয়ে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সবখানি ব্যাখ্যা করা যায় না। যাহোক, এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী এক-এক জনের এক-এক দিকে আগ্রহ ও সত্তার ক্ষুধা থাকে। যার যে-দিকে সত্তার ক্ষুধা, তার ভিতর দিয়ে সেই দরজা দিয়ে ঢোকা যায়, তাহ'লে দেখা যায়, সে সহজে অনেক কিছু ধরতে পারে ও আয়ত্ত করতে পারে। আমরা যাদের ক্ষীণমস্তিষ্ক ব'লে মনে করি, তাদের অনেকেই হয়তো ক্ষীণমস্তিষ্ক নয়। তাদের মস্তিষ্ককোষের গোপন চাবিকাঠিটি আমরা হয়তো হাতে পাই না, তাই তা' খুলে দিতে পারি না। এই জিনিসটি অনুধাবন ও আবিষ্কার ক'রে প্রত্যেককে তার নিজস্ব পথে পরিচালিত করতে হবে। তাহ'লে দেখা যাবে ব্যক্তিগত জীবনে সে নিজেও সার্থক হ'য়ে উঠছে এবং সমাজও তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষা একটা ছাঁচে ঢালা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। যে মূলতঃ যা,' তাকে ক'রে তুলতে হবে তাই। আমকে জাম ক'রে তুলবার দরকার নেই। জামকেও আম ক'রে তুলবার দরকার নেই। আমের সার্থকতা আম হ'য়ে ওঠায়, জামের সার্থকতা জাম হ'য়ে ওঠায়।

শিক্ষার সম্পূর্ণতা

জগতে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যেরই উপযোগিতা আছে। দেখতে হবে সেই বৈশিষ্ট্য কেমন ক'রে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, এবং কেমন ক'রে তা' স্রষ্টা ও সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। এইটুকুই শিক্ষার কাজ। নইলে মানুষ হয়তো বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী দক্ষ হ'য়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেই দক্ষতা দিয়ে যদি সে শিবহীন দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি করে, তাহ'লে তার কিন্তু কোন দাম নেই। বরং সেই দক্ষতাকে বলতে হবে অনর্থের স্রষ্টা। প্রত্যেকটি মানুষকে বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী যোগ্য ক'রে তোলা এবং ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পরিবেশের সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধনকল্পে সেই যোগ্যতার বিনিয়োগ যাতে হয় প্রত্যেককে তেমনভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা—এর মধ্যেই আছে শিক্ষার মোক্ষম সার্থকতা। একদিন বর্ণাশ্রমবিহিত শিক্ষার তাৎপর্য্যই ছিল

এমনতর। আমাদের শক্তিকে জাগ্রত করাই সব নয়, চাই সেই শক্তিকে ইষ্টীপূত ও সামাজিকীকৃত ক'রে তোলা। শিক্ষার মধ্যে আছে এতখানি। নইলে, কারও শক্তি বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও যদি তা শুধু হীনস্বার্থের সেবায় বিকৃতভাবে নিয়োজিত হয়—ইষ্ট, কৃষ্টি ও সমাজের সেবার ধার না ধেরে,—তাহ'লে তাকে কখনও শিক্ষিত বলা চলে না। একজন প্রকৃত শিক্ষিত লোক সমগ্র মানব-সমাজের বান্ধব। আর, এই বোধের উদ্বোধনের জন্য আচার্য্য, পরিবার, পরিবেশ ও সমাজের সেবাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন।

সৃজনীশক্তি ও মৌলিকতার উদ্বোধন

মানুষের শিক্ষা যদি তার সহজাত সংস্কার ও শক্তির ভিত্তির উপর সুগ্রথিত ক'রে তোলা না যায়, তবে তা' আলগা-আলগা থেকে যায়, জীবনের সঙ্গে ভাল ক'রে মিশ খায় না, জোড় খায় না। তা' পরের জিনিসের মত থাকে, সম্যক্ আত্মীকৃত হয় না। সেই শিক্ষার উপর মানুষের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তা' জীবনের অঙ্গীভূত হয় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত কাম্য হ'ল নব-নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ, অতন্দ্র মানসিক সক্রিয়তা, সৃজনীশক্তি ও মৌলিক চিন্তাশক্তির উদ্বোধন। সেটা সম্ভব হয় তখনই, যখনই মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রস্রবণের সন্ধান পায়। জন্মগত সংস্কার ও সম্ভাব্যতার মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের অস্তিত্বের মূল সুর। এই-ই তার নিজস্ব সম্পদ, বাসগৃহ ও বিচরণক্ষেত্র। ঐটিই যদি উদঘাটিত না হয়, তার সঙ্গে যদি যোগসূত্র সংস্থাপিত না হয়, তাহ'লে সে কী দিয়ে কী করবে? প্রত্যেকের ভিতর ঘুমিয়ে আছে বিশিষ্ট রকমের অনন্তশক্তি। সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলাতেই তার আনন্দ, সেইটিই যেন তার জীবনের লীলাবিলাস, যে সেই গোপন-ভাণ্ডারের সন্ধান পেল না, একটা কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প'ড়ে আজীবন বাহ্যিক জ্ঞানের বোঝার ভার ব'য়ে বেড়াল, তার জীবন হ'য়ে উঠে মরুময়। সেখানে অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরপুর নিত্য-নূতন রসাল ফসল ফলবে কি ক'রে? মানুষের ভিতরের মানুষটি, তার ভিতরের স্রষ্টাটি অনেক সময় নানা অবান্তর আবরণের তলায় চাপা প'ড়ে থাকে। তার হদিশ পাওয়া চাই, তাকে আবিষ্কার করা চাই। মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর-দিয়ে সবসময় তা' সম্ভব হয় না। সেইজন্য চাই দ্রষ্টার সাহায্য, যিনি আমান মানুষটিকে দেখতে পান।

সমস্যামূলক ছাত্র

কার ভিতরে কী আছে এবং কার সার্থকতা কোন্ পথে—তা' যদি ধরা যায়, তাহ'লে কোন ছাত্র-সম্বন্ধেই নিরাশ হবার কারণ থাকে না। সমস্যামূলক ছাত্র এই কথাটিই উঠে যায়। কেউই সমস্যার কারণ নয়, আমাদের অজ্ঞাতবশতঃই সমস্যার কারণ হ'য়ে দেখা দেয় এক-একজন। যাকে সমস্যার কারণ ব'লে মনে করি, সে হয়তো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, তা' হয়তো আমরা জানি না বা ঠিক পাই না, তাই অসুবিধা দেখা দেয়। তাই, প্রত্যেকের প্রকৃতি ও সংস্কার যথাযথভাবে অনুধাবন ক'রে তাকে পরিচালিত করতে হবে তার নিজস্ব রকমে। শিক্ষকের দায়িত্ব তাই অত্যন্ত গুরুতর। প্রকৃতিকে সাহায্য করাই শিক্ষকের কাজ। প্রকৃতিতে অবরুদ্ধও করা যায় না, বদলেও দেওয়া যায় না। তাকে সমাজ-কল্যাণের দিকে মোড় ফেরান যায় মাত্র। এইটিই শিক্ষকের কাজ।

ভাষা-শিক্ষা

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, মানুষের সহজাত বোধমর্ম্মকে যদি উন্মোচিত, উদঘাটিত, বিকশিত ও সমুন্নত ক'রে তুলতে হয় তবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মাতৃভাষাকে ভিত্তি ক'রে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দিতে হবে। সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন যত হয়, ততই ভাল। তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও ভারতের মৌল সংস্কৃতি সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে। দেশের চিরায়ত সাত্বত কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা ও জীবন-দর্শনের দ্বারা ছাত্রসমাজ যাতে গভীরভাবে অনুষিক্ত, অভিদীপ্ত, অনুরঞ্জিত ও প্রেরণাপুষ্ট হ'তে পারে, তার জন্য সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। ভাষা-প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজীর কার্য্যকরী জ্ঞান অপরিহার্য্য। কারণ, সমগ্র দেশ ও সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যদি আমাদের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহ'লে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীবনসাধনার অগ্রযাত্রায় আমরা হটে যাব।

শিক্ষায় চিন্তা ও কর্ম্মের সমন্বয়

শিক্ষার মধ্যে এমনতর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে চিন্তাপ্রবাহী ও

কর্ম্মপ্রবোধী—এই দুই রকম স্নায়ুই সমান্তরালভাবে পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের জন্য এই সামঞ্জস্য-বিধানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। নইলে মানুষ সার্থকভাবে করিৎকর্ম্মা হ'তে পারে না। একজন হয়তো বোঝে খুব, কর্ম্মতৎপর নয়, তাতেও হবে না। কারণ, ঐ বন্ধ্যা বোধশক্তি তার ও তার পরিবেশের কাজে লাগবে না। আর একজনের হয়তো বিচার-বিবেচনার শক্তি নেই, কিন্তু কর্ম্মতৎপরতা আছে, তাতেও ভাল হবে না। কারণ, ঐ কর্ম্মতৎপরতা হয়তো বিপথে পরিচালিত হ'তে পারে। আমরা এর অন্যান্য কুফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। তাই এখানে আর সেগুলির পুনরুল্লেখ করব না।

পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন

বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। তাই, প্রতিটি ছাত্রের হৃদয়বৃত্তি, মস্তিষ্ক-শক্তি এবং কর্ম্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি তিনটিরই স্ফুরণের দিকে নজর দিতে হবে। একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এগুলি কিন্তু পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক। তাই, এর কোন একটিকে রুদ্ধ ক'রে রাখলে অন্য দুটির এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের স্ফুরণও ব্যাহত হ'তে বাধ্য। তাই, অনুভূতি, আবেগ, বোধৈশ্বর্য্য, সুকুমার চিত্তবৃত্তি, মননশীলতা, কুশাগ্রবুদ্ধি, মৌলিক চিন্তাশক্তি, সঙ্কল্পশক্তি, কর্ম্মদক্ষতা, সংগঠন-প্রতিভা ইত্যাদির সাম্যসঙ্গত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়ে অবহিত হ'তে হবে। শিক্ষার পরিবেশ রচনায় প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রেও সমসাময়িক বাস্তব জীবনের জটিলতা ও বৈজ্ঞানিক অভ্যুন্নতির সঙ্গে যাতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে, তার ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন-সংগ্রামরত, অতীতের উত্তরাধিকার সমন্বিত, যুগপ্রভাবাধীন বর্ত্তমান সমাজের কোনটা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লেই শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হবে না। সঙ্গীতচর্চ্চা, অঙ্কনবিদ্যা, নৃত্য, অভিনয়, বক্তৃতা, আলোচনা, সমালোচনা, বাস্তব কর্ম্মপরিচালনা, লোকপরিচালনা, দেশভ্রমণ, ব্যক্তিগত হবি বা খেয়ালের অনুশীলন ইত্যাদি শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া উচিত। সমগ্র জগৎ ও জীবনের গোটা সত্য, সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও মর্ম্মবাণীকে ব্যক্তিচেতনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জারক রসে পরিপাক ক'রে অধিগত ক'রে, ক্রমবর্দ্ধমান আত্মোপলব্ধি ও সত্তাসম্বর্দ্ধনার পথে চলাই শিক্ষার পুণ্য অভিযান। এটা শুধু ব্যষ্টিগত জীবনে

সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, একে সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত করতে হবে সমষ্টিগত জীবনে। ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার জন্য আবার বিশেষ প্রয়োজন অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের। সবচেয়ে কঠিন জিনিস হচ্ছে অখণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। মানুষের অনেক জ্ঞান, গুণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসঙ্গতি ও স্ব-বিরোধিতা থাকা অসম্ভব নয়। তা' যদি থাকে তাহ'লে ওগুলি সত্তাসম্বর্দ্ধনার সহায়ক না হ'য়ে পরিপন্থী হ'তে পারে।

সেইজন্য প্রয়োজন সত্তাসম্বর্দ্ধনার প্রতীক স্বরূপ আদর্শের প্রীতি, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই যা' কিছু জানা শেখা ও করা। ঐ এৈকেকলক্ষ্য জীবন-পরিক্রমার ফলে জীবনের সবকিছুর মধ্যে আসে এক পরম ঐক্যসূত্রনিবদ্ধতা এবং অখণ্ডতা। সবকিছুর মধ্যে ফুটে ওঠে পারস্পরিক সঙ্গতির সুর। এমনি ক'রেই প্রতিষ্ঠা হয় অখণ্ড ব্যক্তিত্বের। যার যতটুকু সম্পদ থাকে, তাই-ই হ'য়ে ওঠে সুবিন্যস্ত ও অত্যন্ত কার্য্যকরী। এর ভিতর-দিয়েই জেগে ওঠে ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, যা' কিনা মানুষকে সর্ব্বতোমুখী সার্থকতার দিকে নিয়ে যায়। আদর্শে যোগাবেগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজনের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। সেই প্রয়োজন যে সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্ব ব্যাপারে কত ব্যাপক ও কত গভীর তা' ব'লে শেষ করা যায় না। ঐ একটি ব্যাপার যথাযথভাবে সংঘটিত হ'লেই জীবনের সব দরজাই খুলে যায়। এই আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

হীনম্মন্যতার কুফল

অনেক সময় শিক্ষার মূলে থাকে ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, গর্বেপ্সা, অহমিকা ও হীনম্মন্যতা। এইগুলির প্ররোচনায় আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভে মানুষ অনেক কিছু শিখতেও পারে, করতেও পারে। কিন্তু সেই শিক্ষা মানুষের জীবনকে কখনও সার্থক করে না। অপরকে দাবিয়ে যেখানে বড় হওয়ার বুদ্ধি, সেখানেই আসে পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতি। আর, আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটাই একটা আসুরিক বুদ্ধি। ওতে মানুষ কখনও শান্তি ও তৃপ্তি পায় না, শান্তি ও তৃপ্তি দিতেও পারে না অন্যকে। আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যখন পাগল হয় তখনই দেখা যায় তার ভিতর দেবভাব ও দেবগুণ উচ্ছল হ'য়ে উঠতে থাকে। উৎস-আনুগত্য, কৃতজ্ঞতাবোধ, সকলকে সুখী ও বড় করার চেষ্টা, অপরকে ব্যথা না দেওয়া,

অপরের ক্ষতি না করা, অহঙ্কার ও অভিমানের বশবর্ত্তী না হ'য়ে ভাগবত বিধান ও বিশ্বছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা ইত্যাদি দেবোচিত গুণ তার মধ্যে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। সে যে অনন্তের ধন এবং পরমপুরুষকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর ইচ্ছাকে জগতে জয়যুক্ত ক'রে তাঁর মহিমা ও গুণগাথা ঘোষণা করার জন্যই যে তার অস্তিত্ব, সে-কথা সে ভোলে না। আদর্শপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষ এই চিরন্তন সত্যের উপর দাঁড়ায় ব'লে তার জীবন হয় অনন্ত মঙ্গলপ্রসূ। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী মানুষ কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ না রেখে নিজস্ব একটা অবান্তর উদ্দেশ্য খাড়া ক'রে তারই সেবায় ভগবৎ-প্রদত্ত শক্তি নিয়োগ করে। এ জিনিসটি শাতন-অভিভূতিরই নামান্তর মাত্র। তাতে যা' হবার তাই-ই হ'তে পারে। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, পরমপুরুষের কাছে সক্রিয় আত্মনিবেদনের মধ্যেই আছে জীবনের অর্থপূর্ণতা, আর অহং-এর কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যেই আছে জীবনের অর্থশূন্যতা অর্থাৎ নিরর্থকতা।

প্রকৃত বড়ত্বের পথ

আদর্শপ্রতিষ্ঠামুখর হ'য়ে আমরা যত অন্যকে বড় ক'রে তুলতে পারব—ইতর অহংকে আদৌ প্রশ্রয় না দিয়ে,—ততই আমরা প্রকৃত বড় হ'তে পারব। সেই সাত্বত বড়ত্বই যেন হয় আমাদের কাম্য। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ইষ্টীপূত লোককল্যাণ-কামনাকেই প্রাধান্য দিয়ে চলতে হবে। তাতেই আমরা সুখী হ'তে পারব। আমাদের অহংকে কেউ যদি বিমর্দ্দিতও করে, তৎসত্ত্বেও আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠার পিচ্ছিল পথে চলব না। আমরা যা' কিছু করব আদর্শের মুখ চেয়ে, উদ্দীপ্ত বা আহত অহং-এর পরিতোষের দিকে চেয়ে কিছু করব না। জ্ঞানবিচার দিয়ে উৎক্ষিপ্ত অহং-এর আক্রুষ্টভাবের নিরসন করব। আমরা অবশ্যই শক্তিমান হব—কিন্তু আমাদের সে-শক্তি হবে হনুমানের মত, রাবণের মত নয়। শ্রেয়ার্থপরায়ণ শক্তি, সামর্থ্য, গুণপনা ও কৃতিত্বই হবে আমাদের লব্ধব্য।

সত্তাসঙ্গত শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল

আমাদের শিক্ষা ও সাধনার অনুপ্রেরক যদি হয় আদর্শনিষ্ঠা ও আদর্শপ্রতিষ্ঠা, তবে তাতে আর একটা মস্তবড় লাভ আছে। আমরা সত্তাগত প্রীতির থেকে যা'

অর্জ্জন করি, তা' কিন্তু ধীরে-ধীরে আমাদের সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে যায় অর্থাৎ সত্তাসঙ্গত হ'য়ে ওঠে। আর, যে জ্ঞান, গুণ ও শক্তি আমাদের সত্তাসঙ্গত হ'য়ে ওঠে, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন ঠিকভাবে পরিচালিত হ'লে সেগুলির প্রবণতা কিন্তু সন্তান-সন্ততিতে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রবৃত্তির প্ররোচনায় শিক্ষা বা সাধনা শুরু হ'লে, তা কিন্তু অমনভাবে সত্তায় গেঁথে যায় না এবং তার ফলে বংশগতিও এইভাবে সমৃদ্ধ হয় না।

পারিবারিক পরিবেশ

পারিবারিক চাল-চলন, আচার-আচরণ, শান্তিময় পারিবারিক পরিবেশ, পরিবারের কৃষিক্ষেত্র, গোপালন-ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প, গবেষণাকেন্দ্র, পাঠাগার, উপাসনা-গৃহ, পারিবারিক বৈঠক ইত্যাদি যে মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, সে-সম্বন্ধে আমরা 'পারিবারিক জীবন' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ফলকথা, পারিবারিক পরিবেশকে এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় যা'-কিছু জানা, বোঝা, শেখা ও করার জন্য শিশুকাল থেকে প্রত্যেকে আগ্রহাকুল হ'য়ে ওঠে।

সেবাবুদ্ধি ও স্বাধীন জীবিকা

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা মস্তবড় প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি। এ সম্বন্ধে আমরা 'ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তৎসত্ত্বেও এখানে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন। পিতামাতা, শিক্ষক এবং পরিবার ও পরিবেশের সাধ্যমত অভাব ও প্রয়োজন-পূরণের দিকে যদি ছাত্রদের নেশা গজিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে দেখা যায়—ধীরে-ধীরে তাদের অনুধাবন ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এবং উদ্ভাবনী বুদ্ধি বেড়ে উঠছে। ভালবাসা ও সেবাবুদ্ধির দায়ে তখন তারা স্বতঃই কর্ম্মপটু হ'য়ে ওঠে। মাথাটাও তখন তাদের চারিদিকে খেলে। এইভাবে তারা চৌকস হবার পথে চলে। অর্জ্জনপটুতার হাতেখড়ি হয় এমনি ক'রে। ইষ্টভৃতি, মাতৃভক্তি ও পিতৃভৃতির উপকারিতার বিষয় আমরা আগেই প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি। যা'হোক, অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধি, লোকসম্পদ-বৃদ্ধি, অর্জ্জনপটুতা, মস্তিষ্কের উদ্ভাবনশীলতা, চিন্তাশীলতা, কর্ম্মমুখরতা, দায়িত্বগ্রহণ-ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি গুণের অনুশীলনের দিকে যদি নজর না যায়, তাহ'লে

কিন্তু মানুষের স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের ক্ষমতা উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে না। সে-অবস্থায় মানুষ কেবল চাকরীর সন্ধানই করে এবং বেকারত্বের ভয় তাদের ঘোচে না। ছাত্রদের শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের ভিতর এমন সেবাপ্রাণতা, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করার ক্ষমতা এবং আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা যেন কিছুতেই পেটের ভাত রোজগারের জন্য ভয় না করে। এই সামান্য ব্যাপারে মানুষ অপারগ হ'লে, তার সব শিক্ষাটাই একটা প্রহসনে পর্য্যবসিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও এমন থাকা ভাল, যাতে দেশের বেশীরভাগ মানুষ পরাধীন না হ'য়ে সৎ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জন করতে পারে।

শিক্ষায় সামগ্রিক দৃষ্টি

আমরা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শিক্ষা-অর্জ্জনের কথা বলেছি, কিন্তু তাই ব'লে সামগ্রিকতাবর্জ্জিত একদেশদর্শী বিশেষজ্ঞতা-অর্জ্জন আমাদের কাম্য নয়। বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মদক্ষতা অর্জ্জনের দিকে যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে, তাহ'লেই আমরা লাভবান হব বেশী। সামগ্রিকতার দিকে যত আমাদের ঝোঁক থাকে, ততই আমরা প্রজ্ঞার পথে এগিয়ে চলি। জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, চাই প্রজ্ঞা, চাই পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মানুষকে ভালবেসে মানুষ নিয়ে কারবার করতে গেলেই আমরা দেখতে পাই—জীবনটা কতকগুলি সীমিত গণ্ডীটানা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের সমাবেশ নয়, এ-সব মিলে একটা জীবন—যে-জীবন বিপুল, বিশাল ও অখণ্ড এবং যার প্রত্যেকটা দিকের সঙ্গে প্রত্যেকটা দিকের আছে অচ্ছেদ্য যোগ এবং প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল ও পারম্পর্য্য। জীবন-সম্বন্ধে এই সামগ্রিক দৃষ্টি ও সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতের একান্ত প্রয়োজন; নইলে খণ্ডিত দৃষ্টি ও খণ্ডিত প্রচেষ্টা দিয়ে কোন সমস্যারই সঙ্গতিশীল স্থায়ী সমাধান লাভ করা সম্ভব নয়।

পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পাঠন

সেইজন্য যে-কোন বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং পাঠনের বেলায় বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যাতে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মূল সূত্র সম্বন্ধে একটা কার্য্যকরী জ্ঞানলাভ হয় এবং বাস্তব জীবনে কৃতকার্য্যতালাভের পথ সুগম হয়। জ্ঞানের বিষয়ীভূত কোন

বিষয়ই একেবারে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেক যা'-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেক যা'-কিছু। এগুলি ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ ও একসূত্রবিধৃত। শিক্ষকের এই যোগসূত্রটি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে হবে। আর, যাবতীয় যা'-কিছুর সঙ্গে জীবনের যোগটি কোথায় তা' পর্য্যন্ত ধরিয়ে দিতে হবে—প্রায়োগিক কৌশলসহ। বিজ্ঞান-শিক্ষার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে—তা' যেমন তত্ত্বের দিক দিয়ে, তেমনি তার ব্যবহারিক বিনিয়োগে অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর দিক দিয়ে। সেদিক দিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী বিদ্যার বহুল প্রসার একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতের মত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষির ব্যবহারিক জ্ঞান সঞ্চারের ব্যাপক ব্যবস্থা অপরিহার্য্য প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, টেপ-রেকর্ডার, যাদুঘর, লাইব্রেরী, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পসংস্থা ইত্যাদির সদ্ব্যবহার সুফলপ্রদ। যা'-কিছু শিখতে হবে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে অন্তরে-বাহিরে সমৃদ্ধতর করবার জন্য। সক্রিয় ধারণ-পালনী সম্বেগ যেন ছাত্রদের অস্থিমজ্জায় মিশে যায় এবং তা' যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে আদর্শের অভিপ্রায়-পূরণে।

শিক্ষাকে উপভোগ্য ক'রে তোলা

তখন শিক্ষাটা আর কষ্টসাধ্য ব্যাপার ব'লে মনে হবে না। শেখাটা, করাটা ও জানাটা হবে একটা উপভোগের ব্যাপার। এ উপভোগ কিন্তু সত্তার উপভোগ। সর্ব্বতোব্যাপ্ত সত্তাকে নিত্যনূতনভাবে চেনা, জানা ও তার সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং তাকে বাস্তবভাবে সেবা করা—এ যে কত বড় সুখ ও সৌভাগ্য তা' কি ব'লে শেষ করা যায়? এ কথা বলছি এইজন্য যে, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ক'রে যখন আমরা নূতন কিছু জানি, আমাদের জ্ঞানের পরিধি যখন বিস্তার লাভ করে, তখন আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করি যে, আমাদের জীবনবোধ ও জীবন-উপলব্ধিই বেড়ে গেল। জীবনকে চিনলাম আরো কিছুটা। এই আত্মোপলব্ধির নেশা যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন হীন স্বার্থপরতা ও শিশ্নোদর-পরায়ণতা স্বতঃই সংযত হয়। উচ্চতর নেশা যদি মানুষকে পেয়ে না বসে, তাহ'লে তার কুৎসিত নেশা ছাড়ে না। শিক্ষকদের নিজ জীবন দিয়ে জীবন-অন্বেষণ, আত্মানুসন্ধান ও জ্ঞানানুশীলনের নেশা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দিতে হবে। নইলে তাদের সব বিদ্যাবুদ্ধি প্রবৃত্তিপরায়ণতার ভাগাড়ের দিকে

ছুটবে। ঘুরে-ফিরে আসে ঐ আদর্শানুরাগের কথা। তাঁতে মন-প্রাণ বাঁধা পড়লে কারও কি আর বেচালে চলবার জো থাকে?

গবেষণা-প্রবণতা

এমনতর ঝোঁক আসলে তখন উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যে গবেষণা-প্রবণতা সহজ হ'য়ে ওঠে। আর, সে-গবেষণা ডিগ্রী, চাকরী বা খ্যাতিলাভেই সমাপ্ত হয় না। আজীবন চলে ছাত্রত্ব ও নিত্যনূতন গবেষণা। কারণ, ব্রহ্মের যেমন ইতি নেই, তেমনি ইতি নেই লোকমঙ্গলসাধনী উদ্ভাবনশীল প্রয়াসের। এই নির্ম্মল আকূতি যাকে একবার সত্যি ক'রে ধরে, তাকে তা' দেহান্তেও ছাড়ে না। যা'হোক, যাদের মৌলিক গবেষণা করবার মত প্রতিভা ও প্রবণতা আছে তাদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগসুবিধা দেওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের একান্ত কর্ত্তব্য। আবার, তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান সহজভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচার করবার ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ যত কম হয়, ততই ভাল। জাতির অতীত ঐতিহ্যের জঠর থেকে জন্ম নেয় তার যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা, কোন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা সরকার একটা চিরস্থায়ী জিনিস নয়। সরকারী কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তন যখন-তখন হ'তে পারে। যখন যে-দল কর্ত্তৃত্ব করবেন তখন তাঁরাই যদি তাদের মত-মতে ও সুবিধামত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত হন, তাহ'লে জাতির চিরপ্রবহমান সাত্বত শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাটি হয়তো উচ্ছিন্ন হ'য়ে যেতে পারে। কোন সাময়িক সরকারের চাইতে জাতির গোটা জীবন ও ইতিহাসের মূল্য ঢের বেশী। তাই, শিক্ষার দায়িত্ব থাকা চাই সর্ব্বদর্শী ঋষিদের উপর, যাঁদের আছে সমন্বয়ী ও সামগ্রিক দৃষ্টি।

খেলাধূলা ও বৃত্তিশিক্ষা

খেলাধূলা শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। খেলাধূলাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তা' বাস্তব জীবনের প্রস্তুতির পক্ষে সহায়ক হয়। এমনতর খেলাধূলার উদ্ভাবন করা অসম্ভব নয়, যাতে যুগপৎ শরীর চর্চ্চা, মনের আনন্দ, আত্মরক্ষার পদ্ধতি, বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও প্রয়োজনপূরণী কর্ম্মের শিক্ষা হয়।

খেলাধূলার মত কার্য্যকরী বৃত্তিগত শিক্ষাও সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া দরকার।

সামরিক শিক্ষা ও বিভিন্ন প্রকারের বাস্তব শিক্ষা

যতদিন জগতে যুদ্ধবিগ্রহ আছে, ততদিন আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষার জন্য সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। ক্ষাত্র-সংস্কার এবং ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন যারা তাদের তো এ শিক্ষা ভাল ক'রেই দিতে হবে। অন্যান্যদেরও এ বিষয়ে ন্যূনতম প্রস্তুতি থাকা দরকার। প্রত্যেকেরই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন কৃষি, শিল্প, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগী শুশ্রূষা, রন্ধনবিদ্যা, সাঁতার কাটা, গাছে ওঠা, সাইকেল চালান, মোটর চালান, আত্মরক্ষা ইত্যাদি যাতে আপৎকালে অসুবিধায় পড়তে না হয়। সবরকম অবস্থা, বিশেষ ক'রে খারাপ অবস্থার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত ক'রে ছেড়ে দিতে হবে, যাতে কোন অবস্থায়ই তারা না ঘাবড়ায় বা অসহায় বোধ না করে। সাহসিকতা, শারীরিক বল, মনোবল, সংগ্রামশীলতা ও শ্রমশীলতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে এই বোধ ঢুকিয়ে দিতে হবে যে জীবনটা একটা যুদ্ধ, এবং আদর্শের জন্য বীরের মত আজীবন সংগ্রামরত থাকাই জীবনের স্ফূর্ত্তি ও আরাম। অনিশ্চয়তা ও অবস্থার পরিবর্ত্তনশীলতাকে নিশ্চিত জেনে, তার সম্মুখীন হবার জন্য যারা সতত প্রস্তুত থাকতে পারে, তাদের শিক্ষা হয় কার্য্যকরী। জীবন অভাবনীয়তায় ভরা, কিন্তু কোন অভাবনীয়তাই প্রকৃত শিক্ষিত লোককে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিতে পারে না। সাঁতারু যে, সে জানে যে সাঁতারের উপরে জল নেই।

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা

আবার বলি, শিক্ষা যদি ছাত্রদিগকে পরিবার-পরিবেশসহ জীবনে সাত্বত সুখসন্দীপ্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত না করে, তাহ'লে, সে-শিক্ষা ব্যর্থ। করাহীন পড়া, ব্যবহারশূন্য বোধ, আচরণহীন পাণ্ডিত্য, যোগ্যতাহীন বিদ্যাবত্তা বিড়ম্বনামাত্র। তাকেই বলে বিদ্যা—যা' আমাদের বিদ্যমানতা বা অস্তিত্বের পরিপন্থী যা' তাকে নিরাকৃত ক'রে বিদ্যমানতাকে অটুট ও অনন্তস্পর্শী ক'রে তোলে। তাই, পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা একই সূত্রে গ্রথিত। আদর্শপরায়ণ হ'য়ে যুগপৎ এই উভয় বিদ্যাকে অধিগত ক'রে সপরিবেশ আত্মিক ও বৈষয়িক অভ্যুদয়ের পথে চলাই তাই শিক্ষা

বা বিদ্যার তাৎপর্য্য। শিক্ষা দেবে আমাদের অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি, প্রবৃত্তিপরায়ণতা থেকে মুক্তি, দারিদ্র্য ও অভাব থেকে মুক্তি, হীনস্বার্থপরতা ও অপ্রেম থেকে মুক্তি, শারীরিক ও মানসিক অলসতা ও জড়তা থেকে মুক্তি, অযোগ্যতা থেকে মুক্তি, রোগব্যাধি ও মরণশীলতা থেকে মুক্তি। তাই তো শাস্ত্রে বলে 'সা বিদ্যা, যা বিমুক্তয়ে'। মুক্ত জীবনানন্দ লাভের জন্যই তো শিক্ষা।

শিক্ষকের জীবনব্রত

এ শিক্ষা জীবনব্যাপী সাধনা-সাপেক্ষ এবং জগৎজোড়া মানবসমাজের বৈষয়িক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে জড়িত। তাই, প্রতিটি উদ্বর্দ্ধনকামী মানুষকে আজীবন নিত্য বেদাভ্যাস তৎপর অর্থাৎ আচরণ-সমন্বিত-জ্ঞান-অর্জ্জন-তৎপর থাকতে হবে এবং দায়িত্ব-সহকারে নিজ দৃষ্টান্ত ও প্রচেষ্টায় পরিবেশকেও সেই পথে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত করতে হবে। নিজ জীবনে ও বিশ্ববাসীর জীবনে যত অজ্ঞতা আছে তার অপসারণকল্পে বিরামহীন সাধনা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই প্রতিটি জ্ঞানতপস্বীর আমৃত্যু জীবনব্রত। এই সঙ্কল্প সঞ্চারণাই শিক্ষাব্রতীর ধর্ম্ম। কারণ, শিক্ষক আলোকের দূত, অমৃতের প্রতিষ্ঠাতা। রাজাসনের থেকে শিক্ষকের আসন ঢের বেশী মূল্যবান ও গৌরবজনক। তাই, শিক্ষকদের চাই প্রকৃত শিক্ষক হ'য়ে ওঠা এবং সমাজেরও চাই শিক্ষকদের সমুচিত মর্য্যাদা দান। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা-বিধানের বিহিত ব্যবস্থাও করতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। তবেই যোগ্যতর ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা যাবে শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। তাই, শিক্ষার উন্নতি যদি চাই, তবে শিক্ষকদের সম্বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমীচীন দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্ববোধের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। তবে শিক্ষকদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষকতা ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি এবং বিদ্যানুশীলন, বিদ্যাদান, নির্লোভতা, ত্যাগ, সেবা ও তপস্যা-তন্ময়তাই ঐ দেবোচিত জীবন ও জীবিকার চিহ্নিত গুণলক্ষণা। তাই, আন্তর ঐশ্বর্য্যে ভরপুর হ'য়ে বাহুল্যবর্জ্জিত সরল জীবনযাপনেই অভ্যস্ত হ'তে হবে তাদের। তাদের বাস্তব ঐশ্বর্য্য হ'ল সন্তান-স্থানীয় গুণমুগ্ধ ছাত্রবৃন্দ।

নারীশিক্ষা

আমরা এতসময় পর্য্যন্ত সাধারণভাবে শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা ও মেয়েদের শিক্ষা ঠিক একধারায় হওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ মেয়েদের শিক্ষা হওয়া উচিত, মেয়েদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী—যাতে তারা সুগৃহিণী ও সুজননী হ'তে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে। তারা যাই কিছু শিখুক, তার সঙ্গে ঐ দিকটার উপর গুরুত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। মেয়েদের স্থান প্রধানতঃ অন্তঃপুরে—এ-কথা ভুললে চলবে না। আর, তা' একটা তুচ্ছ স্থান নয়, তা' একটা বিশাল সাম্রাজ্য। ঐ সাম্রাজ্য যদি সম্যকভাবে সুরক্ষিত ও সুপরিচালিত হয় তবেই বাইরের জগতে সমাজ-রাষ্ট্রের চক্রদণ্ড তৈলনিষিক্ত থেকে যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে।

সহ-শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা একসঙ্গে না হওয়াই ভাল। কারণ, কেউ যদি তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য-অনুযায়ী বিবর্ত্তিত না হওয়ার ফলে অন্য রং ধরে এবং ছেলেমেয়েদের অতি নৈকট্যের দরুন উভয়ের যৌন আবেগ ও চেতনা যদি অসমীচীন খাতে প্রবাহিত হয়, তা' ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির পক্ষে সর্ব্বৈব ক্ষতিকর হ'য়ে ওঠে।

যৌন-বিজ্ঞান ও সুপ্রজনন-সম্বন্ধে শিক্ষাদান

আর একটা কথা এই অবসরে বলা প্রয়োজন। যৌনজীবন ও যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের দেশে অজ্ঞতার সীমা নেই। সাধারণতঃ একে অশ্লীল ব্যাপার ব'লে মনে করা হয়। এর চাইতে বড় ভ্রান্তি আর হ'তে পারে না। এই অন্ধ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবই দেশের নৈতিক আবহাওয়াকে বেশী কলুষিত ও বিকৃত ক'রে তোলে। এর অপনোদনের জন্য চাই নিরাসক্ত, পবিত্র ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিদ্যার্থী তরুণ-তরুণীদের যৌনবিজ্ঞান ও সুপ্রজনন-সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এতে মানুষের প্রবলতম শক্তি ও সম্বেগের অপব্যবহার নিবারিত হ'য়ে সদ্ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত হবে।

পরীক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন

পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, শিক্ষার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে যুগপৎ চারিত্র্য, জ্ঞান ও কার্য্যকরী ক্ষমতার মান যাতে যথাযথভাবে নির্ণীত হ'তে পারে, তেমনতরভাবে পরীক্ষা-পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্ত্তন-সাধন একান্ত প্রয়োজন। এ-কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা-পদ্ধতি উভয়ই বহুল পরিমাণে অসার্থক, উদ্দেশ্যভ্রষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ।

লোকশিক্ষা

শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে লোকশিক্ষার বিষয়েও কিছু বলা প্রয়োজন। অক্ষরজ্ঞানহীন অজ্ঞ জনসাধারণ যারা তাদের যেমন লেখাপড়া শেখান প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাদের কিছুটা পরিচিত ক'রে তোলা। আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ন্যায়, অন্যায়, সৎ, অসৎ ইত্যাদির মানদণ্ড কী তা' তাদের বোঝান প্রয়োজন। ইষ্ট ও পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কী, সে-সম্পর্কে কী তার করণীয়, কীভাবে চললে জীবনচলনা সার্থক হয়, স্বাস্থ্য ও সদাচারের নীতি কী, অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে হয় কীভাবে, বিপদ-আপদের সময় করণীয় কী, অসৎকে নিরোধ করতে হয় কীভাবে, বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে জগতে, রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কীভাবে, বহির্জগতের সঙ্গে স্বদেশের সম্পর্ক কী ইত্যাদি নানাবিষয় সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল ক'রে তার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত ক'রে তুলতে হবে। দেশের চতুর্দ্দিকে যদি একটা অজ্ঞতা, বিজ্ঞান-বিমুখতা ও কুসংস্কারের রাজ্য বহাল তবিয়তে বিরাজ করতে থাকে তবে তার একটা প্রভাব ও চাপ পড়ে সকলের উপর। তাই, বিজ্ঞ যারা তারা যদি অজ্ঞতা-অপসারণী দায়িত্ব হাতে না নেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞদের মিলিত শক্তি দেশের মধ্যে কোন্ অনর্থের আবাহন করবে, তার কিন্তু ঠিক নেই। তাই যাজন, বক্তৃতা, রেডিও, সিনেমা, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, পাঠচক্র, যাত্রা, থিয়েটার, গান, শ্লোগান, বৈঠক, কথকতা, কবিগান, তরজা, প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, আমোদ, উৎসব, মেলা ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে দেশে-বিদেশে সাত্বত শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

অন্ততঃ একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন

প্রতিটি দেশের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিক্ষার সাত্বত বিন্যাস যাতে হয়, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে। পৃথিবীতে বহু শিক্ষিত, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান দেশ আছে। কিন্তু তাদের অত শিক্ষাও নিষ্ফল হ'য়ে যাচ্ছে জ্ঞান ও শক্তি-সমৃদ্ধির সত্তাপোষণী বিনিয়োগ না থাকায়। তাই, আদর্শ, সত্তা-সম্বর্দ্ধনা ও সাত্বত কৃষ্টির উপর ভিত্তি ক'রে এমনতর সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার নমুনা জগতের সামনে আমাদের তুলে ধরতে হবে, যা' দেখে জগৎ বাঁচার পথ পায়। সেই মহাদায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত। আর, তা' উদ্‌যাপন করতে হবে আদর্শ শিক্ষার সু-সম্পূর্ণ ধারাকে অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ক'রে।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

মনুষ্যদেহের শ্রেষ্ঠত্ব

সৃজন-পরিক্রমায় মনুষ্যশরীর-লাভ এক দুর্লভ সৌভাগ্য-বিশেষ। কারণ, এই দেহলাভের পর স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অনন্ত আত্মবিকাশের সম্ভাব্যতার স্বর্ণতোরণ উন্মুক্ত হ'য়ে যায় আমাদের সমক্ষে। এই আত্মবিকাশের জন্য চাই দুশ্চর তপস্যা। সেই তপস্যার জন্য চাই সুস্থ, সবল, সুপটু, সৌষ্ঠবসুন্দর, সঙ্গতিশীল, অতন্দ্র সক্রিয় শরীর-বিধান। তাই, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'।

সমাজের পরিণয়-প্রথা ও জনস্বাস্থ্য

এই শরীর আমরা লাভ করি পিতামাতার ভিতর-দিয়ে। তাই, সমাজে যদি সঙ্গতিশীল বিবাহ প্রচলিত না থাকে, তবে কোন স্বাস্থ্য-আন্দোলনই সুফলপ্রসূ হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে বিবাহ যদি ঠিকমত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সুগভীর, অচ্ছেদ্য, সাত্বত, সক্রিয় প্রীতি নিরন্তর সলীল হ'য়ে চলে—বিহিত চলনচর্য্যাকে অক্ষুণ্ণ রেখে;—তবে তাদের সন্তান স্বভাবতঃই এমন একটা বলিষ্ঠ জৈবী ভিত্তি ও প্রবল জীবনসম্বেগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যার ফলে সে বাহ্যিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে টিকে থাকতে পারে। এই সহজাত প্রবণতাই যোগায় সহনশীলতা, প্রতিরোধ-ক্ষমতা ও নব নব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার যোগ্যতা। জন্মগত এই মৌলিক মূলধনই হ'ল বেঁচে থাকার অভিযানে সর্ব্বপ্রধান হাতিয়ার। এরপর তো পালন-পোষণ ও পারিবারিক সাহায্য চাই-ই। কিন্তু জন্মগত সম্বলের খাঁকতি থাকলে, তা' বাইরের কোন-কিছু দিয়েই সম্যক পরিপূরিত হবার নয়। আদ্যকথা এই যে, অখণ্ডিত, একনিষ্ঠ, শ্রেয়-অনুরাগই হ'ল দুর্জ্জয় জীবনীশক্তির মূল। জন্মসূত্রে পিতামাতার মাধ্যমে যারা এই ঝোঁকটা সহজাত সম্পদ হিসাবে পেয়ে যায়, তারা মহাভাগ্যবান। সুজননের তাৎপর্য্য এই-ই।

উৎসমুখিনতা

তবে সে সুযোগ যারা না পায়, তাদের ক্ষেত্রেও চেষ্টা করতে হবে যাতে তাদের অনুরাগ বা সত্তাগত সম্বেগ মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ঐ দিকেই চালিত করা যায়। তাই, সুবিবাহ ও সুজননের সঙ্গে-সঙ্গে উৎসমুখিনতা, তথা মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও সর্ব্বোপরি গুরুভক্তির অনুশীলনের দিকে নজর দেওয়া স্বাস্থ্যোন্নয়ন-পরিকল্পনার অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়া উচিত। বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় প্রসূতিকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল-প্রকল্পও কার্য্যকরী করা প্রয়োজন।

ইচ্ছাশক্তি

কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন। মানুষের সুস্থতা, অসুস্থতা, জীবন ও মৃত্যুর মূলে ক্রিয়া করে তার ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির মূলে আছে আবার প্রেম। কারও প্রেম যদি বিশ্বপ্রেমী, অখণ্ড জ্ঞান-কর্ম্মময় বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন পুরুষে কেন্দ্রায়িত ও সুসংন্যস্ত হয়, তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ-দীপনায়;—তখনই সে জীবনের একটা পূর্ণতম চিরায়ত সার্থক অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। সেই নিখিলকল্যাণকামী ভাগবত উদ্দেশ্যপ্রাণতাই দেয় মানুষকে অন্তহীন চিন্তাশীলতা ও সক্রিয় সুকেন্দ্রিক সেবাতৎপরতার অনির্ব্বাণ প্রেরণা। এই বিশাল আত্মিক সম্বেগ অর্থাৎ চিরচলৎশীল উৎসপ্রীণনপ্রাণ, লোকমঙ্গলসাধনী সম্বেগই সুপ্ত জীবন-সন্দীপনাকে প্রজ্জ্বলন্ত ক'রে অনন্তাভিসারী ক'রে তোলে। বাঁচা ও বাঁচাবার ইচ্ছা ও আবেগ দাউদহনী হ'য়ে ওঠে। বাধা তাকে নিরস্ত করতে পারে না। বাধাকে বাধ্য ক'রে, জীবন-সাধনার সেবক ক'রে, সে দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে চলে জীবনের নব-নব দিগন্তকে অধিগত করতে। এমনি ক'রেই মানুষের জীবন, বল, বিক্রম, আয়ু, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি উল্লম্ফী হ'য়ে চলে। এই হ'ল স্বাস্থ্য-সংবর্দ্ধনের গোপন রহস্য।

মানসিক সুস্থতা

শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতি সুনিবিড়। প্রকৃত প্রস্তাবে একটাকে আর একটা থেকে আলাদা ক'রে ভাবাই দুষ্কর। শরীর ও মন যেন একই জিনিসের দুটি পিঠ। তাই, শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন মানসিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, মানসিক সুস্থতার জন্য তেমনি শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে

হবে। মানসিক সুস্থতা রক্ষা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ জটিল প্রবৃত্তি এবং বাইরের জগৎ থেকে প্রতিনিয়ত আসছে নানাবিধ প্রলোভন ও সংঘাত। এর ফলে প্রবৃত্তিগুলি উত্তেজিত হ'য়ে আমাদের দিশেহারা ক'রে ফেলে। তাই, প্রবৃত্তিগুলির বশীভূত হ'য়ে আমরা যদি যথেচ্ছ আচরণ করি, তাতে শরীরবিধান, স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ককোষগুলি ক্ষতবিক্ষত ও জরাজীর্ণ হ'তে বাধ্য। আবার, ওগুলির উত্তেজনা বা বেগকে যদি শুধুমাত্র আইন বা সমাজের ভয়ে জোরজবরদস্তি ক'রে চাপা দেওয়া বা নিরুদ্ধ ক'রে রাখা হয়, তাহ'লে তা' শরীরযন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে শারীরিক ও মানসিক নানা ব্যাধি ও বিকৃতির আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোলে। তাই, শারীরিক সুস্থতার জন্য চাই ওগুলির সুষ্ঠু, সুধী নিয়ন্ত্রণ, আয়ত্তীকরণ এবং সত্তাপোষণী বিনিয়োগ ও ব্যবহার। বিশ্বস্রষ্টা প্রবৃত্তিগুলিকে সত্তার শত্রু ক'রে সৃষ্টি করেননি, তিনি ওগুলিকে সৃষ্টি করেছেন সত্তার রক্ষক, পালক, পোষক ও পরিচারক হিসাবে। কিন্তু আমরা যদি ওগুলিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারার দরুন ওগুলি বেয়াড়া বা বেহাতি হ'য়ে ওঠে এবং তারপর সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি ওগুলিকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাই, তাহ'লে সত্তার ধৃতি বা অস্তিত্বের পক্ষে সমূহ বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। আর, সেই বিপর্য্যয়ের প্রথম বলি হয় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য।

ঈশ্বরনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

এই যেমন গেল একদিকের কথা, আর একদিকে আছে রকমারি মানসিক আঘাত, ব্যাঘাত, ব্যথা, বেদনা, ভয়, উদ্বেগ, আতঙ্ক, অশান্তি, অভিভূতি, হতাশা, অবসাদ, আক্রোশ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, দুঃখ, শোক, হীনম্মন্যতা ইত্যাদির মর্ম্মন্তুদ কণ্টক-পীড়ন, যা' মানুষ সইতেও পারে না, কইতেও পারে না। কত আশাভঙ্গ, কত ব্যর্থতা, কত প্রীতি-প্রত্যাশার ব্যাহতি, কত অকৃতজ্ঞতা, কত অবজ্ঞা, কত অপমান, কত অত্যাচার, কত অবিচার, কত অসম্মান, কত ক্ষয়ক্ষতি, কত প্রতিকারহীন শত্রুতা, অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার হ'তে হয় মানুষকে। এমনি ক'রে মানুষের বুকে জমে ওঠে পাহাড়-প্রমাণ বিস্ফোরণ-প্রবণ তিক্ততা, বিষাক্ততা, বিক্ষুব্ধতা, অসন্তোষ, অভিমান ও অভিযোগ। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির সাহায্যে যদি মনের ঐ পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সাফ না করা যায়,

তাহ'লে ঐ অসমাহিত নিরুদ্ধ অভিভূতি শারীরিক ও মানসিক স্থৈর্য্য ও ভারসাম্যকে নষ্ট ক'রে মানুষকে দেহ-মনে অসুস্থ, মরণপন্থী ও মারণপন্থী ক'রে তুলবে। উপরোক্ত সঙ্কটগুলি থেকে ত্রাণ পেতে গেলেও চাই প্রেমস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ জীবন্ত ইষ্টে নিরন্তর যোগযুক্ত থেকে সংসারে চলা। তিনিই সত্তার চিরন্তন নিবাসভূমি, নিবেশভূমি, বিহারভূমি, বিচরণক্ষেত্র, নিজ নিকেতন। তাঁতে সুস্থিত থেকে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, সহানুভূতি, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, প্রীতিসঙ্গতি, প্রীতি-সংহতি, প্রীতি-পরিচর্য্যা ও অসৎ-নিরোধী শক্তিমত্তার বর্ম্মে সুসজ্জিত হ'য়ে আমরা যদি জটিল-জীবনপথে চলি তাহ'লে সব রকমের অবাঞ্ছিত সংঘাত ও সংক্রমণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সেগুলি আমাদের বিধ্বস্তির কারণ হবে না, বরং আমাদের নিরাকরণী ও সমাধানী প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে সেগুলি পুষ্টির উপাদানে পরিণত হবে। বিষ অমৃতে পর্য্যবসিত হবে। তাই, দেহযাত্রা ও দেহধারণের ভিত্তিকে যদি অটুট করতে হয় তবে ইষ্টনিষ্ঠা তথা ঈশ্বর-নিষ্ঠার সর্ব্বংসহ শাশ্বত ভূমির উপর তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নইলে অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টায় কিছু দূর যেয়ে পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিকারের চেষ্টায় মন্দের চাকা একদিক থেকে গড়িয়ে আর একদিকে যাবে, মন্দের নিরসন কখনও হবে না, তা' করতে গেলে চাই তার ভাগবত রূপান্তরসাধন। তাই, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনসাধন করতে হবে—প্রত্যেকের বিহিত ধারণ, পালন, পোষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে,—তেমনি প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনকেও পরিশুদ্ধ ও প্রতুল ক'রে তুলতে হবে ভাগবত ছন্দে।

সদাচার ঃ শারীরিক সদাচার

এই পরিশুদ্ধির জন্য চাই সদাচার-পরিপালন। সদাচার মানে বাঁচা-বাড়ার আচরণ। সদাচার আবার তিন রকমের—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শারীরিক সদাচার মানে আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-নিয়ম, বাক্য-ব্যবহার, কাজ-কর্ম্ম এমন শুচিশুদ্ধভাবে পরিচালনা করা, যাতে সপরিবেশ রোগব্যাধিকে এড়িয়ে জীবনসম্বেগকে দীপ্ত ক'রে তোলা যায়। পরন-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা, সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য্যচর্য্যা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যানুগ সুরুচিসঙ্গত, স্বাস্থ্যসম্মত, সাত্বত বিন্যাস-

বিনায়নও সদাচারের অঙ্গ। বিলাসিতা, বাহুল্য ও কৃত্রিমতা সদাচারের সঙ্গে সঙ্গতিশীল নয়। মানুষ পরিবার-পরিবেশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই শুধু নিজে সদাচার পালন করলে হবে না, পরিবার-পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন, প্রাণনদীপী ও পবিত্র ক'রে তুলতে হবে। মানুষের জীবিকা ও সংসর্গও হওয়া চাই সত্তাপোষণী ও আনন্দ-উদ্দীপী। এই সব কিছুই শারীরিক সদাচারের মধ্যে পড়ে।

মানসিক সদাচার

মানসিক সদাচার বলতে বুঝায় চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, ভাব-প্রবণতা, উদ্দেশ্যপ্রাণতা ইত্যাদিকে এমনভাবে বিনায়িত ও নিয়োজিত করা যাতে সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকার ও বিভ্রান্তিকে পরিহার ক'রে সুস্থ, স্বস্থ উৎসাহী, বলিষ্ঠ মন নিয়ে সৃজনশীল প্রচেষ্টার পথে নিজের ও অপরের বাঁচা-বাড়ার বুনিয়াদকে সুদৃঢ় ও সংহত ক'রে তোলা যায়। সৎ-চিন্তা বা শুভ-সম্বেগ যদি বিহিত আচরণে অভিব্যক্তি লাভ না করে, তাহ'লে কিন্তু মানসিক সদাচার সুসম্পূর্ণতা লাভ করে না। মানসিক সদাচারকে পুষ্ট করতে চাই জপধ্যান, আত্মবিচার, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংশোধন, সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, জ্ঞানানুশীলন, সৎ-প্রসঙ্গ, উচ্চচিন্তা, উৎকর্ষ-অভিধায়না, প্রীতি-প্রসারণী প্রয়াস, উদ্ভাবনী বুদ্ধি, গবেষণা, সুকেন্দ্রিক পরার্থপরতা ইত্যাদি। সততা, সুনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অনুবর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠাই মানসিক সদাচার। অসৎ-নিরোধ এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে যে স্বার্থান্ধি, হীনম্মন্যতা, কপটতা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা মানসিক সদাচারের সবচাইতে বড় শত্রু।

আধ্যাত্মিক সদাচার

আধ্যাত্মিক সদাচার বলতে বুঝায় ইষ্টৈকলক্ষ্য, অচ্যুত সক্রিয় সুনিষ্ঠ চলন। এর ভিতর-দিয়েই সম্ভব হয় জীবনের বহুমুখী, বিচ্ছিন্ন, পরস্পরবিরুদ্ধ, বিচিত্র প্রবৃত্তি, পরিস্থিতি, প্রয়োজন, প্রকোষ্ঠ, বিভাগ, ভাবনা, কামনা, সমস্যা, সংঘাত, সাড়া, উপাদান, উপকরণ ও দিকচক্রগুলির সুসমন্বয়ী একীকরণ। নইলে অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অন্তর, বাহির, বৃত্তি, সত্তা, ব্যষ্টিস্বার্থ, সমষ্টি-স্বার্থ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক ঐক্য, বস্তুতান্ত্রিকতা, আত্মিকতা, সহনশীলতা, অসৎ-নিরোধ, ইহকাল,

পরকাল, দেহ, মন ইত্যাদি নানা বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য ক'রে জীবনটাকে একটা সর্ব্বতোমুখী সঙ্গতিশীলতার দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আর, ঐ অসঙ্গতি, স্ব-বিরোধীতা ও দ্বন্দ্বদীর্ণতা যার ভিতর যত বেশি, তার শারীরিক ও মানসিক অপটুতা ও অস্বস্তির সম্ভাবনাও তত বেশি।

চাই সামগ্রিক সামঞ্জস্য

তাই, সহস্রমুখী সহস্র ব্যাপৃতি ও আকর্ষণকে সচেতন প্রয়াসে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার ইন্ধন ক'রে, সাত্বত একমুখিনতায় বিন্যস্ত ও বিধৃত ক'রে তুলতে হবে। তখনই জীবনের প্রত্যেকটি দিক অন্য প্রত্যেকটি দিকের পরিপূরণী হ'য়ে সুরসঙ্গতির সৃজনে শরীর-মনকে ক'রে তুলবে আনন্দ, শক্তি ও দীপ্তির লীলাভূমি। একটা সহজ সত্য এই যে, অন্ন না হ'লে যেমন প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দ দাঁড়াবার ভূমি পায় না, আবার তেমনি প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের সহযোগিতা ছাড়া অন্ন-সংস্থান ক'রে অন্নময় কোষকেও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। ফলকথা, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ও কারণভূমি পর্য্যন্ত সবকিছু ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ। কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। চাই সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে যুগপৎ সবগুলির সাম্যসঙ্গত সম্যক্ অনুশীলন। তাই, শরীর-জীবনকে সুঠাম, সুব্যবস্থিত ও সুরক্ষিত করতে গেলে একযোগে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সদাচারের দিকে সমীচীন মনোযোগ দিয়ে চলতে হবে।

সুষম খাদ্য

শরীরকে সুস্থ, সবল, সহনপটু, কর্ম্মমুখর ক'রে তুলতে গেলে শরীরের ন্যায্য দাবী ও প্রয়োজন মিটাতে হবে। শরীরের একটা প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণ সুষম, বিহিত খাদ্য। সুষম খাদ্য বলতে বুঝায় খাদ্যের মধ্যে সেইসব উপাদানের সমন্বয়—যাতে দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি ও শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কার্ব্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, সুগার, খনিজ লবণ, বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন ইত্যাদি যার শরীরের পক্ষে যে-মাত্রায় প্রয়োজন, তা' যদি শরীরকে ঠিকমত সরবরাহ করা না হয়, তাহ'লেই ঘটে শরীরের অপুষ্টি। তা' থেকেই শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের পথে নানা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হয়। নানাপ্রকার দুরূহ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। মানুষের কর্ম্মশক্তি যায় ক'মে। আবার, মানসিক ও বৌদ্ধিক

বিকাশ ব্যাহত হ'লে মানুষের নীতিবোধ, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ, বিবেকিতা ও সমাজ-সচেতনতা বিকৃতির দিকে বাঁক নেয়। এমনি ক'রে সুষম খাদ্যের অভাব শুধু জাতীয়-স্বাস্থ্যকেই বিপন্ন করে না, তা' জাতীয়-বুদ্ধিবৃত্তি, মানসিকতা, চরিত্র ও কর্ম্মক্ষমতাকে পঙ্গু ক'রে অর্থনৈতিক, শিক্ষানৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রেও বিপুল সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই, পরিমাণমত সুষম-খাদ্য গ্রহণের দিকে আমাদের শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে চলতে হবে। অনেকে বলেন, দরিদ্র পরিবারে বা দরিদ্র দেশে তা' কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্ততঃ ৩০০০ ক্যালরি মূল্যের খাদ্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন খাওয়া উচিত। কিন্তু তা' খেতে গেলে যে-পরিমাণ অর্থ ও খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন, তা' পাওয়া যাবে কোথায়? এ সমস্যা আছেই। কিন্তু তার চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা ও স্বাস্থ্য-বিরোধী খাদ্যাভ্যাস ও রুচি। এর নিরসন হ'লে আমাদের সামর্থ্য ও সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অনেকখানি লাভবান হ'তে পারি। বিশেষ ক'রে নারীগণকে তাই প্রতিটি খাদ্য-বস্তু ও গাছগাছড়ার গুণাগুণ এবং স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। প্রত্যেকেরই এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। শরীরের পক্ষে থানকুনী, হিঞ্চে, কলমী, পুদিনা, ধনেপাতা, শুলফো, কুলেখাড়া, আমলকী, শসা, পেয়ারা, পান্তাভাত, ফেন না-ঝাড়া ভাত, চীনেবাদাম, তিল ইত্যাদি অ-দামী ও অসৌখীন নগণ্য জিনিসের উপযোগিতা কতখানি তার খবর কি আমরা রাখি, না সেগুলি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করি? খাদ্য কম হলেও চলবে না, আবার বেশি হলেও চলবে না। খাদ্য যদি আমরা হজম করতে না পারি, ক্ষুধা, শ্রম ও পরিপাক শক্তির মাত্রার দিকে নজর না দিয়ে, আমরা যদি বেশি খেয়ে অলস হ'য়ে ব'সে থাকি, তাহ'লে সে-খাদ্য আমাদের ভালর থেকে খারাপ করে বেশি। অনেক সময় আমরা অসমখাদ্য মাত্রাধিক খেয়ে শরীরকে রোগাক্রান্ত ক'রে তুলি। একটা কথা শোনা যায়—না খেয়ে যত লোক মরে, তার থেকে খেয়ে মরে বেশি। এ কথাটা যে ভিত্তিহীন তা' মনে হয় না।

খাদ্য নির্ব্বাচন

তারপর আসে বিহিত খাদ্যের কথা। খাদ্য জোগায় আমাদের তাপন-শক্তি, প্রাণন-শক্তি, মনন-শক্তি। প্রাণন-শক্তি ও মনন-শক্তির গতি, প্রকৃতি ও

কার্য্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে খাদ্যের দ্বারা প্রভাবিত, বিন্যাসপ্রাপ্ত, বিধৃত ও উজ্জীবিত রস, রক্ত, মাংস, পেশী, স্নায়ুমণ্ডলী, মস্তিষ্ককোষ ও দেহকোষের উপর। খাদ্য যুগপৎ আমাদের শরীর, মন ও চরিত্রগঠন করে। কোন খাদ্য যদি শরীরে খুব শক্তি জোগায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনকে অস্থির, চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও সাম্যহারা ক'রে ফেলে, তবে ঐ শারীর-শক্তি প্রমত্ত ও প্রমাদী মনের তাড়নায় বিপথে পরিচালিত হ'য়ে যে তার নিজের ও অপরের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'তে পারে, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? তাই, খাদ্য হওয়া উচিত সাত্ত্বিক, স্বাদু, পুষ্টিকর, সহজপাচ্য ও পবিত্র, যা' যুগপৎ শরীর ও মনকে জীবনসন্দীপী শক্তি ও সম্বেগে ভরপুর ক'রে তোলে। এদিক দিয়ে দুধের মত আদর্শ খাদ্য বিরল। তাই, স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সঙ্গে-সঙ্গে দুধের উৎপাদন ও বন্টন-ব্যবস্থাকে উন্নত ক'রে সমীচীন মূল্যে সর্ব্বত্র দুধ সরবরাহের সরকারী বা বেসরকারী ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। খাদ্যপ্রসূত শারীরিক শক্তি ও মানসিক প্রবণতার মধ্যে জীবনীয় সঙ্গতি যাতে প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনভাবে খাদ্য নির্ব্বাচন করাই জীবনকামী প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে-দিক দিয়ে সুষম নিরামিষ আহারই শ্রেয়। তাতে একদিক দিয়ে যেমন হবে শারীরিক পুষ্টি অন্য দিক দিয়ে তেমনি হবে ঐ আহার্য্যের ঔপাদানিক গুণ ও ক্রিয়া-অনুযায়ী স্বভাবের সংগঠন। তবে এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, স্বভাবের বিবর্ত্তনে খাদ্যই একমাত্র বস্তু নয়, জন্ম, কর্ম্ম, আচার, পরিবেশ, আদর্শ, উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি, খাদ্য, জলবায়ু, ঐতিহ্য, শিক্ষা ইত্যাদি অনেক কিছুর সমবায়ে এটা বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে। তবে খাদ্যের যে একটা বিপুল অবদান আছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমিষ ও নিরামিষ আহার এবং শরীরের অভাব পূরণ

আমিষ-আহার বহু রোগের কারণ হ'য়ে থাকে ব'লে শোনা যায়। আমিষ-আহার শরীরের কোষ-বিভাজনকে দ্রুততর ক'রে এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তুলে শেষ পর্য্যন্ত আয়ু ও ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিকে ক্ষীণ ক'রে তোলে। আমিষ-আহার একদিকে যেমন কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমনি আনে অতিরিক্ত অবসাদ। কোন-কিছুতে একটানা ক্রমাগতি নিয়ে লেগে থাকা আমিষাহারীদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়। তাছাড়া, স্থূল

জান্তব-খাদ্য গ্রহণের ফলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর সূক্ষ্ম সাড়াপ্রবণতা ও সুতীব্র, সুগভীর একাগ্রতা ও তন্ময়তা প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হয়। সূক্ষ্মতম চিন্তা, বোধ ও অনুভূতির রাজ্যে পৌঁছাতে গেলে আমিষাহার বজায় রেখে তা' একপ্রকার অসম্ভবই হ'য়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে আমরা এ-বিষয়ে অনেক শুনেছি। আমিষ ও নিরামিষ আহার সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। আমরা এইটুকু বুঝি প্রত্যেকে তার প্রকৃতি, ঝোঁক ও রুচি অনুযায়ী যুক্তি, বিজ্ঞান ও তথ্যের নজির আমদানী করেন। তবে আমাদের ধারণা সত্তাপোষণী, সংযত, পুষ্টিপ্রদ, পূত, পরিচ্ছন্ন নিরামিষ আহারকে কেউ স্বাস্থ্যহানিকর ব'লে মনে করেন না। কিন্তু প্রবৃত্তিবশে অনেকে আমিষ-আহারই গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্তু মহাফলা", "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"। জীবনের মূল লক্ষ্য যদি আমাদের ঠিক হয়, তবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সবদিকের সামঞ্জস্য বজায় রেখে খাদ্য নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে না। পরিশেষে খাদ্য-সম্বন্ধে একটা কথা উল্লেখ্য এই যে, সাধারণতঃ বেশিরভাগ লোকের খাদ্যে প্রোটিন ও বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব থাকে। সে অভাব পূরণের জন্য তাদের সিন্থিটিক প্রোটিন ও মাল্টিভিটামিন টনিক, ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল-জাতীয় জিনিস চিকিৎসকের নির্দ্দেশমত খাওয়া ভাল। সঙ্গে-সঙ্গে বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও উদার আলো সেবন করতে হবে। কারণ, এগুলিও শরীরের পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য। তাই, বাসগৃহ ও তার নির্ম্মিতি, পরিসর ও পরিবেশ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপোষক হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বল্প পরিসরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রাণদ জল-বায়ু-আলো-আকাশ ও আনন্দহীন গৃহে একত্রে ঠাসাঠাসি ক'রে বহুলোকের বাস, জীবনী-শক্তি স্নায়ুশক্তি ও মস্তিষ্কশক্তির পক্ষে সর্ব্বনাশা। তাই, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার তথা গৃহপরিকল্পনা-রচয়িতাদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

আহারশুদ্ধি

আহারশুদ্ধি বলতে কী বুঝায়, তা' একটু বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। শুধু শুদ্ধসাত্ত্বিক নিরামিষ আহারই যথেষ্ট নয়, আমিষ-আহারের সঙ্গে-সঙ্গে পিঁয়াজ, রসুন ও উগ্র মাদক দ্রব্যাদিও বর্জ্জনীয়। কারণ, এগুলি শরীরের মধ্যে অসমীচীন

উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তা' ছাড়া, যার-তার হাতে যে-সে-ভাবে যেখানে-সেখানে খাওয়া উচিত নয়। কদাচারী ও কুৎসিত-মনা লোকের দ্বারা রন্ধিত ও পরিবেষিত অন্নগ্রহণে শুধু শারীরিক সংক্রমণেরই ভয় থাকে না, মানসিক ভাবদুষ্টিরও আশঙ্কা থাকে। অন্নের মাধ্যমে অন্নদাতা, অন্নপাচক ও অন্ন-পরিবেষকের মানসিকতাও অন্নগ্রহীতার ভিতর সূক্ষ্মভাবে বাহিত ও সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে। এর কারণ, প্রত্যেকের মনোভাব, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের একটা স্বতঃপ্রবাহশীল বিকিরণ আছে। এটা ক্রমাগত নির্গত হ'য়ে চলেছে। তাই, অন্নদাতা, অন্নপাচক ও অন্ন-পরিবেষকের মনোভাব স্বভাবতঃই অন্নের মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে। ঐ সূক্ষ্ম ভাবভরণ (ভাবের charge) অন্নগ্রহীতার মনের উপর ক্রিয়া করতে ছাড়ে না। কারণ, আমাদের প্রাণ ও মন বহুলাংশে অন্নাশ্রয়ী। তাই, ভাবশুদ্ধির জন্য যথাসম্ভব স্বপক্ক অন্নগ্রহণই শ্রেয়। আর, অপরের হাতে খেতে গেলে সম বা উন্নত জৈবী-সংস্থিতি, চিন্তা, চলন, আচার, সংস্কার, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন সুস্থ সৎলোকের হাতেই খাওয়া ভাল, যাতে অশুভ শারীরিক ও মানসিক সংক্রমণের হাত থেকে যথাসম্ভব রেহাই পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। আছে মানসিক ভাবদুষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণী নিষ্ঠাকে বজায় রেখেও সবার প্রতি উদার প্রীতিসম্পন্ন হওয়াই সদাচারের লক্ষ্য। সদাচারের সঙ্গে যুক্তি-বিচারহীন শুচিবায়ু বা সঙ্কীর্ণচিত্ততার কোন সম্পর্ক নেই। ওগুলি ব্যাধির পর্য্যায়েই পড়ে। তবে এ-কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, যার হাতে খেলে কারও শারীরিক বা মানসিক কোনপ্রকারের ক্ষতি হয়, তার হাতে তার না খাওয়াই শিষ্ট-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্মত ও সমীচীন। সমাজ বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে এর উপর কোন জবরদস্তি চালান মানে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা।

স্বাস্থ্য ও যৌনজীবন

উপযুক্ত বয়সে সুস্থ যৌন আবেগের আবির্ভাব সুস্থ দেহের পক্ষে সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব্যাপার। অ-সমগ্রদর্শী নীতিবাদীরা যাই বলুন না কেন, এটা একটা অনস্বীকার্য্য দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-সম্মত সত্য। সৃষ্টিরক্ষার জন্য স্রষ্টাই এটা জীবের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। এর সার্থক, কল্যাণকর বিনিয়োগ, প্রতিস্থাপন বা উদগতিসাধন চলতে পারে, কিন্তু এর উৎসাদন করতে গেলে প্রকৃতি রুখে

দাঁড়াবে এবং ঐ নিরুদ্ধ সম্বেগ বিকৃতি, বিপর্য্যয় ও জটিল শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি, চিত্তভ্রংশ, বাতুলতা ইত্যাদি আকারে আত্মপ্রকাশ করবে। তাই, সাধারণ লোকের পক্ষে যথাসময়ে বিহিত পরিণয়-নিবদ্ধ হওয়া ভাল। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলপ্রদই হ'য়ে থাকে। বিবাহ যদি বিধি সম্মত ও সবদিক দিয়ে সঙ্গতিশীল হয়, দাম্পত্য-প্রণয় যদি উভয়ের সত্তাকে স্পর্শ ক'রে উভয়কে একাত্ম ক'রে তোলে, তাতে উভয়েই জীবনের একটা গভীর সন্দীপনী স্বাদ ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করে। তাছাড়া, তাদের সদ্ভাবভাবিত, সদাচারসিদ্ধ, সংযত যৌনমিলন উভয়ের দেহাভ্যন্তরস্থিত অন্তঃক্ষরা গোনাড বা যৌনগ্রন্থিগুলিকে পরিতৃপ্ত ক'রে যে রস বা হর্ম্মোনের নিঃসরণ ঘটায়, তা' উভয়ের দৈহিক বিকাশ, দীপ্তি ও কান্তি এবং মানসিক স্থৈর্য্য ও প্রশান্তির পক্ষে অমৃততুল্য। এটা আয়ুবৃদ্ধিরও কারণ হ'য়ে ওঠে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, সুনিয়ন্ত্রিত যৌনজীবন যেমন স্বাস্থ্যের আকর, অনিয়ন্ত্রিত যথেচ্ছ যৌনজীবন তেমনি স্বাস্থ্যহানি ও দুর্ব্বলতার হেতু। সর্ব্বপ্রকারের ব্যভিচার স্বাস্থ্যের পক্ষে অকল্যাণকর। অবিহিত বিবাহ এবং বিদ্বিষ্টা স্ত্রীর সঙ্গে কামসংস্রব পুরুষের স্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর। সাধারণতঃ পুরুষের বৃহতে বিচরণশীল ও উন্নত-ভাবমগ্ন থাকা উচিত। সতী স্ত্রী যখন তাকে নিজ প্রয়োজনে আগ্রহভরে কামনা করে, তখন যদি সে আনত ও উপগত হয়, তাতে উভয়ের পক্ষে ভাল ছাড়া খারাপ হয় না। এর ভিতর-দিয়ে যে-সব সন্তানের আগমন হয়, তারা সাধারণতঃ উৎকর্ষ-অভিমুখী হয়। স্ত্রীর শরীর-মন খারাপ ও নিঃস্পৃহ, এমন সময়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই মিলিত হওয়া ঠিক নয়। সে-মিলন উভয়ের পক্ষেই অস্বস্তিকর ও অবসাদজনক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, স্ত্রীর একান্ত অনিচ্ছা ও অপছন্দকে উপেক্ষা ক'রে রত হ'তে গেলে, সে হয়তো বিরক্তিবশতঃ কোনসময় অজ্ঞাতসারে এমনতর অবজ্ঞার অভিব্যক্তি দেখাতে পারে, যার সংঘাত পুরুষের দেহ-মন, মস্তিষ্ক ও পুরুষত্বকে সাময়িকভাবে বা দীর্ঘকালের জন্য অল্পবিস্তর বিকল ক'রে দিতে পারে। তাই, বিবাহের পরও পুরুষের জীবন যথাসম্ভব ব্রহ্মবিহারেই অতিবাহিত হওয়া উচিত—স্ত্রীর প্রতি দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি ও কর্ত্তব্যপালন অস্খলিত রেখে। পুরুষের স্ত্রী-সর্ব্বস্বতা দাম্পত্যজীবনের সার্থকতার প্রধান শত্রু।

স্বাস্থ্য ও শান্তিময় পারিবারিক পরিবেশ

স্বাস্থ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে শান্তি, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সহনশীলতা, সন্তোষ, সদ্ব্যবহার, দোষদর্শন-বিমুখতা, পারস্পরিক গুণগ্রহণমুখরতা, প্রশংসা-প্রবণতা, সেবাপরায়ণতা ও সুখসাধনপ্রচেষ্টা। যেসব পরিবারের মধ্যে এই সব সদ্‌গুণ অনুশীলিত হয়, সেখানে স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, সম্পদ ও ধী উচ্ছল হ'য়ে ওঠেই কি ওঠে। ব্যাধি, বিকার, দারিদ্র্য ও নির্বুদ্ধিতা সেখানে প্রবেশ পাওয়ার পথ পায় কম। প্রাণদ প্রফুল্লতা, উল্লাস, উৎসাহ, উদ্দীপনা, আশাবাদিতা, শুভদর্শিতা ও নিরাকরণমুখীনতা সেই পরিবারের লোকদের নব-নব সত্তাসম্বর্দ্ধনী, উন্নয়নী উদ্যমের পথে পরিচালিত করে। এমনি ক'রে পারিবারিক বাতাবরণের সনুন্নয়ন স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য দূর্গের মত কাজ করে। অবশ্য এটা ঠিকই যে, যেমনটা আশা করা যায়, তা' সব ক্ষেত্রে হ'য়ে ওঠে না। কারণ, প্রত্যেকেরই প্রকৃতি আলাদা। পরিবারের একজনের হয়তো গঠনমুখী প্রবৃত্তি আর একজনের হয়তো ভাঙনমুখী প্রবৃত্তি। এতেই জেগে ওঠে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অসম্মিলন। আর, সবার শরীর মনের উপরই তা' বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু পরিবারের কর্ত্তা যিনি, তিনি যদি এইসব বাস্তব অবস্থার জন্য রাজী থেকে অরঞ্জিত ও অনভিভূত মনে সর্ব্বংসহ, স্বার্থ-প্রত্যাশাহীন, সামঞ্জস্যসাধনী সেবা ও প্রীতি নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হন, তাহ'লে তাঁরই প্রতি ভালবাসার ভিতর-দিয়ে পারিবারিক আবহাওয়া ধীরে-ধীরে বদলে যেতে পারে। পরিবারের কর্ত্তার অমনতর হওয়া সম্ভব একমাত্র গভীর ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে।

বৃহত্তর পরিবেশের সেবা

পারিবারিক জীবনের চালচলন, রীতিনীতি ও আচার-নিয়মও সদাচারসম্মত হওয়া উচিত। পারিবারিক জীবনই মানুষের অভ্যাস-গঠনের ক্ষেত্র। ঐ অভ্যাসই মানুষ ব'য়ে নিয়ে যায় সমাজে ও জগতে। আবার, শান্তিপূর্ণ সংসারের মানুষদেরই প্রবণতা থাকে সমাজে শান্তি, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার। সুগঠিত ব্যক্তিদের তরফ থেকে এই বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা যদি না চলে—বাস্তবসম্মত সমস্যা-সমাধানী পন্থায়,—তাহ'লে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে প্রত্যেকের শরীর, মন, কর্ম্মক্ষমতা, স্নায়ু ও আয়ু

বিধ্বস্ত হ'তে বাধ্য। তাই শুধু পারিবারিক স্বস্তি ও সুস্থতা নিয়ে মজে থাকলেই আমরা কিন্তু সুস্থ থাকতে পারব না, পরিবেশের অভাব, অশান্তি ও অস্বস্তির আগুন আমাদের সুখের ঘর জ্বালিয়ে দিতে এগিয়ে আসবে। স্বাস্থ্য ও জীবন যদি আমাদের একান্তই কাম্য হয়, তবে বৃহত্তর পরিবেশকে স্বাস্থ্য ও জীবনের পথে সঞ্চালিত করাই আমাদের স্বার্থবোধ ও দায়িত্ববোধের অঙ্গ হওয়া উচিত। এইজন্য বিহিত যাজন অর্থাৎ সঞ্চারণা ও সেবা চাই। বহুর মধ্যে এইভাবে আমরা যত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ব, ততই আমাদের চেতনা প্রসারিত হবে, আর এই প্রসারিত চেতনাই আমাদের সুখ ও সুস্থিকে ক্রমবৃদ্ধিপর ক'রে তুলবে। সুখ মানেই হচ্ছে অপরকে সুখী করা-জনিত আত্মপ্রসাদময় চেতনা। লোকস্বার্থী সেবা-সম্পোষণার ভিতর-দিয়ে এই নিগূঢ় সুখবোধ যত উথলে উঠবে, আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তিও তত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—অভিনব তরঙ্গভঙ্গে—যেমন ক'রে জোয়ারের জল নদীর দু'কুল ছাপিয়ে ফুলে-ফেঁপে ধেয়ে আসে। ফলকথা, নিঃস্বার্থ সেবাপ্রাণতাই দেহ-মনে সিংহ-বলের সঞ্চার ক'রে তোলে, আর সক্রিয় বিস্তারশীলতাই জাগিয়ে তোলে উজ্জীবনী উল্লাস।

শরীরচর্চ্চা

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিয়মিত ও পরিমিত হাঁটা-চলা, খেলাধূলা, ব্যায়াম, কাজকর্ম্ম এককথায় শারীর অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের একটা প্রধান লক্ষণ হ'ল শরীর-সর্বস্ব ও শরীর-সচেতন না হ'য়ে বরং শরীরের কথা ভুলে গিয়ে শরীর-মনকে সমীচীন কাজের নেশায় বিভোর ক'রে রাখতে পারা। তার জন্যই প্রয়োজন হয় নিয়মিত শরীরচর্চ্চার। শরীরচর্চ্চা একটা আনন্দের ব্যাপার হওয়া উচিত। সেদিক দিয়ে সমবেতভাবে খেলাধূলা, নাচগান, কীর্ত্তনাদি করা খুবই ফলপ্রসূ। ব্যায়াম করতে গেলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন কার শরীর-যন্ত্রে খাঁকতি কোন্‌দিকের এবং তার পরিপূরণের জন্য কোন্ ধরনের ব্যায়াম কতখানি করা উচিত। নইলে আবোল-তাবোলভাবে ব্যায়াম করলে হয় না। সুনির্ব্বাচিত যৌগিক আসনও নিয়মিত ও নির্ভুলভাবে করতে পারলে নীরোগ ও সবল শরীরলাভের পক্ষে সহায়তা হয়। অনেকের পক্ষে ম্যাসাজও উপকারী হ'য়ে থাকে। অনেকের কর্ম্মজীবন এমনতর শ্রমসাধ্য যে তারপর আর আলাদা শরীরচর্চ্চার দরকার হয় না। তবে সাঁতারকাটা, বেড়ান

ইত্যাদি প্রায় সকলের পক্ষেই ভাল, কিছু-কিছু কৃষিকাজ, উদ্যান-পালনও মন্দ নয়। শরীর-মনের সহনপটুতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা বাড়াবার জন্য ধীরে-ধীরে নিজেকে স্বেচ্ছায় উত্তরোত্তর অধিকতর চাপ ও চোট সইতে অভ্যস্ত ক'রে তোলা ভাল। তাতে দুরূহ দায়িত্বভার বা ভাগ্যবিপর্য্যয় যাই আসুক জীবনে, তা' আমাদের ঘাবড়ে দিতে পারবে না। আরামপ্রিয়তা বিশেষতঃ আরামের দাসত্ব উন্নতির অন্তরায়। যুবকগণকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল, সহনপটু, কষ্টসহিষ্ণু ও সব অবস্থার জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলার ব্যাপারে বিধিবদ্ধ সামরিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা আছে। যে বিকৃত মানসিকতা বা অসার আত্মমর্য্যাদাবোধ শিক্ষিত, ধনী ও অভিজাতশ্রেণীকে দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজের প্রতি বিমুখ ক'রে তাদের সর্ব্বব্যাপারে পঙ্গু ও পরনির্ভরশীল ক'রে তোলে, তার মূলোৎপাটন ক'রে ফেলতে হবে। দেশের শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

জীবিকা ও জীবনযাত্রা প্রণালীকে সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে হবে

কাজকর্ম্ম সম্পর্কে একটা কথা এই যে, প্রত্যেকের উদরান্ন-আহরণী কাজ এমনতর হওয়া উচিত যাতে ঐ কাজে সে আনন্দ পায়। তাতে মানুষের কর্ম্মশক্তি ও শরীর অক্ষুণ্ণ থাকে। সেইজন্য আমাদের সমাজে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিসঙ্গত উন্নয়নী, উপচয়ী কাজে রত থাকার বিধান ছিল। জীবিকা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই দিকটি উপেক্ষা করলে জাতীয় স্বাস্থ্য, কর্ম্মক্ষমতা, উৎপাদন ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে বাধ্য। তাছাড়া, সভ্যতার চাপে জীবন-যাপন-প্রণালী যত কৃত্রিম ও প্রকৃতির উদার অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, ততই মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বস্তি বিদায় নেবে। প্রগতিশীল যুগের চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়ে ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে আত্মসাৎ করেও, মহাকাশ জয়ের পরিকল্পনাকে অব্যাহত রেখেও, কেমন ক'রে সবকিছুর সাত্বত সঙ্গতিসাধন ক'রে মাটির মানুষের জীবন সুখকর, স্বস্তিপ্রদ ও মধুময় ক'রে তোলা যায়, তা' আমাদের ভেবে বের করতেই হবে। তথাকথিত প্রগতিশীলতার অন্ধ অনুকরণের মোহে স্বাস্থ্য, সোয়াস্তি, শান্তি, তৃপ্তি ও জীবনকে বাজী রেখে আমরা যদি হীনম্মন্যতাবশতঃ চোখ-ধাঁধান আলেয়ার পিছনে ছুটি, তাহ'লে সেটা কি আমাদের বেকুবী হবে না? সত্তার জন্যই তো

সব? না, আর কিছু? প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতি পদক্ষেপে এই মূল কথাটি স্মরণ রেখে তদনুগ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে যদি আমরা চলি, তাহ'লে আমরা আমাদের সৃষ্ট সভ্যতা, বিজ্ঞান, প্রগতি ও আধুনিকতার নিয়ামক ও প্রভু হ'য়ে থাকতে পারব, তার দাস হ'য়ে, তার সার্ব্বিক-কল্যাণবিরোধী ব্যত্যয়ী-শক্তি, গতি ও প্রবণতার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে ভগবদ্দত্ত সত্তার অপচয় ঘটতে দেব না। জগতের কোনকিছুর দাবী যদি সত্তার দাবীর সঙ্গে সঙ্গতিশীল না হয়, তবে তা' আমরা বীরোচিতভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে চলব। এই অসৎ-নিরোধী সৎ-সাহস ও ব্যক্তিত্বের একান্ত প্রয়োজন আছে—অবক্ষয়ী গড্ডালিকা প্রবাহ ও বিকার-বিকৃতি যা' যুগে-যুগে এক-এক স্থানে এক-এক মূর্ত্তি নিয়ে হাজির হয়—তা' থেকে নিজেকে ও অপরকে বাঁচাবার জন্য।

জপধ্যান ও স্বাস্থ্য

আমরা মানসিক সদাচারের প্রসঙ্গে জপধ্যানের বিষয় উল্লেখ করেছি। শারীরিক শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করা দরকার। বীজমন্ত্র মানে সৃষ্টির বীজীভূত আদি স্পন্দনের প্রাণপরিচায়ক মন্ত্র। তার শক্তি অসাধারণ। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে বিহিতভাবে জপধ্যান করলে শরীরের মধ্যে বিপুল শক্তি, শুভসম্বেগ ও তাপের সৃষ্টি হয়। খাদ্য ও ঔষধের পরিপূরক হিসাবে জপধ্যানের শক্তি অসাধারণ। জপধ্যান নিথর জীবনীয় শক্তিধারাকে সলীল, উজ্জ্বল ও তরঙ্গায়িত ক'রে উৎসাহের বান ডাকিয়ে তোলে। জপধ্যান জীবনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে রোগ-নিরাময়ে সহায়তা করে মৃতকল্প রোগীর দেহ স্পর্শ ক'রে নাম ক'রে নামের সঞ্জীবনী স্পন্দনের সঞ্চারণায় কেমন ক'রে তাদের বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেদের কাছ থেকে আমরা বহু কাহিনী শুনেছি। দেহ স্পর্শ ক'রে নাম ক'রে রুগ্ন ও নৈরাশ্যপীড়িত মানুষকে সন্দীপ্ত ক'রে তোলার ব্যাপারে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু-কিছু আছে। তাছাড়া, জপধ্যান মস্তিষ্কের কোষসমূহকে সামগ্রিকভাবে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। এতে মস্তিষ্কস্থিত পিটুইটারি গ্রন্থির ক্ষরণ ভাল হয়, তা' আবার থাইরয়েড, এড্রিন্যাল, গোনাড প্রভৃতি নালিকাবিহীন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে উদ্দীপিত ক'রে তোলে। এই সব গ্রন্থি যথাযথভাবে সুক্রিয় হ'লে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য, বৃদ্ধিবৃত্তি ও মানস-প্রকৃতি জীবনীয় ছন্দে সুসমঞ্জস ভঙ্গীতে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। স্বাস্থ্যের উপর জপধ্যানের প্রভাব সম্বন্ধে

বলতে গেলে আরো অনেক কথা বলা চলে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা তা' থেকে বিরত থাকলাম।

শরীর-মনের সমতা-সন্দীপী ব্যবস্থাদি

শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মত উপযুক্ত নিদ্রা, বিশ্রাম, নির্দ্দোষ আমোদ-আনন্দ, মনোরম সাহিত্যপাঠ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-উপভোগ, প্রাণখোলা হাসি, গল্পগুজব, আড্ডা, শখ (hobby), শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাদির যথোচিত স্থান থাকা চাই জীবনে। নইলে ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তির স্ফুরণ হয় না। কর্ম্মশক্তি, বোধশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি একঘেয়ে ও ভোঁতা হ'য়ে পড়ে। তার মধ্যে নবীনতা ও সজীবতার রণন ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে না। তাই, সবসময় অতি গম্ভীর বা গুরুতরভাবে কর্ম্মবিব্রত থাকা ভাল নয়। জীবনে মাত্রামত প্রয়োজন আছে রস-বোধের, হালকা ও নিশ্চিত হবার, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের অহমিকা ত্যাগ ক'রে শিশুটির মত সরল, ভারমুক্ত, নির্ভরশীল, নির্ভয়, নিরুদ্বেগ ও নিরাসক্ত মন নিয়ে দুনিয়ার দিকে তাকাবার। তাই, কর্ম্মমুখর লোকসঙ্গ যেমন প্রয়োজনীয়, নির্জ্জনতা, ইষ্টসঙ্গ ও শান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে কালযাপনও তার থেকে কম প্রয়োজনীয় নয়। শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখতে গেলে শক্তি-আহরণ ও সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। ঐ সংরক্ষিত তহবিল না থাকলে, মানুষের কর্ম্মদক্ষতা ও আয়ু অকালে ফুরিয়ে যায়, ফতুর হ'য়ে যায়। শক্তিসঞ্চয়ের জন্য নিরন্তর নামপরায়ণতা ও নিয়মিত শবাসন বিশেষ কার্য্যকরী।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

জাতির স্বাস্থ্য-সাধনা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত। তাই, রাষ্ট্রের তরফ থেকে উচিত এমনতর একটি সমন্বয়ী ও সুসম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণ করা, যার ফলে জনগণের স্বাস্থ্য, কর্ম্মক্ষমতা ও আয়ু বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। জনগণের রোগ-প্রতিষেধী ক্ষমতা যাতে বৃদ্ধি পায়, সেদিকেও রাষ্ট্রকে নজর দিতে হবে। রোগ-নিবারণ ও রোগ-চিকিৎসা এই দ্বিমুখী ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। ওষুধ ও খাদ্যে জাল, ভেজাল ও অতিমুনাফাবাজীর বিরুদ্ধে সরকারকে সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।

সংযম ও সুনীতিকে প্রবুদ্ধ ক'রে, বিজ্ঞানের আশ্রয়ে দেশের জন্মহারকে স্বাস্থ্য, খাদ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, কর্ম্মসংস্থান, পরিবহন, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বাসস্থান, কৃষিজমি, জনবিন্যাস ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে হবে। জনগণ যাতে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও সমাজ-পরিবেশের জীবনীয় নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানতে ও আচরণ করতে প্রবুদ্ধ হয়, তার ব্যবস্থাপনাও রাষ্ট্রকে করতে হবে। নইলে সেই অজ্ঞাত ও অনাচারজনিত সমস্যা জনগণকে যেমন পীড়িত করবে, রাষ্ট্রকর্ণধারগণকেও তেমনি বিব্রত ক'রে তুলবে।

সভ্যতার সংকট ও বিশ্ববাসীর স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আর একটা উদ্বেগের বিষয় এই যে অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ, অনিয়ন্ত্রিত জনন, অনিয়ন্ত্রিত জীবন-চলনা, জটিল সামাজিক পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর শ্রমজীবন, আণবিক যুগের প্রচণ্ড গতিশীলতা ও প্রতিযোগিতার চাপ, আদর্শহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা, মহত্তর মূল্যবোধের অভাব, সার্থকতাবোধের অবিদ্যমানতা, শূন্যতাবোধ, নানা ভাবসংঘাত, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তাবোধ, কপটতা, অস্থিরতা, উত্তেজনা, পারিবারিক অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অতি-দারিদ্র্য, অতি-প্রাচুর্য্য, অতিকৃচ্ছ্রতা, অতি-ভোগ, অপুষ্টি, পুষ্টির বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্থানাভাব, খাদ্যাভাব, নিরালা বিশ্রামের অভাব, নিরাপত্তাবোধের অভাব, দুরুহ জীবন-সমস্যা, মানসিক যন্ত্রণা, বিবেকের পীড়ন, মাদকতা ইত্যাদি বহু কারণের দরুন আজকাল সারা পৃথিবীতে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা, জড়ধীতা, মনোরোগ কামোন্মদনা, জন্মগত অপরাধপ্রবণতা, আত্মহত্যার ঝোঁক, সন্দিগ্ধচিত্ততা, উন্মাদ, অপস্মার-ব্লাডপ্রেসার, থ্রম্বসিস্ ইত্যাদি ব্যাধি আগুনের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব খলব্যাধির সংক্রমণ ও বিস্তার থেকে মনুষ্যজাতিকে বাঁচাতে গেলে মানুষের চিন্তাধারা, জীবনদর্শন ও জীবনচর্য্যার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। ফলকথা, ঈশ্বরপরায়ণতা, সামগ্রিক দৃষ্টি ও বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতাবোধের আলোকে আমরা যদি জীবন-সমস্যাগুলিকে গোটাভাবে নূতন-চোখে দেখতে না শিখি এবং তার পুরোপুরি সমাধানের জন্য যেদিকে যতদূর অগ্রসর হ'তে হয়, তা' হ'তে রাজী না থাকি, তবে বিশ্ব-বিধানের অবজ্ঞাজনিত বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য আশা করা যায় যে, আমাদের শুভবুদ্ধি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবে। তাই, আমরা মরব না, মারব না,

বরং মৃত্যুকেই অবলুপ্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করব। ঈশ্বর-প্রেমমুগ্ধ সেবামুখর নিরন্তর চলৎশীলতাই আমাদের সর্ব্বদার তরে তন্ময় ক'রে রাখবে, মসগুল ক'রে রাখবে। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর চিন্তা আমাদের মনকে আক্রমণ করবার সুযোগই পাবে না। এমনি ক'রেই আমরা অজর, অমর ও ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে উঠব—স্বাস্থ্য ও সদাচারবিধির সম্যক ও নিখুঁত পরিপালনের ভিতর দিয়ে। এই-ই আমাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট ভাগ্যলিপির ফলশ্রুতি।

অর্থনীতি

অর্থনীতির মূলীভূত উপাদান

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান মানুষের জীবনচলনার ক্ষেত্রে প্রতি পদক্ষেপে একটি অপরিহার্য্য ব্যাপার। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের নানাবিধ অভাব ও প্রয়োজন এবং তার পরিপূরণ। তাই, শ্রম, কর্ম্মদক্ষতা, উৎপাদন, উপার্জ্জন, ভোগ, বন্টন, বিনিময়, ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন, জীবিকা, চাহিদার যোগান, ব্যয়, অভাবমোচন, সমাজবিন্যাস, বৈষয়িক কল্যাণ, জ্ঞান, গবেষণা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন-মূলক প্রচেষ্টা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তাবিধান, প্রতিরক্ষা, রকমারি পরিচর্য্যার ব্যবস্থা, এককথায় সর্ব্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কারবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনীতির আওতার মধ্যে এসে পড়ে। অর্থনীতির মূলীভূত প্রধান দু'টি উপাদান হচ্ছে প্রকৃতি ও মানুষ। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মানুষের তরফ থেকে তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করার মত চরিত্র, ক্ষমতা ও গুণপনা। এই দুইয়ের শুভ সংযোগ যদি না হয়, তাহ'লে জাতীয় সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয় না। উপযুক্ত নদনদী, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, জমির উর্ব্বরতা, উদ্ভিজ্জ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, পশু-সম্পদ, কাঁচামাল, শিল্পবাণিজ্যের বিকাশের অনুকূল ভৌগোলিক সংস্থিতি ইত্যাদি প্রাকৃতিক আনুকূল্যের অন্তর্গত। তবে প্রাকৃতিক আনুকূল্যই যথেষ্ট নয়। চাই তার সুযোগ গ্রহণ করা। এই কাজটি করে মানুষ। সে শুধু আনুকূল্যেরই সুযোগ গ্রহণ করে না, সে প্রতিকূলতাকে জয় ক'রে, বাধাকে বাধ্য ক'রে তাকেও উন্নতির আবাহক ক'রে তোলে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক অভ্যুদয়ের পিছনে মানুষের সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি, শিক্ষা, কর্ম্মকৌশল, সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা, সমাজব্যবস্থা, সংগঠন-প্রতিভা, আদর্শনিষ্ঠা, জীবনদর্শন ইত্যাদির অবদান নিতান্ত কম নয়। অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে এই সব মানবিক উপাদানকে ক্রমোন্নত ক'রে তুলে সর্ব্বসাধারণের অর্থনৈতিক মান উন্নত ক'রে তোলাই আমাদের অভিপ্রায়।

ধর্ম্মনীতি ও অর্থনীতি

আমরা চাই সাত্বত অর্থনীতি অর্থাৎ সত্তাসম্বর্দ্ধনী অর্থনীতি। যে অর্থনীতি ধর্ম্মনীতি অর্থাৎ জীবননীতির পরিপন্থী, তা' কিন্তু আমাদের প্রকৃত কল্যাণসাধন করতে পারে না। তাই চাই ধর্ম্মানুগ অর্থ। ধর্ম্মানুগ অর্থ বলতে সেই অর্থকেই বুঝায়, যে-অর্থ পরিবেশকে সেবায় তুষ্ট-পুষ্ট ক'রে তোলার ভিতর-দিয়ে পাওয়া যায়। শোষণ, অসাধুতা ও দুর্নীতির ভিতর-দিয়ে যে অর্থাগম হয়, তাকে ধর্ম্মসম্মত অর্থ বলা যায় না। এই অর্থকে বলা যায় অধর্ম্মপ্রসূত অর্থ। তাই, এই ঐশ্বর্য্যের স্থিতি, ধৃতি বা বৃদ্ধি অনিবার্য্যভাবে ব্যাহত হয়। তার কারণ হচ্ছে, আমাদের পাওয়ার উৎস হচ্ছে বৃহত্তর পরিবেশ বা সমাজ। আমরা যদি আমাদের আচরণের ভিতর-দিয়ে পরিবেশের অস্তিত্বকে বিপন্ন ক'রে তুলি, তাহ'লে পরিবেশ হয় একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, নয়তো পরিবেশ দুর্ব্বল হওয়ার দরুন, তাদের কাছ থেকে যে-সেবা ও পোষণ পাবার তা' আমরা পাব না, এবং তার দরুন আমাদের জীবন ও অর্থ-সামর্থ্যের মূলে টান পড়বে। তাই, এই অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ বর্জ্জন করতে হবে।

অর্থ ও মানুষ

অর্থের কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের বিশেষ ক'রে ভাবতে হবে মানুষের কথা, মানুষের সামগ্রিক জীবনের স্বস্তির কথা। জীবন পরমপিতার দান। এই জীবনের সার্থকতার পথে অর্থ অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু জীবনকে বাজী রেখে অর্থনেশায় নিজেকে উৎসর্গ করা একান্ত অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যঘাতী। অর্থের পায়ে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করবার অধিকার আমাদের নেই। তাতে জীবন ও জীবনপ্রভু যিনি তাঁকে অবমাননা করা হয়। এই অধিকার যেমন আমাদের নেই, তেমনি অর্থলালসায় অভিভূত হ'য়ে অপরের ক্ষতিসাধন করার অধিকারও আমাদের নেই। আমরা যেখানে অপরকে বাঁচিয়ে নিজেদের বাঁচার ভিত্তি রচনা করি, সেখানে আমরা অবাধ ও স্বাধীন। বিধিরূপী পরমপিতা, বিশ্বপরিবেশ ও বিশ্বপ্রকৃতি সেখানে চিরকাল আমাদের সহায়। এর উল্টো পথে চললে শেষ রক্ষা হবে না। আশু উন্নতি হ'লেও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, চালাকী দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। এই হ'ল অমোঘ ঐতিহাসিক বিধান।

যোগ্যতর সদ্ব্যবহার

পরিবেশ যদি দরিদ্র ও অনুন্নত থাকে তাহ'লে একক কেউ দীর্ঘদিন তার ঐশ্বর্য্য ও উন্নতি স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারে না। তাই, প্রত্যেকটি যোগ্য ও অর্থবান লোকেরই চেষ্টা করা উচিত যাতে তার যোগ্যতা ও অর্থসামর্থ্যের বিনিয়োগে সে আরও দশজনকে যোগ্য ও সম্পদশালী ক'রে তুলতে পারে। সে যদি সাধ্যমত তার পরিবেশকে তার স্তরে টেনে তুলতে চেষ্টা না করে, তবে পরিবেশ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে তাকে টেনে নিজেদের স্তরে নামাতে চেষ্টা করবেই। অবশ্য এটা যে তাদের পক্ষে লাভজনক তা' কিন্তু নয়। কেউ যদি প্রকৃত যোগ্য হয় তবে তার প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ না হ'য়ে বরং তার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে তার গুণগুলি আয়ত্ত করতে চেষ্টা করাই ভাল। এই চেষ্টা যে করে সেই লাভবান হয়। তবে এই নীতি যতই সুফলপ্রদ হোক না কেন, যোগ্য যে তার দায়িত্ব এ ব্যাপারে কম নয়। তার উচিত ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে অপরকে আত্মোন্নয়নের প্রচেষ্টায় প্রবুদ্ধ ও উৎসাহিত ক'রে তোলা। ধনী যারা তারা যদি নির্ধনদের আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত ক'রে তাদের অহং ও হীনম্মন্যতাকে উসকে তোলে, তাহ'লে ঐ দম্ভ যেমন তাদের কাল হয়, তেমনি ঐ নির্ধনদের সাত্বত আত্মবিকাশের পক্ষেও তা' অত্যন্ত ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার কল্যাণকর প্রয়োগ

আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু এ-কথাও আমরা স্বীকার করি যে, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি মুনাফাসর্ব্বস্ব ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি যদি সমাজকে শোষণ করার পথে পরিচালিত হয়, তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিনাশী সমাজ-ব্যবস্থার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। তা'তেও সমস্যার সমাধান হ'বার নয়, যদি মানুষের চরিত্র না বদলায়। কারণ, মানুষ যদি দুষ্ট হয়, সে যে-কোন বিধান ও সংগঠনকেই দূষিত ক'রে অন্যকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। সুতরাং সেই বিজ্ঞানকে বিধিবদ্ধভাবে অনুসরণ ক'রে চলতে হবে যাতে মানুষকে সংযত ও সর্ব্বস্বার্থী ক'রে তোলা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নতি পরিবেশসাপেক্ষ

একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যেমন দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি তার স্থায়িত্বের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সর্ব্বসাধারণেরও অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন। পৃথিবীর যে-কোন দেশের একটি লোকও যদি তার অর্থনৈতিক উন্নতিকে কায়েম করতে চায়, তবে তাকে পৃথিবীর সব দেশের সব লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। উন্নত দেশগুলিকে তাই নিজেদের স্বার্থেই সেবা, সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত ক'রে তুলতে। অনুন্নত দেশগুলির পক্ষেও নিজেদের ও অপরাপর দেশের উন্নতির জন্য যা' করার তা' করতে হবে। পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে স্বয়ংভর ও স্বাবলম্বী হওয়া দিকে তারা যত নজর দেবে, ততই তারা আত্মশক্তির উদ্বোধনে সার্থকতার পথে অগ্রসর হবে। প্রত্যাশাহীন হ'য়ে অপরের জন্য করা ও অপরকে দেওয়ার বুদ্ধি নিয়ে যারা যত চলবে তারা তত যোগ্য হ'য়ে উঠবে। এটা জাতিগত হিসাবে যেমন, ব্যক্তিগত হিসাবেও তেমনি। তবে অপরকে দিতে গেলেও এমনভাবে দেওয়া উচিত, যাতে তার মনে প্রত্যাশার শিকড় গাড়তে না পারে। কারণ, কারও অসমীচীন প্রত্যাশাও যদি পরিপূরিত না হয়, তাহ'লেও সে শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়।

অর্থনৈতিক উন্নতির মৌলিক ভিত্তি

অর্থনৈতিক উন্নতির গোড়ার কথা হচ্ছে অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ লোকস্বার্থী সেবাবুদ্ধি। এর ভিতর দিয়ে হয় যোগ্যতার জাগরণ। আর, নিজের যোগ্যতা দিয়ে মানুষ যত অপরের প্রয়োজন মেটাতে পারে, ততই হয় তার অর্থের আগম। অপরকে লাভবান করার ভিতর দিয়েই মানুষ নিজে লাভবান হয়। এই হ'ল ভাগবত অর্থনীতির ধারা। তাই, প্রত্যেককেই যত্নবান হ'তে হবে যাতে সে কোন-না-কোন ভাবে অপরের ধারণ, পালন, পোষণ ও রক্ষণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে মানুষের শক্তি সব চাইতে সলীল হ'য়ে ওঠে তার সহজাত সংস্কারানুযায়ী কর্ম্মে। তাই, সেবাবুদ্ধিকে পরিচালিত করা চাই ঐ বিশিষ্ট পথে। আবার, প্রত্যেককে সেবা ও পোষণ দিতে হবে এমনভাবে যাতে সে ভালভাবে বেঁচে থেকে তার বিশিষ্ট যোগ্যতার সম্ভাব্যতাকে সম্যক স্ফুরিত ক'রে তুলতে

পারে। উদ্ভাবন, গবেষণা, সৃজনী-প্রতিভা, উৎপাদন, ভোগদ্রব্যের যোগান, ঐশ্বর্য্য, সুখ ইত্যাদি সবকিছুই অঢেলভাবে বৃদ্ধি পাবে এতে। মোটকথা, মানুষের বংশানুক্রমিক জনি (gene) গত সম্পদের উপর ভিত্তি ক'রে তার বৃত্তি বা জীবিকা নির্দ্ধারণের বিধি যদি রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়, তাহ'লে কিন্তু দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা, নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি অনেকাংশে দূরীভূত হ'তে পারে। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে মহাযন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবমত সঙ্কুচিত ক'রে এবং কুলবৈশিষ্ট্যঅনুযায়ী গার্হস্থ্যযন্ত্র ও পারিবারিক শিল্পের প্রবর্ত্তন ক'রে কিভাবে শোষণমূলক পুঁজিবাদ ও স্বাতন্ত্র্য-অপলাপী সার্ব্বিক রাষ্ট্রীয় আধিপত্য থেকে মানুষকে বাঁচান যায়—ইষ্ট, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একতানতাকে রক্ষা ক'রে;—ইত্যাদি বিষয় আমরা বর্ণাশ্রম অধ্যায়ের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তাই, অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐ-সব বিষয় এখানে আমরা পুনরায় আলোচনা করব না।

চাই প্রত্যেকের জন্মগত সম্ভাব্যতার সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যবহার

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধানে সামগ্রিক দৃষ্টি, বিজ্ঞানবোধ, বাস্তবচেতনা ও কল্যাণের প্রতি যুগপৎ শ্যেনদৃষ্টি না রাখলে চলবে না। এগুলি দ্বারা যদি আমরা পরিচালিত হই, তবে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বর্ণধর্ম্মের শাশ্বত, সার্ব্বজনীন, বিজ্ঞানসম্মত মূলতত্ত্বকে আমরা পরিহার ক'রে চলতে পারি না। অবশ্য বর্ত্তমান যুগে তার প্রয়োগ কিভাবে হবে না-হবে সে-বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে। তবে এ কথা ঠিকই যে মানুষের দেহমন-অনুস্যূত বিশেষ প্রবণতা, সম্বেগ, সম্ভাব্যতা ও যোগ্যতাকে আবিষ্কার ক'রে তা'কে যথাস্থানে বিহিত কর্ম্মে নিয়োজিত করতে না পারলে যেমন তার নিজস্ব জীবনের অপচয় হয়, তেমনি হয় সমাজের ক্ষতি। এই ক্ষতি ও ক্ষতের ফলে রকমারি জীবনীয় রসদের সাম্যসঙ্গত উৎসৃষ্টি ও বন্টন ব্যাহত হয়। তার স্থূল লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয় অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড বৈষম্য ও বিপর্য্যয়। কোন রাষ্ট্র বা সমাজ যদি প্রতিটি ব্যষ্টির জন্মগত-সম্ভাব্যতার নির্ণয়, বিকাশ ও সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা না করে, তাহ'লে সে রাষ্ট্র ও সমাজ মানবজাতি ও বিশ্বস্রষ্টার কাছে অপরাধী হ'য়ে দাঁড়ায়। একটি জীবনও যদি সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দোষে অসফল হয়, তাহ'লে তা'তেও বিশ্বমানবের অগ্রগতি পরোক্ষভাবে কিছু-না-কিছু

ব্যাহত হয়। এই প্রসঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে, দেশে-দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেমন সাত্বত রূপান্তর-সাধনের প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংগঠনের। অনেকে বৈশিষ্ট্যগত পথে আত্মবিকাশ ও বৃত্তিগ্রহণের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অসন্তোষ, লোভ ও হীনম্মন্যতার তাড়নায় অন্যপথ বেছে নেয়। সেখানে কিন্তু নিজের খেয়ালে নিজেকে ও সমাজকে বঞ্চিত করার দরুন সে নিজেই অপরাধী। তার খেয়ালী চলনায় বাদ সাধার অধিকার সমাজের আছে। বর্ণাশ্রমী সমাজ তাই সহজাত-সংস্কারসম্মত নয় এমনতর বৃত্তিগ্রহণকে বলেছেন অপরের বৃত্তি-অপহরণ এবং তাকে মহাপাপ ব'লে ঘোষণা করেছেন।

চাই পারস্পরিকতা ও সংহতি

জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বিশেষ ক'রে চাই বৈশিষ্ট্য-পোষণী জাতীয় সংহতি ও ঐক্য এবং প্রীতিমধুর পারস্পরিকতা। মানুষ যদি মানুষকে আপন ব'লে ভাবতে না শেখে, প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের না হয়, পারস্পরিক বিরোধ যদি প্রবল হ'য়ে ওঠে, অর্থস্বার্থী হ'য়ে একে অপরের সাত্বত স্বার্থকে যদি ব্যাহত ও বিপন্ন ক'রে চলে, তাহ'লে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ বিধ্বস্ত হ'তে বাধ্য হয়। শিল্পপতি যদি শ্রমিকের সাত্বত স্বার্থ না দেখে এবং শ্রমিক যদি শিল্পপতির সাত্বত স্বার্থ না দেখে মালিক-শ্রমিক বিরোধ যদি ক্রমাগত চলতে থাকে, তাহ'লে উৎপাদন ব্যাহত হ'তে বাধ্য হয়। ফলে, মালিক, শ্রমিক এবং জনগণ সকলেই অসুবিধার মধ্যে পড়ে। মালিকেরও অতিলোভ বর্জ্জন করতে হবে, শ্রমিকেরও অন্যায্য দাবী ত্যাগ করতে হবে। মালিকের অতিলোভ এবং শ্রমিকের অন্যায্য দাবী এই দুইটিকে অক্ষত রেখে শিল্প-বিরোধের সামঞ্জস্য করতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় তথা দ্রব্যমূল্য অসাধারণ বৃদ্ধি পাবে। এবং তাতে সাধারণ লোকের দুর্গতির একশেষ হবে। আর, জনগণ বিধ্বস্ত হ'লে, তারা নিঃস্ব ও দেউলিয়া হ'য়ে পড়লে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যত টাকাই থাকুক না কেন, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচান যাবে না। জন-জীবন যদি উচ্ছল না হয়, তাদের অর্থ, সামর্থ্য ও ক্রয়ক্ষমতা যদি অক্ষুণ্ণ না থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে দেশের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। সমাজের উঁচুতলাগুলি দাঁড়িয়ে থাকে

নীচুতলার উপর, নীচুতলা চুরমার হ'য়ে গেলে উঁচুতলাগুলিও ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী উপার্জ্জনের তারতম্য থাকবে। কিন্তু নজর রাখতে হবে দেশের একটি নাগরিকও যেন মানুষের মত বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। প্রত্যেকের জন্য যেন উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ধনিক যাতে আয়কর ফাঁকি দিতে না পারে, তার কঠোর ব্যবস্থা চাই। সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎকোচগ্রহণ নির্ম্মমভাবে দণ্ডিত হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের কোষাগার যত উচ্ছল হয়, ততই ভাল। কারণ, রাষ্ট্রের হাতে প্রচুর অর্থ থাকলে তার এক বিরাট অংশ জনসাধারণের যোগ্যতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। প্রত্যেক কল্যাণ-রাষ্ট্রই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, মানুষ যাতে অন্তরে-বাইরে উভয়দিকেই উন্নত চলনে চলতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এক দিককে উপেক্ষা ক'রে আর একদিকের উপর আত্যন্তিক জোর দিতে গেলে মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

অসৎ-নিরোধ

মালিক হোক, শ্রমিক হোক, জমিদার-জোতদার হোক, কৃষক হোক সকলের দৃষ্টিভঙ্গী আজ বদলাতে হবে। সমবেতভাবে সকলকে একযোগে ভালভাবে বাঁচতে হবে—এই হ'ল আমাদের পণ। অপরের বিনিময়ে বাঁচার অধিকার কারও নেই। সে-প্রচেষ্টা অসৎ ও অন্যায় প্রচেষ্টারই সামিল। শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হয়, সেখানে সকলকে তার পিছনে দাঁড়াতে হবে। কারও সাত্বত স্বার্থকে নির্ব্বিরোধে বিপন্ন হ'তে দেওয়া মানে সমাজবিরোধী শক্তিকে দুর্ব্বার ক'রে তুলে নিজের ও অপরের ক্ষতির পথ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া! "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে বিধাতার রোষ তারে তৃণসম দহে।"

"মিত্র জানিস সেই—
না ডাকলেও তুই
শত্রুকে তোর দলন করে যেই।"

যে প্রীতিসংহতির কথা আমরা বলছিলাম, এটা তারই একটা দিক। প্রত্যেকের

স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে যেমন চাই পারস্পরিক সত্তাপোষণী প্রয়াস, তেমনি চাই আপোষরফাহীন অসৎ-নিরোধী পরাক্রম। অবশ্য তাই ব'লে আমরা দোষকে ঘৃণা করলেও দোষীকে ঘৃণা করব না। আমাদের লক্ষ্য হবে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য সমাধান, মৈত্রীবন্ধন ও স্বার্থসম্বদ্ধতা। প্রধান কথা এই যে, বৃহত্তর সমাজের সাত্বত স্বার্থকে আত্মস্বার্থের অঙ্গীভূত ক'রে দেখতে আমরা যদি অভ্যস্ত না হই, এবং ঐ ব্যাপক স্বার্থের সংরক্ষণে যদি আমরা সক্রিয় দায়িত্ব গ্রহণ না করি, তবে সেই সমাজবিরোধী ঔদাসীন্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলে আমাদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের ভিত্তি-ভূমিও টলটলায়মান হ'য়ে ওঠে। এমনকি প্রাণিজগৎ বা উদ্ভিদ-জগতের প্রতি বিমুখতাও আমাদের সত্তাসংরক্ষণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, ব্রাহ্মীচেতনা বাদ দিয়ে সঙ্কীর্ণ স্বার্থাভিভূত চেতনা নিয়ে জন, জাতি বা জগতের অর্থনৈতিক সমস্যার সুসম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়।

আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন

দেশের অর্থনীতি যদি আত্মনির্ভরশীল না হ'য়ে পরনির্ভরশীল হয়, বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক পণ্যের উপর যদি কোন দেশকে পদে-পদে নির্ভর করতে হয়, তবে তাতে সেই দেশের অর্থনৈতিক জীবন শুধু পঙ্গু হ'য়ে থাকে না, নানারকম বাধ্যবাধকতা ও চাপের মধ্যে প'ড়ে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলা কঠিন হ'য়ে পড়ে। "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্"। আত্মশক্তির উদ্বোধন না হ'লে হবে না। চাই কঠোর সঙ্কল্প, কঠোর শ্রম এবং অপরের উপর যথাসম্ভব নির্ভর না করা। উৎপাদন বাড়িয়ে, রপ্তানি বাড়িয়ে আমরা যাতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন ক'রে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে কিনতে পারি, সেদিকে নজর দিতে হবে। অবশ্য, কৃষি ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিজেদের দেশে যত তৈরি করা যায় ততই ভাল। আণবিকশক্তি, জলশক্তি, বাষ্পশক্তি, তৈলশক্তি, বায়ুচালিত শক্তি ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং কৃষিশিল্পের কাজে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এখনও আমাদের কৃষি সেকেলে ধরণের, আধুনিক বিজ্ঞান-বর্জ্জিত ও প্রকৃতিনির্ভর। তাই, কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের বীজ, ভাল সার, যন্ত্রপাতি,

গো-মহিষাদি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, উপযুক্ত সেচ, কৃষিঋণ, কীটনাশক ওষুধ, শস্যাদি সংরক্ষণ, হিমঘর-স্থাপনে কৃষককে শিক্ষাদান, চাষযোগ্য অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার, উপযুক্ত মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় ইত্যাদির বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। জমিহীন কৃষক যা'তে জমির অধিকারী হ'তে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাতে কৃষিকাজে তার আগ্রহ বাড়বে, ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। যেখানে সম্ভব সেখানে বেসরকারীভাবে সমবায়-পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করতে হবে এবং কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের করণীয়

কৃষির উন্নতি তো করতেই হবে, সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়ন সংঘটন করতে হবে। যে-সব অর্থনৈতিক সংস্থা রাষ্ট্রের হাতে না থাকলেই নয়, সেগুলি তো রাষ্ট্রের হাতে থাকবেই, কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমবায়ী কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, শহর ও গ্রামের সুষম বিকাশ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের লক্ষ-লক্ষ পল্লীর সর্ব্বতোমুখী উন্নয়ন ও সংগঠন যদি না হয়, তাহ'লে ভারতের অর্থনীতি উন্নত হ'তে পারে না। গ্রামীণ অর্থনীতির যুগোপযোগী রূপান্তর সাধনের জন্যই প্রয়োজন পল্লীর পুনর্গঠন। উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায়, উৎপন্ন দ্রব্যের মান যাতে উন্নত হয়, বন্টনব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠু হয়, পণ্যমূল্য যাতে কমে, দ্রব্যমূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে, মুদ্রামূল্য যাতে হ্রাস না পায়, মুদ্রাস্ফীতি যাতে না হ'তে পারে, সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা যাতে বাড়ে, আমদানি যাতে কমে, রপ্তানি যাতে বৃদ্ধি পায়, মানুষের যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির অব্যবহার ও অপব্যবহার যাতে না হয়, ঘাটতি বাজেট যাতে না ঘটে, দেশে যাতে শান্তি, শৃঙ্খলা, আইনের শাসন ও নিরাপত্তা বজায় থাকে, সৎ ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ যাতে খোলা থাকে, সর্ব্বপ্রকার অনগ্রসরতা দূর ক'রে যথোপযুক্ত আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা যাতে হয়, খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্যের অভাব যাতে না ঘটে, যথেচ্ছ ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার, অটোমেশন ইত্যাদির ফলে বেকারের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায়, অকারণ ধর্ম্মঘট, কর্ম্মশৈথিল্য ও ঘেরাওয়ের ফলে যাতে উৎপাদন বিঘ্নিত না হয়, সঞ্চয় মূলধন-গঠন যাতে উৎসাহিত হয়, জাতীয় আয়

যাতে বৃদ্ধি পায়, সরকারের মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি বা সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত অসহযোগিতা বা জুলুম যাতে বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের বিহিত প্রসারে বাধা সৃষ্টি না করে, চোরাকারবার যাতে না চলতে পারে, ধনী যাতে আরো ধনী এবং দরিদ্র যাতে দরিদ্রতর হ'য়ে না পড়ে, ব্যক্তিগত ধনসম্পদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ যাতে নির্দ্ধারিত হয়, মুষ্টিমেয় লোক বা রাষ্ট্রের হাতে যাতে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হ'তে না পারে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যাতে বাড়ে, ধনবৈষম্য যাতে কমে, বেশির ভাগ লোকই যাতে পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে নিজস্ব জমিজমা, মূলধন, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যসম্মত বংশানুক্রমিক কর্ম্মের উপর দাঁড়াতে পারে, রাস্তাঘাট, নদীনালা ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি যাতে হয়, কেউ যাতে শোষণ বা অত্যাচার ক'রে বা দুর্দ্দশার সুযোগ গ্রহণ ক'রে অপরের অস্তিত্বকে সঙ্কটাপন্ন করতে না পারে, সম্ভবস্থলে বৃহৎশিল্পগুলিকে বিকেন্দ্রীকৃত ক'রে গৃহে-গৃহে গার্হস্থ্যশিল্পের প্রবর্ত্তন যাতে হয়, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর শ্রমকে যাতে মর্য্যাদার চোখে দেখা হয়, বৃত্তিশিক্ষার প্রসার যাতে হয়, আলস্য, বিলাসব্যসন, পরগাছার মত অবদানহীন জীবনধারণ, জীবনবিমুখতা ও পুরুষকারহীনতা যাতে সমাজে ঠাঁই না পায়, কালো টাকা বা কালো সোনা যাতে দেশের বা বিদেশের কোন ব্যাংকে লুকিয়ে রাখা না যায়, মুনাফা-শিকারীরা যাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী অন্যায়ভাবে মজুত করতে না পারে, উৎকর্ষী জ্ঞান, গবেষণা ও অনুশীলন যাতে উৎসাহিত হয়, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সৎ যা'-কিছু যাতে সংবর্দ্ধিত হয়, বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন নরনারীগণ যাতে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস না করেন, বিশেষ প্রতিভাদীপ্ত মানুষ যাতে তাঁর প্রতিভার বিকাশ-সাধনের সুযোগ পান, জনস্বাস্থ্য যাতে উন্নত হয় ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত থাকতে হবে।

এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যদি চলতে পারি, তাহ'লে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থায়ী বনিয়াদ রচিত হবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা কোন প্রতিকারহীন অনিবার্য্য ব্যাপার নয়। এগুলি মনুষ্যসৃষ্ট সামাজিক পাপ ও অভিশাপবিশেষ। এর নিরাকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজের যোগ্য ব্যক্তিদের আত্মতুষ্টির কোন কারণ থাকতে পারে না। যারা প'ড়ে গেছে তাদের টেনে উপরে না তোলা মানে অজ্ঞাতসারে তাদের টানে নীচে নেমে যেতে থাকা। এ-প্রসঙ্গেও বলা প্রয়োজন যে, সু-বিবাহ ও সুজনন যদি ব্যাহত

হয়, তাহ'লে যোগ্যতা, চারিত্র্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুদূরপরাহত। পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সঙ্গে-সঙ্গে অপরাপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধ্য ও মাত্রামত বিহিতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের করতে হবে। আমরা এক অখণ্ড বিশ্বে বাস করি, তাই সেখানে বিহিত পরোপকার সময়ে আত্মহিতের কারণ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে।

দেশের অর্থনীতি যেন প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সহায়ক হয়

প্রতিটি ব্যক্তির সর্ব্বতোমুখী আত্মবিকাশই হ'ল সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই, কোন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। সমাজবিধানে তাকে তার বিশিষ্ট দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করতে হবে, যথাস্থানে তাকে তার নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু সেটা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সবকিছু তার আত্মোপলব্ধির সহায়ক হ'য়ে ওঠে, এই চরম উদ্দেশ্যকে উল্লঙ্ঘন ক'রে কোন অর্থনৈতিক কাঠামো রচনা করার অধিকার আমাদের নেই। অর্থনৈতিক ব্যাপারে দুটি কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে খেয়ে-প'রে দেহধারণ করাই সব নয়, আবার খেয়ে-প'রে দেহধারণ করতে না পারলেও মানবজীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যসাধন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রদাসত্ব, সমাজদাসত্ব, সঙ্ঘদাসত্ব, গৃহদাসত্ব, যন্ত্রদাসত্ব বা অর্থদাসত্বের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হ'বার জন্য ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি হয়নি। তবে ঈশ্বরের সেবক হিসাবে সে সবারই স্বতঃস্বেচ্ছ সেবক। সর্ব্বক্ষেত্রে মুক্তপুরুষের স্বাধীনতাই তার উপজীব্য—যে-স্বাধীনতা নিজের ও অপরের ভাল ছাড়া মন্দ করতে জানে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখতে হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তি সমাজকল্যাণসঙ্গত স্বাধীনতা ভোগ করে অথচ সমাজকল্যাণ-বিরোধী যথেচ্ছ চলনে সে চলতে না পারে এবং ঐ চলন সুরুতেই নিরুদ্ধ হয়। এর জন্য রাষ্ট্রীয়-শাসনই যথেষ্ট নয়, সামাজিক শাসনেরও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সপরিবেশ নিজেকে পালনপোষণ করা যেমন আমাদের উপর ন্যস্ত ভগবৎপ্রদত্ত দায়িত্ব, সপরিবেশ নিজের শাসন-সংযমও তেমনি আমাদের বিধিদত্ত দায়বিশেষ। এই ভাগবত দায়িত্ব নিষ্ঠাসহকারে পালন না করলে পরমপিতার

কাছে, সমাজের কাছে ও নিজ আত্মার কাছে আমাদের অপরাধের মাত্রা দিন-দিন বেড়ে চলবে।

বিদ্রোহের সূত্রপাত

প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচার অধিকার আছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে যোগ্যতাসমন্বিত শ্রমের মাধ্যমে সমাজকে সাধ্যমত সেবা দিতে হবে। এই সেবার বিনিময়েই সে বাঁচতে পারে। যেখানে মানুষ যথাসাধ্য শ্রম ও সেবা-সত্ত্বেও মানুষের মত বাঁচার সুযোগ পায় না, বা ইচ্ছাসত্ত্বেও শ্রম নিয়োগের সুবিধা পায় না, ধ'রে নিতে হবে সে-সমাজব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর গলদ আছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ ও সমাজপতিগণ যদি সমাজব্যবস্থার মৌলিক গলদগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা না করেন, তাহ'লে বাঁচার তাগিদে জনগণ কিন্তু বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিপ্লব বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। যাতে এই প্রয়োজনের উদ্ভব না হয়, দেশের অর্থনীতিকে তেমনিভাবে বিন্যস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে একথা ঠিকই যে, অর্থভিত্তিক শ্রেণীবিভেদ নিষ্প্রয়োজন ও অকল্যাণকর হ'লেও বৈশিষ্ট্য ও সহজাত-সংস্কার-ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ও তাদের পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা সমাজের কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের পক্ষে অপরিহার্য্য।

ধনী ও দরিদ্রের বাঞ্ছিত আচরণ

এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, ধনী যদি আপন দায়িত্বে লোককল্যাণার্থে তার ধনের বিনিয়োগ ক'রে সাধারণের অবস্থাকে উন্নত করতে চেষ্টা করে এবং দরিদ্র যদি অসাধুতা ও ঈর্ষার কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে নিজের শ্রম, গুণ ও যোগ্যতা বাড়িয়ে সদ্ভাবে বড় হ'তে চেষ্টা করে, তাহ'লে বিরোধ ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে সমাজে সম্প্রীতি ও সামঞ্জস্য সহজে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে এবং দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পেতে পারে।

লোকস্বার্থী সেবার বিপ্লব

অর্থনৈতিক বিপ্লব যদি আনতে হয়, তাহ'লে এমনভাবে আনতে হবে যাতে মানুষ মানুষস্বার্থী হ'য়ে পারস্পরিক সেবা ও সম্পোষণার প্লাবন সৃষ্টি ক'রে তোলে সমাজে। কেউ যেন কাউকে দুঃস্থ হ'তে না দেয়, দরিদ্র হ'তে না দেয়,

অলস হ'তে না দেয়, অকৃতজ্ঞ হ'তে না দেয়, অযোগ্য হ'তে না দেয়, বেদরদী হ'তে না দেয়, সেবাবিমুখ হ'তে না দেয়, শোষণপ্রবণ হ'তে না দেয়, সমাজচেতনাহীন বা সমাজবিরোধী হ'তে না দেয়, আত্মকেন্দ্রিক হ'তে না দেয়, আত্মপ্রত্যয়হীন হ'তে না দেয়, বিপন্ন বা অসহায় হ'তে না দেয়, অন্তরে-বাহিরে ছোট হ'তে না দেয়, প্রত্যেকে যেন স্বতঃদায়িত্বে প্রত্যেকের ধারণ, পালন, পোষণে ও অসৎ-নিরোধে অতন্দ্র প্রহরীর মত নিত্য জাগ্রত ও সক্রিয় হ'য়ে থাকে। ঐ ঐশী অভিদীপনা কোন বিশেষ সমাজ বা বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, তাকে সঞ্চারিত করতে হবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র।

অর্থনীতির সার্থক পুনর্গঠন

অর্থনীতি সামগ্রিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে অনেককিছু। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে অখণ্ডতার পরিপ্রেক্ষিতে একে নিটোল ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে। সেদিক দিয়ে দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ধনবিজ্ঞান, শরীরবৃত্ত, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, জাতিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ফলিতবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, পরিকল্পনা-প্রণয়ন, সংগঠনবিদ্যা, বৈশিষ্ট্যসম্মত কৃতিমুখর সুকেন্দ্রিক শিক্ষা ইত্যাদির সুষ্ঠু প্রয়োগে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক কাজ-কারবার ও আদান-প্রদানকে সমুন্নত ও ভ্রান্তিমুক্ত ক'রে তুলতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি করতে হবে, সর্ব্বসাধারণের অর্থনৈতিক মানও তেমনি দ্রুত উন্নত ক'রে তুলতে হবে। আমরা সমাজবাদের পক্ষপাতী, কিন্তু তা' হওয়া চাই সাত্বত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ঋষি-বিধৃত। এমনতর সমাজবাদী অর্থনীতিই যুগপৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির আত্মিক ও বৈষয়িক কল্যাণসাধনে সমর্থ।

অভ্যাস, ব্যবহার, চরিত্র, ধর্ম্মপ্রবণতা ও অর্থনীতি

আমরা এখন অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব। যারা কথার খেলাপ করে, যারা অকৃতজ্ঞ, যাদের কথার দাম নেই, যারা সত্যনিষ্ঠ নয়, যারা সময়ের মূল্য বোঝে না, যারা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, যারা নিজেদের আচরণ দিয়ে নিজেদের অনির্ভরযোগ্য ব'লে প্রমাণ করে, যারা

ধার-বাকী করতে ব্যগ্র কিন্তু শোধ দিতে মন্থর, বিস্মৃতি যাদের স্বভাবগত, যাদের চিন্তা, চলন, কাজকর্ম্ম, আয়ব্যয় ও হিসাবপত্র এলোমেলো, অগোছাল ও ত্রুটিপূর্ণ, যাদের ব্যয় সার্থক, শুভপ্রসূ ও লাভবাহী নয়, যারা অমিতব্যয়ী, যারা অলস, যারা চালবাজ, যারা কর্ম্মবিহীন বড়-বড় চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্পের বিলাস নিয়ে দিন কাটায়, যারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, যারা অপরের জন্য এতটুকু স্বার্থত্যাগ করতে পারে না, যারা অপরের প্রাণে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পায়, যারা অপরের সঙ্গে সাত্বত সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে পারে না, যারা দাম্ভিক, যারা ক্রোধী, যারা পরশ্রীকাতর, সাধারণতঃ দেখা যায় বহু গুণপনা সত্ত্বেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আশানুরূপ কৃতিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই, বদভ্যাস প্রত্যাহার ও সদ্ভ্যাস গঠন অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—'স্বভাবদোষে অভাব ঘটে, সৎক্রিয়তায় বিভব বটে'; 'স্বভাবগুণে অভাব নষ্ট, এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট।' ছেলেবেলা থেকে শিশুদের সেবাবুদ্ধি ও দানপ্রবৃত্তি গজিয়ে দেওয়া ভাল। এই আকূতিই তাদের ধীরে-ধীরে অর্জ্জনপটু ক'রে তোলে। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ইষ্টভৃতি করার অভ্যাস এদিক দিয়ে অমোঘ ফলপ্রদ। অন্যত্র আমরা এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই, এখানে আর বিস্তারের মধ্যে যাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেন—'মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর।' বহু মানুষকে যদি আমরা আপন ক'রে তুলতে পারি, তখন তাদের সক্রিয় প্রীতি, সেবা ও সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে আমরা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাই। প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে সেবা করলে কিন্তু এই ফল লাভ হয় না। আমরা যদি তাদের ভিতর নিজেদের আচরণ দিয়ে ইষ্টপ্রাণতা, ইষ্টার্থী-পরার্থপরতা অর্থাৎ ধর্ম্ম সঞ্চারিত করতে পারি, তাহ'লেই কিন্তু তাদের যোগ্যতা ও নিঃস্বার্থ সেবাবুদ্ধির সম্যক স্ফুরণ হ'তে পারে এবং আর দশজনের সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও তাদের দ্বারা উপকৃত হ'তে পারি। প্রকৃত ধর্ম্মসঞ্চারণার পরিক্রমণায় মানুষ এক সুকেন্দ্রিক সমাজকল্যাণের হোতা হ'য়ে সংহত আত্মপ্রসারের পথে চলে। এমনি ক'রে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হয়,—ইষ্টীপূত আত্মীয়তাবোধ ও বৈশিষ্ট্যসম্মত সেবা-বিনিময় নিয়ে। এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আদান-প্রদানমুখর বলিষ্ঠ বিশাল সংহতিই কালে-কালে ডেকে আনে অর্থনৈতিক উজ্জীবনের দুকূলপ্লাবী জোয়ার।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনীতি

আজকাল ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রসঙ্গে জনসংখ্যা-স্ফীতি বা বিস্ফোরণের কথা প্রায়ই বলা হয় এবং তার প্রতিকারকল্পে পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণ-বর্জ্জিত নিছক কৃত্রিম পরিবার-পরিকল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ যুক্তিযুক্ত কিনা সে-কথা স্বতন্ত্র। তবে বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, জীবিকা, স্বাস্থ্য, পরিবহন ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য সহকারেই জনসংখ্যা বাড়া উচিত। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবিক সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পদ, যান্ত্রিক সম্পদ, বৈজ্ঞানিক সম্পদ ইত্যাদির সঙ্কীর্ণ-ব্যক্তি-স্বার্থমুক্ত, সমাজকল্যাণকর ব্যবহার যদি সম্যকভাবে করা হয়, তাহ'লে কিন্তু এই বিরাট লোকসংখ্যা নিয়েও ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি লাভ করতে পারে।

চাই সংশোধন ও সংগঠনমূলক প্রয়াস

আমাদের অসুবিধার জন্য আমরা সব সময় নিজেদের ছাড়া আর সকলকে ও আর যা'-কিছুকে দায়ী করি। এই অভ্যাসটি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। নিজের যে দোষ আছে তা' আত্মবিশ্লেষণ ক'রে বের করতে হবে এবং শোধরাতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে অপরকেও দোষমুক্ত করতে চেষ্টা করতে হবে। শুধু পারস্পরিক দোষারোপ ও তিক্ততা সৃষ্টি ক'রে লাভ হবে না। সরকার, জনসাধারণ, মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, ক্রেতা, উচ্চনীচ, ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেই যাতে তার করণীয় করে ও অপরপক্ষকে তার করণীয় করতে প্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত ক'রে তোলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, সমবেতভাবে করার ভিতর-দিয়েই সম্পদের সৃষ্টি হয়। বাগবিতণ্ডা দিয়ে কোন সম্পদের উৎপাদন হয় না। তাই, সপরিবেশ নিজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিজেকে দায়ী ক'রে বিহিত করণে বদ্ধপরিকর হ'তে হবে সত্তাপোষণী ও অসৎনিরোধী প্রয়াসে উদ্যত থেকে। এমনতর মনোভাব ও চলনসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা যত বেশি হবে এবং তারা যত সংঘবদ্ধভাবে প্রয়াস চালাবে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ততই উচ্ছল হ'য়ে উঠবে। সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য এমনতর গঠনাত্মক আশাবাদী পরিমণ্ডল রচনা একান্ত প্রয়োজন। ধ্বংসাত্মক, নৈরাশ্যবাদী আবহাওয়া ও মনোভাব,

পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস উৎসাহ, আনন্দ ও শুভপ্রচেষ্টাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারে না। অর্থনৈতিক কল্যাণকে আবাহন করতে গেলে আমাদের সযত্নলালিত অন্তরায়গুলিকে অপসারণ করতে হবে। চাই এমনতর প্রবল ভালবাসা ও ভাল করার অভিযান—যা' নীলকণ্ঠের মত অপরের বিদ্বেষের বিষ হজম ক'রে অব্যাহত-গতিতে এগিয়ে চলতে পারে।

যোগযুক্ত কর্ম্ম—অর্থ ও পরমার্থের পথ প্রশস্ত করে

জনসম্পদ যেমন ধনসম্পদের উৎপাদয়িতা, তেমনি তার ভোক্তা। অর্থনীতির শেষ লক্ষ্য মানবকল্যাণ, কিন্তু মানুষ যদি ভোগস্পৃহা ও বিষয়াসক্তিবশতঃ ধনসম্পদকে চরম, পরম ও মুখ্য ক'রে ধরে, তাহ'লে মানবকল্যাণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ হয় পদে-পদে। যে স্বস্তি, শান্তি, আনন্দ ও মঙ্গলের জন্য অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা তাই-ই প্রথম বলি হ'য়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, অর্থাসক্তির অভিভূতি অনেক সময় বোধ, বিবেচনা, সেবাপ্রাণতা, কর্ম্মপ্রবণতা ও কর্ম্মকুশলতাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তাই, ঐ অভিভূতি শেষ পর্য্যন্ত অর্থপ্রাপ্তির অন্তরায় ঘটায়। তাই, অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে সঙ্গতিশীল ও সার্থক করতে গেলে ইষ্টযোগযুক্ত অনাসক্ত সেবা ও কর্ম্মসাধনায় মাতোয়ারা হ'য়ে থাকতে হবে। একেই বলে কর্ম্মযোগ। আর, 'যোগঃ কর্ম্মসুকৌশলম্'। যোগযুক্ত কর্ম্ম একই সঙ্গে অর্থ ও পরমার্থের পথ প্রশস্ত করে। তাই, অর্থ সেখানে অনর্থের কারণ হয় না। অর্থসাধনা ও পরমার্থ-সাধনার মধ্যে সেখানে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। একমুখী প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে একযোগে দুই বস্তুই লাভ করা যায়। উভয়ে উভয়ের অনুপূরক হ'য়ে যুগল-মিলনে মিলিত হ'য়ে আমাদের বেষ্টন ক'রে ধরে। এই হ'ল ভাগবত অর্থনীতির সর্ব্বার্থসার্থক মহৎ স্বরূপ।

অর্থনীতির মহৎ স্বরূপকে যদি আমরা বিস্মৃত না হই, তাহ'লে বিজ্ঞানপ্রভাবিত যান্ত্রিক যুগের সব সুফল উপভোগ ক'রেও আমরা আত্মিক বিকাশকে অব্যাহত ও প্রগতিশীল রাখতে পারব। ভৌতিক শক্তি বা যন্ত্রযুগ আমাদের দানব বা যন্ত্রে পরিণত করতে পারবে না, আত্মিক মহিমায় সমাসীন হ'য়ে আমরা তার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে তার শুভদ বিন্যাস ও বিনিয়োগ ক'রে চলতে পারব। আর, তারই জন্য সতত স্মরণ রাখতে হবে কৌটিল্যের এই প্রজ্ঞাদীপ্ত মহাবাণী:—

"সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ,
ধর্ম্মস্য মূলম্ অর্থঃ,
অর্থস্য মূলং রাজ্যম্,
রাজ্যস্য মূলম্ ইন্দ্রিয়জয়ঃ,
ইন্দ্রিয়জয়স্য মূলং বিনয়ঃ,
বিনয়স্য মূলং বৃদ্ধোপসেবা,
বৃদ্ধোপসেবয়া বিজ্ঞানম্।"

সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান

সাহিত্য ও শিল্পকলার তাৎপর্য্য

"বিষয়, বস্তু বা ব্যাপারের রসব্যঞ্জনার ভিতর-দিয়ে ভাবের রূপ ভাষায় এঁকে তুলে আগ্রহমদির ক'রে অন্যতে সেই ভাবের প্রতিধ্বনন ক'রে তোলে সাহিত্য, সাহিত্যসত্তার তাৎপর্য্যই সেখানে; আর তা' যেমনতর হিতী-সুন্দর, তার কদরও তেমনি; শিল্পকলার তাৎপর্য্যও ওতেই।" মানুষ চেতনাশীল জীব। কিন্তু তার সেই চেতনা উৎচেতিত হয় বহির্জগতের সংস্পর্শে। তার অন্তর্জগৎ যত উন্নত হয়, বহির্জগতের সাড়া তার মনে তত উন্নতভাবে সৃষ্টি করে। আবার, ঐ ভাব যার যত আবেগসমন্বিত, তীব্র ও প্রগাঢ় হয়, তা' আত্মপ্রকাশের জন্য তত ব্যাকুল ও অধীর হ'য়ে ওঠে। আর ঐ ভাবের সুসংবদ্ধ, সুন্দর রসান্বিত অভিব্যক্তিই সাহিত্য বা শিল্পকলা নামে অভিহিত হয়। তা' যখন ভাষা ও ছন্দকে আশ্রয় ক'রে চলে, তাকে বলে সাহিত্য; সুর, তাল, মান-লয়ের অবলম্বনে তা' হ'য়ে ওঠে সঙ্গীত; রং-তুলিকে মাধ্যম ক'রে তা' হয় অঙ্কন, এইভাবে মাধ্যমের রকমফেরে গজিয়ে ওঠে নৃত্য, রকমারি বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্য, অভিনয়, বাগ্মিতা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, নিত্যনবীন চারুকলাদি। সবগুলির মূল উৎস ও চরম লক্ষ্য এক। যে-অনুভূতি আমাদের প্রাণমনে দোলা লাগায়, সেই অনুভূতির প্রাণন-স্পন্দনকে হৃদয়গ্রাহীভাবে মূর্ত্ত ক'রে অপরের মধ্যে তা' সঞ্চারিত করার প্রয়াস থেকে জন্ম নেয় সাহিত্য ও শিল্পকলা।

সাহিত্য ও শিল্পকলা সৎ-চিৎ-আনন্দের অভিব্যক্তি

মানুষের ভিতর আছে সৃষ্টির আগ্রহ, প্রকাশের ব্যাকুলতা। সুন্দরের প্রতি আছে তার নাড়ীর টান। সুন্দরকে সে প্রমূর্ত্ত ক'রে তুলতে চায় তার আপন সৃষ্টির মাঝে। এই কাজে সে পায় আনন্দ, আর এই আনন্দজ সার্থক সৃষ্টিও অপরের বোধশক্তির অসাড়তা ঘুচিয়ে তার প্রাণে জাগায় আনন্দ। প্রতিটি মানুষ তার মত ক'রে সৎ-চিৎ-আনন্দ-বিগ্রহস্বরূপ। তারই কারবারী সে। তারই জন্য ক্ষুধিত সে।

প্রকৃত সাহিত্য ও শিল্পকলা যোগায় এই সৎ-চিৎ-আনন্দের পোষণ। তাই, তা' মানুষের এত প্রিয়, তাই তা' মানুষের এত প্রাণের জিনিস।

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব অহেতুক

সাহিত্য ও শিল্পকলা সত্য, শিব, সুন্দরের পরিপ্রকাশ। অনেকে এই প্রসঙ্গে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্বের কথা তোলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই দ্বন্দ্ব অমূলক ও নিরর্থক। কারণ, বাস্তবকে বাদ দিয়ে শিল্পী বা স্রষ্টার মনন, ধ্যান ও কল্পনাশক্তি ক্রিয়া করতে পারে না। আবার, স্রষ্টার মানস-অবদান-বিহীন বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবিও শিল্প ব'লে গণ্য হবার যোগ্য নয়। শিল্পী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসলোকের নির্দ্দেশ ও অনুপ্রেরণা-অনুযায়ী বাস্তবের উপাদানগুলির ভিতর থেকে গ্রহণ-বর্জ্জন ক'রে তাঁর মনোগত ভাব ও বক্তব্যকে ব্যক্ত ও বিন্যস্ত করেন। তাঁর রুচি, তাঁর ঝোঁক, তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-কল্পনা, নিয়ামক প্রবৃত্তি ইত্যাদি তার ভিতর প্রতিফলিত না হ'য়ে পারে না। এইখানেই তিনি আদর্শবাদী। তবে যিনি যেমন, তাঁর আদর্শও তেমন। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ' যে যাতে শ্রদ্ধাবান, সে তাই-ই। আবার, মহৎ আদর্শও কাল্পনিক বা অবাস্তব কিছু নয়। তারও মূর্ত্ত জীয়ন্ত রূপ আছে। বিশেষ মানুষের মধ্যে তার বাস্তব অভিব্যক্তি দেখা যায়। আবার, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে অন্যের পক্ষেও তা' ধীরে-ধীরে বাস্তবে অধিগত করা সম্ভব হয়। সেই দিক দিয়ে আদর্শ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব অহেতুক।

শিল্পের দাবী ও জীবনের দাবী পরস্পর বিরোধী নয়

অনেকে বাস্তববাদের দোহাই দিয়ে সমাজের কদর্য্যতা ও নোংরামিগুলিকে নগ্নভাবে চিত্রিত ক'রে থাকেন। সাহিত্য বা শিল্পে ও-সবের কোন স্থান নেই, এমন কথা আমরা বলি না। ভাল-মন্দ, আলো-কালো সব-কিছুরই নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে জীবনে। সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে কোন-কিছুকে যদি যথাযোগ্যভাবে পরিবেষণ করা যায়, তাতে দোষ হয় না। প্রবৃত্তির উদ্দামতা ও অসুস্থতা দুইয়েরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এইটুকুই বাস্তবতার সবখানি নয়। জীবন যেখানে আছে সেখানেই আছে জীবন-ধর্ম্ম অর্থাৎ বাঁচার আকূতি। এটাও রূঢ় বাস্তব। বাস্তবতার এই পরমসত্যকে উপেক্ষা ক'রে বা উহ্য রেখে বিকৃতিকে যদি একান্ত

ও লোভনীয় ক'রে চিত্রিত করা হয়, তাতে শিল্প ও জীবন দুই-ই পীড়িত হয়। শিল্পীর যদি বিকৃতির উপর নেশা থাকে এবং সেই নেশাকে চারিয়ে দেখার জন্য যদি তিনি তাঁর প্রতিভা প্রয়োগ করেন, তবে তাঁকে বলতে হবে সমাজদ্রোহী, শিল্পদ্রোহী। বিকৃতিবিলাসী না হ'য়ে—শিল্পী যদি প্রকৃত দ্রষ্টা ও স্রষ্টার মত বিকৃতির স্বরূপ নিরাসক্তভাবে অঙ্কিত করেন, এবং সুস্থতা লাভের অব্যক্ত আকৃতি কেমন অমোঘভাবে নিরন্তর ক্রিয়া ক'রে মানুষকে মঙ্গলের দিকে টানে সঙ্গে-সঙ্গে তাও দেখান, তাতে মানুষের রসপিপাসা ও সাত্বতক্ষুধা দুই-ই পরিতৃপ্ত হয়। শিল্পের দাবী ও জীবনের দাবী পরস্পর-বিরোধী নয়। উভয়ের মধ্যে আছে এক গভীর মিল। শিল্প যদি জীবনরহস্যকে উদ্‌ঘাটিত না করে, জীবনসত্যকে প্রকাশ না করে, জীবনের পরিচর্য্যা না করে, সুস্থ বাতাবরণ গ'ড়ে তুলতে সাহায্য না করে, অমঙ্গলকে মহামঙ্গলে পর্য্যবসিত করবার ইঙ্গিত ও সঙ্কেত বহন না করে, তাহ'লে শিল্প সেখানে ব্যর্থ। মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তি সত্তারই সেবক। তা' মূলতঃ খারাপ কিছু নয়। রাগদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে তাকে স্বাভাবিক সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। শিল্পীকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে প্রবৃত্তির অবদমন ও দাসত্ব দুই-ই সঙ্কটের স্রষ্টা, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার ধর্ম্মদ কর্ম্ম। শিল্প জীবনেরই সংস্কারমুক্ত উদার ব্যাখ্যা। জীবনের সমৃদ্ধির জন্যই শিল্প। জীবনবোধ ও জীবন-উপভোগকে গভীরতর ও প্রশস্ততর করে ব'লেই শিল্পের কদর। বলা বাহুল্য যে, সাহিত্যও শিল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। শিল্পের স্রষ্টা যেমন মানুষ, শিল্পের উদ্দিষ্টও তেমনি মানুষ। বলিষ্ঠ জীবনপ্রীতি ও জগৎপ্রীতি বাদ দিয়ে কোন মহৎ শিল্প গ'ড়ে উঠতে পারে না। সমাজচেতনা ও মানবমঙ্গলকে উল্লঙ্ঘন ক'রে শিল্প যেখানে মানুষকে মরণপন্থী ক'রে তোলার প্ররোচনা যোগায়, সেখানে সে নিজেই নিজের সমাধি রচনা করে। কারণ, মানুষ যদি নিকেশ হ'য়ে যায়, তবে শিল্পের গতি হবে কী? শিল্পই কি টিকে থাকবে তাতে? কারণ, যুগ-যুগ সঞ্চিত শিল্পের অবদান ধ'রে রাখবে কে? নূতন শিল্প সৃষ্টি করবে কে? শিল্পের অবদান উপভোগ করবে কে?

সাহিত্য প্রচারধর্ম্মী নয়, প্রেরণাধর্ম্মী

তাই ব'লে আমরা এটা চাই না যে, শিল্পকে নীতিশিক্ষা, স্তাবকতা, বিদ্বেষ বা কোন মতবাদ প্রচারের বাহনে পরিণত করা হোক। অমনতর উদ্দেশ্য-সচেতনতা

শিল্পকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে উঠতে দেয় না। তার মধ্যে আসে কৃত্রিমতা, প্রাণহীনতা, বুদ্ধি-করা জোড়াতালি। যে অভিন্ন প্রাণময়তা কোন শিল্প-কৃতির বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে তাকে একটি অখণ্ড রসমূর্ত্তি দান করে, কষ্টকল্পিত শিল্পের মধ্যে তা' কখনও পাওয়া যায় না। তাই, তা' মানুষকে মজাতে পারে কমই। উদ্দেশ্য প্রসূত শিল্প—শিল্প হিসাবেও যেমন অসার্থক, তেমনি উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাপারেও তা' নিতান্ত ব্যর্থ। তাই ঐ জিনিসটি শিল্পের রাজ্যে অপাঙ্‌ক্তেয়। তবে শিল্পের কি কোন বাণী থাকবে না? তা' কি কোন প্রচ্ছন্ন সত্যকে অনুভবযোগ্য ক'রে তুলবে না? হ্যাঁ, তা' তো থাকবেই, তা' তো করবেই। কিন্তু তা' কেমনভাবে? শিল্পী যদি কোন সত্যকে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি ক'রে তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্বতঃই তা' প্রকাশ পাবে। এমনি ক'রে সাহিত্যিকের রচনা তাঁর সত্তাগত বোধ ও ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত না হ'য়ে পারে না। লেখার মধ্যে লেখকের মর্ম্মগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের যে স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটে, তাকে কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক লেখা বলা চলে না। অন্তর্নিহিত প্রেরণার তাগিদে অহেতুক আনন্দে স্রষ্টা যখন আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতাকে রূপদান করেন, সেই অন্তরমথিত সৃষ্টির সাধারণতঃ এক অনিবার্য্য আবেদন থাকে মানুষের কাছে। স্বভাবতঃই তা' হয় প্রাণদ, সুখদ, মঙ্গলপ্রদ, উপাদেয়, মনোমদ ও রমণীয়। কারণ, পরমস্রষ্টা যেন তখনকার মত তাঁর অন্তরকে অধিকার ক'রে তাঁকে দিয়ে অমৃতের রসদ পরিবেষণ করেন জগতে। শিল্পীর অহংচেতনা সেখানে নীরব ও নিষ্ক্রিয়। তিনি যেন সেখানে যন্ত্রমাত্র, নিমিত্তস্বরূপ। সমস্ত উচ্চস্তরের শিল্পী তাই এক লোকাতীত প্রেরণার ধারক, বাহক ও রূপকার। তাঁরও গভীর অনুশীলনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা' প্রধানতঃ আত্মপ্রস্তুতির জন্য, আধারশুদ্ধির জন্য, জড়তা মোচনের জন্য, ঊর্দ্ধলোকের প্রেরণার উৎসমুখ অবারিত করবার জন্য।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক

সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রকৃতি, মানুষ, পরিবেশ, বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের সঙ্গে যাদের পক্ষপাতশূন্য, অরঙ্গিল, অবিকার, অবিকল পরিচয় নেই অর্থাৎ যাদের জ্ঞান ও বোধ বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথ নয়, তাদের অন্যগুণ যতই থাকুক না কেন, তাদের রচনা কিন্তু খুব বেশি কার্য্যকরী হয় না। কারণ,

বস্তুজ্ঞান যাদের অশুদ্ধ, বোধও তাদের অপরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশনও তাদের এলোমেলো। মানুষ বিজ্ঞানমনা হ'লে তবেই বিকাররহিত বস্তুজ্ঞান বা বস্তু-নিষ্ঠার উপর তার ঝোঁক যায়। এই অন্তরঙ্গ, নিবিড়, নিখুঁত, বিশদ বস্তু-পরিচিতি না থাকলে, কেউ ঐ বস্তুর মর্ম্মলোকে প্রবেশ ক'রে তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে না। আর, যার সঙ্গে প্রগাঢ় ভালবাসার সম্পর্ক না গজায়, তার অন্তরের গোপন রহস্যটি আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয় না। কোন কিছুর প্রতি যখন আমাদের হীনস্বার্থরহিত অন্তরাস (interest) সৃষ্টি হয়, তখন আমরা তা' মনোযোগের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করি, দেখি, শুনি, জানি, বিশ্লেষণ সহকারে বুঝি। হ'তে পারে এটা বহিরঙ্গ পরিচয়। কিন্তু এই বহিরঙ্গ পরিচয় বাদ দিয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয় সাধন অসম্ভব। সম্যক বহিরঙ্গ পরিচয় লাভ করতে গেলে চাই বস্তুসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান। ঐ জ্ঞান যত পাকা হয়, বস্তুর অন্তরস্থিত ভাবস্পন্দনকে আমরা তত ভালভাবে ধরতে পারি। বিজ্ঞানলোকের দেউড়িতে পাড়া না দিয়ে, তাকে সযত্নে পরিহার ক'রে আমরা যদি রসের ও ভাবের আনন্দলোকে সরাসরি প্রবেশ করি এবং একটা বাস্তবজ্ঞানবর্জ্জিত অস্থির অবোধ ভাবোন্মাদনা নিয়ে রস-পরিবেষণে মত্ত হই, তাহ'লে পায়ের তলায় শক্ত ও প্রশস্ত ভূমি না থাকায় ঐ সাময়িক উদ্দামতা অচিরেই নির্ব্বাপিত হবে। এবং ঐ জাতীয় সৃষ্টি ফাঁকা, ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে উঠবে। অবশ্য, বিজ্ঞানচেতনা থাকলেই যে তা' থেকে সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা গজাবে, এমন কোন কথা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানবোধ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের প্রতিভার বিকাশে যে প্রভূত সহায়তা করে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কবি যদি বিজ্ঞানবেত্তা হন, তবে তাতে তাঁর কাব্যপ্রতিভা পুষ্ট ছাড়া ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি বিজ্ঞানকে কাব্যসম্মত রূপ দিতে পারেন এবং কাব্যবস্তুকে বিজ্ঞানের আলোকে উপস্থাপিত করতে পারেন। তাতে সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান সমাজ সকলেই উপকৃত হয়।

সাহিত্য ও ভাষা

সাহিত্যিকের ভাবের বাহন হ'ল ভাষা। তাই, ভাষাজ্ঞান যদি নিখুঁত ও প্রগাঢ় না হয়, তাহ'লে সাহিত্য কখনও সমৃদ্ধ হ'তে পারে না। ভাষাজ্ঞানের একটা প্রধান জিনিস হচ্ছে শব্দার্থ বা শব্দের দ্যোতনা সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ। এ ব্যাপারে শব্দের ধাতুগত তাৎপর্য্য ও রকমারি সুসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়োগ এই দুই বিষয়েই বোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার যথাযথতা, শক্তি ও সৌন্দর্য্য বাড়ে।

সাহিত্যিকের আত্মপ্রস্তুতি ও অনন্যসাধারণ অবদান

সাহিত্যিকের থাকা চাই বিপুল বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্বচ্ছ বোধ এবং সহানুভূতি। পুঁথিপড়া জ্ঞান কখনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামিল হ'তে পারে না। পাণ্ডিত্য-প্রসূত সাহিত্যিকের মধ্যে থাকে না সেই জীয়নকাঠির স্পর্শ, যা' মরাপ্রাণে জীবনের জোয়ার জাগিয়ে তুলতে পারে। তাই, সাহিত্যিক যদি কর্ম্মমুখর, দায়িত্বশীল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে শুধু ভাবজগতে বিচরণ করেন তাতে কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের পাথেয় বাড়তে পারে না। ফলে সাহিত্যও দিন-দিন নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম হ'য়ে পড়ে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবল আবেগ ও অনুভূতির বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, আবেগ ও অনুভূতি তাজা, তরতরে, প্রাণস্পন্দনময় মৌলিক প্রকাশভঙ্গীকে আবাহন করে। কিন্তু যুক্তিহীন আবেগ অন্ধ। তা' বিচারবুদ্ধি ও বোধবিভাকে খিন্ন ক'রে তোলে। তাই, আবেগের সঙ্গে-সঙ্গে চাই অভিভূতি-মুক্ত যুক্তি, যা' কিনা সাহিত্যিককে স্বচ্ছ, সাত্বত বোধে উপনীত ক'রে দিতে পারে। আর, তীব্র সহানুভূঁতি ও সমবেদনা সাহিত্যিকের চেতনাকে যে কতখানি প্রসারিত ক'রে তুলতে পারে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। এই জিনিসটি ধীরে-ধীরে তাঁকে বিশ্বাত্মবোধে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে। মানব-সংসার এবং প্রকৃতিরাজ্যের সকলেরই আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ তখন তাঁর চিত্তকে সমস্পন্দনে আন্দোলিত ক'রে তোলে। মানবের অতলস্পর্শ হৃদয়রহস্য এবং প্রকৃতির অব্যক্ত মৌনবাণী তখন তাঁর কাছে মুখর হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে। আর, সেই গহিনলোকের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে তিনি বর্ণে, গন্ধে, গানে, ছন্দে, রসে, রূপে সজ্জিত ক'রে আমাদের গোচরে এনে দেন। এমনি ক'রে অব্যক্ত যা' তার লীলায়িত অপরূপ নানা রূপ অঙ্কিত ক'রে সুরলোকের আলো ও আনন্দের ধারা ধরায় বইয়ে দিয়ে তিনি আমাদের জীবনকে অমৃত-মণ্ডিত ক'রে তোলেন। তারই সুধা-সরস স্পর্শে আমরা নূতন ক'রে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠি।

সাহিত্য জীবনে আনে নিত্যনবীনতার স্বাদ

সাহিত্যিক যে শুধু এক নূতন সূক্ষ্ম অপরিচিত জগৎ আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসঘন মূর্ত্তিতে তুলে ধরেন তাই-ই নয়, তিনি আমাদের অতি-পরিচিত নিত্যদিনকার গ্লানিময় তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, বদ্ধ, বিবর্ণ, নিরানন্দ, ব্যবহারজীর্ণ,

স্থূল জগৎ ও জীবনকে এক অপূর্ব্ব মহিমার আলোকে মণ্ডিত ক'রে দেখান। তাতে নীরস জীবন সরস হ'য়ে ওঠে। পরিচিত, পুরাতন, একঘেয়ে জীবন ও জগৎকে আমরা এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে ও উপভোগ করতে শিখি। সবই যেন অপরূপতা লাভ করে। এ যেন এক নব আবিষ্কার ও নব উপলব্ধির আনন্দ। সাহিত্যিক এমনি ক'রে মানুষকে আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে দেন। অন্তর্জীবন, বহির্জীবন ও সমগ্র জগতের বিচিত্র চিত্রদর্শনের নেশা মানুষের হাড়ে-নাড়ে জড়ান। সাহিত্যিকের মনে ও চোখে এমন একটি ভাবভাস্বর রংমশাল জ্বলে, যার ফলে অনেক-কিছু যা' আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তা' তাঁর মনের চোখে ও সাদা চোখে বিশেষ তাৎপর্য্য, সৌন্দর্য্য ও আবেদন নিয়ে ধরা পড়ে। সাহিত্যিক এই বৈচিত্র্য-সমন্বিত জীবনেরই চিত্রকর। তাই, জীবনের নব-নব অফুরন্ত রূপ দেখার সাধ মেটে মানুষের সাহিত্যপাঠে। তাছাড়া, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বহু অস্ফুট বোবা বোধ ও চিন্তা প্রস্ফুট হ'বার ব্যাকুলতায় ছটফট ক'রে বেড়ায়। অনেক সময় উপযুক্ত পারিবেশিক পোষণার অভাবে সেগুলি হারিয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যিকের ভাস্বরচেতনা ও প্রাঞ্জল প্রকাশশক্তির গুণে সাধারণের বহু হারিয়ে যাওয়া বোধ ও চিন্তা তাঁর রচনায় বাণীচিত্র লাভ করে। তার সংস্পর্শে মানুষ তাই তার মননশীল আত্মিক জীবনের লুপ্ত, সুপ্ত, ছিন্নসূত্র খুঁজে পায়। এ দিক দিয়ে মানব-বিবর্ত্তনে কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পের অবদানের তুলনা মেলে না। তার সান্নিধ্যে ভাল লাগার ভিতর দিয়ে অজ্ঞাতসারে মানুষ উৎকর্ষাভিমুখী হয়।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন

সমসাময়িক জীবন ও সমাজের দ্বন্দ্ব, সমস্যা, জ্বালা, যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ের প্রতি উদাসীন থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে সাহিত্যিক যদি কল্পলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা' কিন্তু তাঁর পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কারণ, জীবনবিমুখতা ও সমাজবিমুখতা সুস্থ ও বলিষ্ঠ মানসিকতার লক্ষণ নয়। বিশ্ববিচ্ছিন্ন কলাবিলাস ব্যসনাসক্তি হ'তে পারে কিন্তু শিল্পসাধনা নয়। সাহিত্যিককে আজকের সমাজের ও চলতি দুনিয়ার প্রকৃত ছবি যেমন তুলে ধরতে হবে, তেমনি দিতে হবে তার রূপান্তরের ইঙ্গিত। তবে এ-কথাও ঠিক যে, সমসাময়িক জীবন ও সমাজকে বুঝতে গেলে ইতিহাস-চেতনায় প্রবুদ্ধ হ'তে হবে। জাতির যুগ-যুগ সঞ্চিত ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানকে যদি না দেখা যায়,

তবে তাকে বোঝাও যায় না এবং প্রকৃত কল্যাণের পথে তার মোড় ফেরানও সম্ভব হয় না। গভীর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত হ'তে গেলে অতীত জাতীয়-জীবনের রত্নসমুদ্রে অবগাহন করতে হবে। তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপন করতে হবে। ওই-ই হ'লো প্রেরণার উৎস। তাতে স্থিতিলাভ ক'রে আত্মস্থ হ'য়ে কল্যাণকর যা' কিছু যেখানে পাওয়া যাক তা' গ্রহণ ক'রে তাকে আত্মীকৃত ক'রে তুলতে হবে। এই হ'ল সমস্যা সমাধানের পথ। তাই, সাহিত্যিক যদি কল্যাণব্রতী হন, তবে এইভাবেই তাঁকে নিজেকে গ'ড়ে তুলতে হবে। নইলে যুগের হাওয়ায়, চলতি হুজুগের তালে তিনি যে কোন্‌দিকে ভেসে যাবেন তার ঠিক নাই। দেশের মৃত্তিকা-প্রসূত প্রাণময় ভাবজীবনের প্রতি যদি তাঁর শ্রদ্ধা না থাকে, শ্রদ্ধাহীনতা ও নেতিবাচক ভাবের দরুন তিনি যদি ভাঙ্গনের স্বপ্নে বিভোর হন, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পক্ষে উপযোগী ইতিবাচক কোন বিশ্বাস বা পরিকল্পনা যদি তাঁকে অনুপ্রাণিত না করে তাহ'লে কিন্তু তাঁর রচনা জাতির মানসলোকে একটা শূন্যতাবোধেরই সৃষ্টি ক'রে তোলে। বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণের কথা শুনলে অনেকে তাকে অনুদারতার লক্ষণ ব'লে মনে করেন।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বজনীনতা

কিন্তু বৈশিষ্ট্যপালী মনোভাব সঙ্কীর্ণতা নয় এবং তা' বিশ্বজনীনতার পরিপন্থীও নয়। হীনম্মন্যতাবশতঃ সাহিত্যিক যদি জাতীয় গুচ্ছগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ ক'রে বিশ্বজনীনতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, তা' কিন্তু হবে অবাস্তব। চাই বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সমন্বিত ঐক্য এবং ঐক্য-বিধৃত বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। তবে বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণের নামে কোন সাহিত্যিক যদি জীবন-বিরোধী কুসংস্কারগুলিকে জীইয়ে রাখতে চান, তা' কিন্তু কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

সাহিত্য জোগাবে জয়, যশ ও জীবনের প্রেরণা

প্রকৃত সাহিত্য মানুষকে যোগায় আশা, ভরসা, অনুপ্রেরণা। শক্তি ও আনন্দ-সঞ্চারই তার ব্রত। সাহিত্যে ধ্বনিত হওয়া চাই বাঁচার সাধ, সাধনা ও সংগ্রামের অনুরণন। মানুষের জীবনে আছে ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা, বিয়োগ ও পরাজয়। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয়, তবে সাহিত্যের মধ্যে ওগুলির স্থান অবশ্যই থাকবে। তবে সর্ব্বোপরি সাহিত্য যদি সব বাধাকে বাধ্য ক'রে জীবনে জয়যুক্ত

হবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি ও প্রত্যয় সঞ্চারিত না করে, তা' যদি বিধ্বস্ত মানুষকে আরো হতাশ ও অবসন্নই ক'রে তোলে, তা' যদি সাত্বত সংগ্রামের শক্তি না জোগায়, তবে তা' সংগ্রামী, জীবনভিক্ষু মানবজাতির পক্ষে কতখানি উপযোগী হ'তে পারে, তা' বিচার্য্য। তাই, যে-বিয়োগান্ত সাহিত্য অনিবার্য্যভাবে হতাশা, অবসাদ ও মৃত্যুলিপ্সা উদ্রিক্ত করে, তা' নিরুৎসাহিত হওয়াই উচিত। সাহিত্য যোগাক সেই অনির্ব্বাণ উদ্দীপনা ও প্রেরণা যাতে মানুষ না মরে, না মারে, বরং মৃত্যুকে অবলুপ্ত ক'রে অমৃতকে নিরঙ্কুশ ক'রে তোলে। সেই সাহিত্যকেই বলতে হয় সৃজনশীল সাহিত্য, যার প্রভাবে প্রত্যেকের প্রাণের প্রদীপ প্রজ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে, মানব-জীবন ও মানব-সমাজ নবীনভাবে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে। পরিবেশের প্রভাব সাহিত্যের উপর পড়বে, সাহিত্য পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সাহিত্যই সেরা সাহিত্য, যা' পরিবেশের গ্লানি মোচন ক'রে তার চেহারা পালটে দিতে পারে বাঞ্ছিত রকমে। তমসার শক্তিকে পরাভূত ক'রে, আলোকের অভিযানকে জয়যুক্ত ক'রে তোলার মধ্যেই আছে সাহিত্যের সার্থকতা।

সাহিত্যানুরাগ প্রীতিশক্তিকে উদ্বোধিত ক'রে তোলে

প্রতিটি ব্যষ্টিচেতনা, সচেতন-অচেতনভাবে চায় বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হ'তে। সে নিজেকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিতে চায় সবার মধ্যে এবং সবাইকে অনুভব করতে চায় নিজের মধ্যে। মনোজগৎ, বহির্জগৎ, ও নিসর্গের অনন্ত বৈচিত্র্যকে সে আত্মীয়-আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কারণ, প্রতিটি যা'-কিছুর মধ্যে সে নিজেকে নূতন ক'রে পায়। কেউ যে কাউকে বাদ দিয়ে নয়। সবাই যে সবার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই, অন্তরে-অন্তরে প্রত্যেকের বিরহে প্রত্যেকে কাতর। প্রত্যেকের সত্তা চায় প্রত্যেকের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করতে। স্থূল-জগতে এই আকুলতার সম্পূরণের পথে বাধার অন্ত নেই। সমাজের ক্রূরতা ও নানা কৃত্রিম বাধার ফলে শেষ পর্য্যন্ত মানুষের ভালবাসা যায় শুকিয়ে। কিন্তু সাহিত্য ও কাব্যের জগতে মানুষ যেন সমগ্র জগতের সকলকে আপন ক'রে পায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই উদার মৈত্রীবন্ধনের স্বাদ পেতে-পেতে তার অন্তরের রুদ্ধ ভালবাসা বাধানির্ম্মুক্ত হ'য়ে সম্বেগশালী হ'য়ে ওঠে। এমনি ক'রে সাহিত্যানুরাগ প্রীতিশক্তিকে উদ্বোধিত ক'রে সর্ব্বপ্রকার মানবিক সম্পর্কে মধুরতর ক'রে তোলে।

সাহিত্যের প্রভাব

সাহিত্য নানা রসের পরিবেশন ক'রে মানুষের মনকে সুসমৃদ্ধ, আনন্দমুখর ও সাম্যদীপ্ত ক'রে তোলে। সাহিত্য মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গাওয়ায়, মাতায়, রসায়, ভাবায়, স্নিগ্ধ করে, শান্ত করে, মুগ্ধ করে, চালিত করে, কর্ম্ম-মুখর করে, সমাহিত করে, আমূল বদলে দেয়। সাহিত্যের কান্তাসম্মত উপদেশ মানুষের মর্ম্মমূলে গেঁথে যায়। সমস্ত যুগান্তকারী আন্দোলন ও বিপ্লবগুলির পিছনে আছে বীর্য্যদীপ্ত সাহিত্যের অমোঘ মন্ত্রশক্তি। জাতির জীবনে তার মহাকাব্যগুলির অবদানের তুলনা হয় না। সাহিত্যের নীরব প্রভাবের কথা যতই চিন্তা করা যায়, ততই বিস্মিত হ'তে হয়। সেইজন্য সুসাহিত্যের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁরা আমাদের নমস্য। তাঁরা সমাজের যে-সেবা করেন, তার মূল্যায়ন দুষ্কর। মহৎ সাহিত্যের পঠন, পাঠন ও অনুশীলন তাই সর্ব্ববিধ শিক্ষার একটা আবশ্যক অঙ্গ হওয়া উচিত। এতে মানবীয় বৃত্তির সুসঙ্গত স্ফূরণের বিশেষ সহায়তা হয়।

সাহিত্য মিথ্যার মুখোশ খুলে দেয়

সাহিত্যের একটা মস্ত কাজ হচ্ছে সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, ন্যাকামি, ভণ্ডামি, কপটতা, চালিয়াতি, চালাকি, ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা, লোকঠকান দার্শনিকতা, পরোক্ষ শোষণ ও দুর্নীতি, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অপব্যাখ্যা ইত্যাদির মুখোশ খুলে দিয়ে মানুষকে বঞ্চনা ও বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচান। সমাজের যে-সব প্রচ্ছন্ন শত্রুকে চেনা যায় না, লেখক তাঁর লেখনী-সাহায্যে যদি তাদের স্বরূপ্ উদঘাটিত ক'রে মানুষকে সাবধান ক'রে দেন, তাতে কিন্তু সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হ'তে পারে। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ ও সমালোচনা সাহিত্যেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ-বিশেষ। মানুষের চেতনা ও বিবেক যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে, তখন তাতে সাড়া জাগাতে গেলে চাই বিদ্যুৎশলাকার আঘাত হানা। কিন্তু তার মধ্যেও থাকা চাই মাত্রাজ্ঞান ও সুবিচারের সুরুচি। 'পাপকে ঘৃণা ক'রো, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা ক'রো না'— এই নীতি যদি তিনি মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে সেই হয় কলাকুশলতার চরম।

সাহিত্য যোগাবে প্রেরণা, জ্ঞান ও বিভিন্ন রসের খোরাক

আমরা প্রেরণাশ্রয়ী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছি, কিন্তু জ্ঞানাশ্রয়ী সাহিত্যের প্রয়োজন যে কিছু কম, তা' কিন্তু নয়। চিন্তাশক্তি, বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যমূলক জ্ঞান, বিচিত্র ভাবসম্পদ, ইত্যাদি যত বৃদ্ধি পায় ততই জীবনের নব-নব দিগন্ত দৃষ্টি-সমক্ষে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। সেদিক দিয়ে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধসাহিত্য যদি আশানুরূপ বৃদ্ধি না পায়, তাহ'লে কিন্তু জাতির মননশক্তি ধীরে-ধীরে পোষণের অভাবে ক্ষীণ হ'য়ে যেতে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে চাই হাস্যরসাত্মক নির্দোষ লঘু সাহিত্যের সৃষ্টি। এককথায়, বিভিন্ন রসাত্মক সাহিত্যের সাম্যসঙ্গত বিকাশই কাম্য।

জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ

সাহিত্যের কৃত্য হ'ল জীবনসত্যের রূপায়ণ, জীবনরসের উৎসারণ। মানুষের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ যে কত বিশাল, কত জটিল, কত রহস্যময়, কত পরিমাপহীন, কত পরিবর্ত্তনশীল তার শেষ নেই। বিশ্বসাহিত্যের ছবিঘরে এযাবৎকাল মানবজীবনের অনেক ছবিই সংগৃহীত হয়েছে। তবু জীবনের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও তাতে ধরা পড়েনি। কারণ, জীবন যে অশেষ। তার ইতি নেই। প্রতিটি মানুষই যে এক-একটি অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ড। অনন্য সে, অদ্বিতীয় সে, অপরূপ সে, বিশ্বের বিস্ময় সে। একটি মানুষের হৃদয়রাজ্যের সম্যক খবর দেওয়াও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই, জাতীয় সাহিত্যকে যদি সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হয়, তবে দেশের সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বস্তরের লোকের মনের কথা, প্রাণের কথা, আশা, কল্পনা, ধ্যান, ধারণা, আশঙ্কা, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, জয়, পরাজয়, কামনা, বেদনা ইত্যাদির চিত্র তার মধ্যে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হওয়া উচিত। কোন শ্রেণী বা কোন স্তর তুচ্ছ নয়। সকলকে নিয়েই সমাজ। জীবনের অর্থ ও মর্ম্ম খুঁজতে গেলে সর্ব্বত্র ঢুঁড়তে হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সবার অন্তরলোকে প্রবেশ করতে হবে। জীবন-অনুসন্ধান ও জীবন-অনুধাবন এক তপস্যাবিশেষ। অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে যারই সঙ্গে অন্তর দিয়ে মেশা যায়, দেখা যায় তারই কাছে নূতন কিছু পাওয়া যায়। অবশ্য সাহিত্যিক নিজেকে যত গভীর ও ব্যাপকভাবে চিনতে ও জানতে পারেন, অন্যকে বোঝা তাঁর পক্ষে তত সহজ হয়। তাই, সাহিত্যিককে শুধু

শিক্ষিত, মার্জ্জিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। দীনহীন, অশিক্ষিত, নিপীড়িত, বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হ'য়ে তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনচিত্র অঙ্কনের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে তাঁকে। সাহিত্যিকের চাই প্রাণের দরদ, বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও নিরাকরণী দৃষ্টিভঙ্গী। নইলে মতবাদের চশমা প'রে যদি তিনি সবকিছু দেখেন, তবে তাঁর ঐ ধারণানুরঞ্জিত দর্শন মানুষের সত্য পরিচয় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারবে না। কিন্তু মানুষের নিত্যধর্ম্ম যা', তা' মতবাদ নয়, তা' জীয়ন্ত জীবন, পরিপূর্ণ জীবন, পূর্ণ মানবতা; এই শরীরী ধর্ম্মবিগ্রহকে বলে আদর্শ। সক্রিয় আদর্শপ্রাণতাই দেয় সাহিত্যিককে সত্য-দর্শন ও সত্য পরিবেষণের ক্ষমতা। এই সত্য পরিবেষণ কিন্তু একটা নিষ্প্রাণ, দায়সারা ব্যাপার নয়, এর সঙ্গে থাকে আন্তরিকতা ও প্রাণের নিগূঢ় স্পর্শ। তাই, তা' মানুষের প্রাণ দুলিয়ে দেয়, স্পন্দিত করে, ব্যাকুল ক'রে তোলে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও সাহিত্যসাধনা

যিনি প্রকৃত রসিক, তিনি রস-স্বরূপ ঈশ্বরকে ভাল না বেসে পারেন না। ঈশ্বরপ্রীতি যাঁকে পেয়ে বসে, তিনি অজ্ঞাতসারে ভক্তি-বিশ্বাস সঞ্চারিত করেন অপরের হৃদয়ে। ভক্তি-বিশ্বাস মানুষকে শয়তানের কবল থেকে বাঁচায়, তা' পরিবেশসহ নিজের অপার সুখ, শান্তি, তৃপ্তি ও মঙ্গলের সৃষ্টি করে। তাই, সাহিত্যিক যদি ঈশ্বরপ্রেমী হন, তাঁর রচনার মাধ্যমে সর্ব্বপ্রকার ভাব ও রসের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তি-বিশ্বাসও সঞ্চারিত হয়ই। তাতে সাহিত্য যেমন দিব্য রসপুষ্ট হয়, মানবসমাজও তেমনি অমৃতসিক্ত হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। ভক্তি-সাধনা সাহিত্য-সাধনার পরিপন্থী তো নয়ই, বরং তার পরিপূরক। কারণ, যে মানব-প্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি ও সুন্দরের উপাসনা কাব্যসাহিত্যের প্রাণন-উৎস, সেগুলি প্রবল ও নিটোল হ'য়ে ওঠে প্রকৃত ভক্তি-বিশ্বাসের যাদুস্পর্শে। সাহিত্যিক এই সত্য যতই হৃদয়ঙ্গম করেন, ততই ভাল। তবে একথাও ঠিক যে, প্রত্যেকের প্রকৃতি তার নিজস্ব পথে চলে। বুদ্ধি ক'রে তার গতি বদলে দেওয়া যায় না। তিনিই ভাগ্যবান সাহিত্য-সাধক, যাঁর ভক্তি-বিশ্বাসের সহজাত প্রবণতা আছে এবং তার সঙ্গে আছে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-প্রতিভা। এই শুভসমন্বয় মণিকাঞ্চন-সংযোগের মতই ক্রিয়া করে।

সাহিত্য ও জটিল জীবন-সত্যের উদ্ঘাটন

সাহিত্যিককে হ'তে হবে শুভদর্শী। জগদ্ব্যাপার বড় জটিল, বড় রহস্যময়। বিচিত্র বেদনার দহনের ভিতর-দিয়ে না গিয়ে মানুষ পরিশুদ্ধ হ'তে পারে না, পরিসিদ্ধ হ'তে পারে না, গূঢ়তম সত্যের অন্তরতম অনুভূতি লাভ করতে পারে না। কুৎসিতের ভিতর সুন্দরের, অমঙ্গলের ভিতর মঙ্গলের, অশান্তির ভিতর শান্তির, দুঃখের ভিতর সুখের, বিরোধের ভিতর মিলের, মিথ্যার ভিতর সত্যের, মৃত্যুর ভিতর জীবনের বীজ অগোচরে লুকিয়ে থাকে। অবাঞ্ছনীয় যা' তাকে অতিক্রম ক'রে বাঞ্ছনীয় যা' তাকে আবিষ্কার ও আয়ত্ত করার কৌশল যিনি দেখাতে পারেন, তিনিই তো জীবন-শিল্পী। আবার, মানুষ তার অভ্যুদয়ের পথে আত্মতুষ্টি ও অহঙ্কারের বশে ঠিক পায় না তার পতনের রন্ধ্র কোথায়। অপ্রিয় সত্য হ'লেও সে-সত্য মানুষের গোচরে আনা তারই মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। সাহিত্যিক মোহমুক্ত ত্রিকালদর্শী মন নিয়ে নানাপ্রকার ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি ক'রে মানুষকে দেখাবেন—অমঙ্গলকে ভেদ ক'রে কেমন ক'রে মঙ্গলে উপনীত হ'তে হয়, আবার সুখের দিনে কতখানি অতন্দ্র থেকে প্রলোভন ও দুর্ব্বলতার হাতছানি এড়িয়ে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত চরিত্রই মূলকথা। সুগঠিত চরিত্রের গুণে মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ঘটনাস্রোতের চাপের মধ্যে প'ড়েও বড় হয়। আবার, তার অভাবে সুখ-সম্পদও মানুষের দুঃখ, বিপদ ও অধঃপতনের কারণ হয়। সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেবে, সঙ্গে-সঙ্গে তার মানসিক অন্ধতা, বধিরতা ও নিথরতাকে অপসারণ করবে, তার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তুলবে। তবেই তো হিতীসুন্দর ভূমিকা সার্থকভাবে উদযাপিত হবে।

শ্লীলতা, অশ্লীলতা ও সাহিত্য

সাহিত্যে শ্লীলতা, অশ্লীলতা-সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন ওঠে। জীবনের ক্ষেত্রে নরনারীঘটিত সমস্যা, প্রেম ও যৌনজীবনের যখন একটি বিশাল ভূমিকা আছে, তখন সাহিত্যে তার পরিসর সঙ্কীর্ণ হবার কথা নয়। এইসব বিষয় বিনা দ্বিধায় পরিবেষণ করতে কোন বাধা নেই। কিন্তু শিল্পসম্মতভাবে যতটুকু যেভাবে বলা প্রয়োজন তার মাত্রা ছাড়িয়ে সাহিত্যিক যদি নিজ দুর্ব্বলতা বা স্বার্থপর কোন মতলববশতঃ ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে নিজ জুগুপ্সিত লালসা চরিতার্থ

করতে চান, তাহ'লে বুঝতে হবে শিল্পী-হিসাবে তিনি অপটু, অক্ষম ও অপরাধী। যে-কোন বিষয় কলাশাস্ত্রানুযায়ী উপস্থাপন করতে গেলেই চাই সমীচীন সংযম ও নির্লিপ্তি। প্রবৃত্তি-অভিভূতির গহ্বরে নিমজ্জিত হ'লে সেই মুহূর্ত্তে আর যা'হোক বিষয়ের কিছুটা ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে, সংযত ও নির্লিপ্তভাবে সুরুচি ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত ক'রে পবিত্রতার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অঙ্কন করা যায় না।

শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বিষয়গত ব্যাপার নয়। এটা হ'ল শিল্পীর মনোগত ব্যাপার। তিনি যদি নিষ্প্রয়োজনে তাঁর মনের কুৎসিত ক্লেদাক্ত আসক্তির রং বিষয়ের উপর ছিটিয়ে দিয়ে তাকে আবিল ক'রে তোলেন, সেখানেই ঘটে রসবিকার ও ছন্দপতন। সেখানেই হয় অশ্লীলতা ও কুরুচির আমদানি, যা' মানুষকে নিম্নগামী ক'রে তোলে। মানুষের মন স্বভাবতঃই নিম্নগামী ও প্রবৃত্তিমুখী, শিল্পী যদি রসসৃষ্টির নামে তারই ইন্ধন যুগিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ ক'রে তাঁর ব্যবসায়ী-বুদ্ধিকে জয়যুক্ত করতে চান, সেখানেই তিনি ব্রতভ্রষ্ট হন। তাতে তাঁর নিজেরও ক্ষতি, শিল্পেরও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি। আদর্শচ্যুত হ'য়ে সাময়িক জনপ্রিয়তা-অর্জ্জন কোন শিল্পীরই কাম্য হওয়া উচিত নয়। এ কথা তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে, মহাকালের সম্মার্জ্জনী শিল্পশালার যাবতীয় জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিতে কখনও কসুর করে না। অশ্লীলতার আবিল রস মিশিয়ে, বিকৃতরুচি পাঠকদের বিকৃতির খোরাক জুটিয়ে আশু বাজার গরম করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ, অশ্লীলতা শিল্পসংগত নয়। অবশ্য, যুগে-যুগে দেশে-দেশে এ-সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আবার, একই কালে একই দেশের একশ্রেণীর সুস্থমনা পাঠক যাকে অশ্লীল ব'লে রায় দেন, অন্য এক শ্রেণীর সমঝদার পাঠক তাকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম্ম ব'লে অভিনন্দন জানান। তাই, এ-সম্বন্ধে একটা সুনির্দ্দিষ্ট মান-নির্ণয় কঠিন ব্যাপার। আমরা বলি—বলার মত ক'রে বলতে জানলে যৌনজীবন-ঘটিত যে-কোন কথাই শোভন-সুন্দর ক'রে শুচি-শুদ্ধ ব্যঞ্জনায় বলা চলে। পাঠক-সাধারণের উপর কোন্ রচনা কী প্রভাব সৃষ্টি ক'রে, সেইটেই হ'ল বড় কথা। রসোত্তীর্ণ শিল্পের মধ্যে এমন একটি উদাত্ত সুর থাকে, যা' মানুষের মনকে অনিবার্য্যভাবে ঊর্দ্ধপানে উত্তোলিত করে। স্থূল কামকলার বর্ণনাও এমনভাবে দেওয়া চলে যাতে পাঠকের মন অনন্তাভিমুখী হ'য়ে ওঠে। সেটা নির্ভর করে শিল্পীর মনোভূমি, কল্পনাশক্তি ও কলাচাতুর্য্যের উপর।

কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি। লিঙ্গ-উপাসনার যে-পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তা' তো শিব ও শক্তির স্থূল মিলনেরই প্রতীক। কিন্তু চিরপ্রবহমান বিরাট সৃজনলীলার পরিকল্পনা ক'রে তার মধ্যে এমন একটি তুরীয় তাৎপর্য্য ও দ্যোতনা সঞ্চারিত করা হয়েছে যে, ঐ স্থূল অভিব্যক্তি আমাদের মনে কোন বিকারের সৃষ্টি তো করেই না, বরং তা' আমাদের মনের সমস্ত মালিন্য ও চাঞ্চল্য অপসারণ ক'রে মানসচেতনাকে ঊর্দ্ধলোকে প্রেরণ করে। ভক্তের শিব-সুন্দর নির্ম্মল সত্যদৃষ্টির সঞ্চারণার ভিতর-দিয়ে জনমন কিন্তু এইভাবে প্রভাবিত হ'য়ে চলেছে। শিল্পীর চোখেও চাই এই শিবসুন্দর সত্যদৃষ্টির অমিয়-অঞ্জন।

সাহিত্য মানুষকে দেখাবে তার নিত্যকালীন মহৎ স্বরূপ

সব দোষ-দুর্ব্বলতা ও হীনতা সত্ত্বেও মানুষকে ছোট ক'রে দেখা পাপ। সে বিরাটেরই অংশ। তার জীবন অনন্তব্যাপ্ত, বিশ্ববিধৃত ও বিশ্বসম্বন্ধ। পরমপিতার সৃজনলীলার দোসর সে। তাকে বাদ দিয়ে বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক। মহত্ত্ব তার নিত্যসম্পদ, হীনত্ব তার ক্ষণিকের আহরণ, সাময়িক আবরণ। তা' একদিন খ'সে পড়বেই। মালিন্য তাকে যতই পেতে বসুক না কেন, স্রষ্টার বিধান-অনুযায়ী একদিন সে মালিন্যমুক্ত হ'য়ে স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবেই। সে শুধু বাঁচার জন্য বাঁচে না। সে বাঁচে তার মহত্তর সত্তাকে, ভূমাকে উপলব্ধি করবার জন্য। ন্যূনতর কোন প্রাপ্তিতে তো'র অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হ'তে পারে না। সে যে অনন্তের তনয়, তাই অনন্তকে তার চাই-ই। মানবাত্মা-সম্বন্ধে এই বোধ, আস্থা ও শ্রদ্ধা যদি সাহিত্যিকের না থাকে তবে তার উত্তরণলাভ, বন্ধনমুক্তি ও আত্মিক পুনর্বাসনের উজ্জ্বল ইঙ্গিত আমরা পাব না তাঁর রচিত সাহিত্যে। সাহিত্য মানুষকে হাতছানি দিয়ে তার নিত্যস্বরূপের দিকে টানবে, দেখাবে কেমন ক'রে সমাজ-সংসারের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'য়ে, সেগুলির নিরাকরণ ক'রে, চিরবাঞ্ছিত নূতন সমাজ ও নূতন বিশ্ব গ'ড়ে তোলা যায়। হ'তে পারে এটা স্বপ্ন। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানের সূত্র ধ'রে স্বর্ণভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন যদি সাহিত্যিককে পাগল ক'রে না তোলে, তবে মানুষ সমুখপানে এগিয়ে চলার প্রেরণা পাবে কোথা থেকে?

সাহিত্যের নীতি শিল্পকলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

সাহিত্য-সম্বন্ধে আমরা যে-সব আলোচনা করেছি, শিল্পকলাদি এবং সংস্কৃতির

অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথাগুলি ক্ষেত্রানুযায়ী অল্পবিস্তরভাবে প্রযোজ্য।

বিজ্ঞান

আমরা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু তাছাড়াও বিজ্ঞানের একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে। বিশ্বজগৎ চলছে বিধি-অনুবর্ত্তিতায়। বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা। কারণ-ব্যতীত কার্য্য ঘটে না। এই কার্য্যকরণ-শৃঙ্খলাকে অনুসরণ ক'রে আমরা প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারি, প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিকে আয়ত্তে এনে আমাদের প্রয়োজনপূরণে লাগাতে পারি, প্রকৃতি-নিহিত সম্ভাব্যতার সদ্ব্যবহার ক'রে এবং যন্ত্রশক্তির বিনিয়োগে আমাদের সুখ, সুবিধা, সম্পদ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারি। জীবনের বেশির ভাগ সমস্যাকেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে সমাধান করা সম্ভব। বিজ্ঞানের প্রসার আজ তাই সারা পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানবের সমাজ, সভ্যতা ও জীবন-যাত্রার রূপও যাচ্ছে বদলে।

বিজ্ঞানের ব্যাপকতা

ব্যাপক ও গভীরভাবে দেখতে গেলে মানুষের সমগ্র জীবনই বিজ্ঞান-বিধৃত। ধর্ম্মও বিজ্ঞান-বহির্ভূত ব্যাপার নয়। বরং ধর্ম্মকে বলা যায় পরা-বিজ্ঞান। পরাবিজ্ঞান ও অপরাবিজ্ঞানের অনুশীলন যুগপৎ যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহ'লে কিন্তু সমূহ বিপদেরই কথা। কারণ, মানুষ যদি অপরাবিজ্ঞানের বলে অমিতশক্তির অধিকারী হয়, অথচ সংযম এবং কল্যাণবুদ্ধির অভাবে তার ধ্বংসাত্মক প্রয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়ে তা'তে যে কী মহাবিপর্য্যয় ঘটতে পারে তা' সহজেই অনুমেয়।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অপব্যবহার

মানুষ বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সৃষ্টি করেছে আত্মরক্ষা ও সুখসুবিধার জন্য, দুরন্ত প্রকৃতির দৌরাত্ম্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য, সার্ব্বিক প্রভুত্ব অর্জ্জনের জন্য। কিন্তু বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যারও একটা নিজস্ব গতি আছে, খেয়াল আছে, দাবী আছে, ধর্ম্ম আছে, প্রভাব আছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রদানবের গতিবেগ ও শক্তি যদি আমাদের হাতের বাইরে গিয়ে উধাও হ'য়ে ছুটে চলে, আমরা যদি আমাদের উদ্দেশ্য ও

গন্তব্য ভুলে গিয়ে প্রবৃত্তি-আবিষ্ট হ'য়ে ঐ নিরুদ্দেশ গতিশক্তির কাছে নতিস্বীকার ক'রে চলি, তবে ঐ বেহুঁশ অভিভূতি ও দাসত্বের ফলে আমাদের সন্তোষ, শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ বিদায় নেবে, এমন-কি রক্ষকই আমাদের ভক্ষকে পরিণত হবে। অর্থাৎ, আমরাই আমাদের দোষে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার বিশ্বপালনী শক্তিকে বিশ্ব-বিধ্বংসী শক্তিতে পরিণত করব এবং অপরকে মারতে গিয়ে নিজেদের মরণের পথ প্রশস্ত করব। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শক্তিমান বিজ্ঞানীরা যদি ভীরুতা বা স্বার্থপরতাবশতঃ অকল্যাণপন্থী রাষ্ট্রনেতাদের হাতে খেলার পুতুলে পরিণত হন, তাতে কিন্তু বিজ্ঞান ও মানবজাতির দুর্দ্দিনই ঘনিয়ে আসবে। তাই, রাষ্ট্রনেতা, বিজ্ঞানী, যন্ত্রকুশলী, জনসাধারণ, সকলকেই আজ সাবধান হ'তে হবে। কারণ, শক্তি ও সম্পদের সঙ্গে-সঙ্গে যদি প্রবৃত্তি-অভিভূতি-মুক্ত অপ্রমাদী সচেতন সংযতচলন ও শুভবুদ্ধি না থাকে, তাহ'লে ঐ শক্তি ও সম্পদই সর্ব্বনাশের জনক হ'য়ে দাঁড়াবে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সমন্বয়

শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত অমনতর সংযত চলন কিন্তু পরাবিজ্ঞান বা ধর্ম্ম অনুশীলনেরই দান। অবশ্য, এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে আরো অনেক-কিছু। তাই, ধর্ম্মানুশীলন-সম্বন্ধে যেমন অবহিত হ'তে হবে, তেমনি অবহিত হ'তে হবে জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপারে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাপ্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতি সঞ্চারিত করা সম্বন্ধে। অভিভূতিমুক্ত মন, কারণমুখীনতা ও অনুসন্ধিৎসু সেবাবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বিশেষ ক'রে বংশগতি, সুবিবাহ, সুপ্রজনন, সুশিক্ষা ও সৎজীবিকার ধারাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানবোধ যদি সর্ব্বাত্মক হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে অজ্ঞতা ও শাতনীশক্তির সমস্ত দুর্গ দখলে এনে আমরা দেবদুর্লভ চরিত্র, আন্তর ও বাহ্য সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য ও অমরণকে অধিগত করতে পারব। ধীরে-ধীরে অখণ্ড মানবসমাজ এক নবতর বিবর্ত্তনে উন্নীত হ'য়ে উঠবে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-ধর্ম্মিতাকে যদি সার্থক ক'রে তুলতে হয় তবে তাকে সমাজের সর্ব্বস্তরে এমনতর সর্ব্বাঙ্গীণ ও সাত্বতভাবে সঞ্চালিত করতে হবে।

রাষ্ট্র ও রাজনীতি

সমাজ-রাষ্ট্র রূপান্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে

মানুষের সমাজ ও সভ্যতা ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে। এই বিবর্ত্তনের মূলে আছে কিন্তু বাঁচার তাগিদ ও প্রয়োজন। মানব-ইতিহাসের পর্ব্বে-পর্ব্বে যেমন নূতন-নূতন সমস্যার উদয় হয়েছে, মানবের আত্মরক্ষণী ও আত্মোন্নয়নী প্রয়াসও কিন্তু তেমনি উদ্যত হ'য়ে সেগুলির সমাধানে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। এমনি ক'রে মানুষ লাভ করেছে ভালমন্দ-সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে বিভিন্ন-ব্যাপারে সে তার চলার রীতি ও পদ্ধতি নির্দ্ধারণ ক'রে চলেছে। চলার পথে তার সমস্যা, প্রচেষ্টা ও পরীক্ষার কোন শেষ নেই। কারণ, জগৎ ও জীবন কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। দেশকালের গতি এবং মানব-সমাজোত্থিত অনিশ্চিত ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতিকে নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতার আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত ক'রে চলেছে। আর, মানুষকে ক'রে চলতে হচ্ছে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ। নিত্য গতিশীলতা ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য তার প্রস্তুত না থাকলেই নয়। অন্যান্য ব্যাপারে এ-কথা যেমন সত্য, রাষ্ট্র, রাজনীতি, শাসনতন্ত্র ও শাসনযন্ত্রের ব্যাপারেও এ-কথা তেমনি সত্য। প্রাচীনকাল থেকে এগুলির তত্ত্ব ও বাস্তবমূর্ত্তি অজস্র রূপান্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

রাষ্ট্রের উপাদান

জনসমাজ, নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড, জাতীয়তাবোধ, গোষ্ঠীধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি, প্রথা, সমাজনৈতিক একপ্রাণতা, অর্থনৈতিক স্বার্থ-সম্বন্ধতা, সুসংগঠিত সরকার, শাসনতান্ত্রিক ঐক্য, সার্ব্বভৌমিকতা, জনগণের স্বীকৃতি ও আনুগত্য, স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি নানাবিধ উপাদানের সমন্বয়ে গ'ড়ে ওঠে রাষ্ট্র। বিভিন্ন বিষয়ে নানা বৈচিত্র্য, নানা বৈষম্য, নানা পার্থক্য ও নানা স্বাতন্ত্র্য

সত্ত্বেও রাষ্ট্রের প্রাণ হচ্ছে জনগণের ঐক্যবোধ, আত্মীয়তাবোধ-দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে গৌরববোধ। এই দেশাত্মবোধ ও জাতীয় গৌরববোধের মানে এ নয় যে, তারা অন্য দেশ ও অন্য জাতিকে হীনচক্ষে দেখবে ও তাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেবে না। বরং কেউ যদি নিজের দেশকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তা' থেকেই সে প্রত্যেকটি দেশ ও জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখবে। অনেকে মনে করেন, দেশাত্মবোধ বিশ্বমানবিকতা-বোধের পরিপন্থী। কিন্তু সুস্থ ও উদার দেশাত্মবোধের সঙ্গে ঐ জাতীয় উগ্র বিরোধমূলক ভাবের কোন সঙ্গতি নেই।

রাষ্ট্রের করণীয়

প্রথমেই একটা কথা ওঠে—রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও করণীয় কী? এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ আছে, যথা—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাম্যবাদী রাষ্ট্র, অভিজাত-তান্ত্রিক রাষ্ট্র, একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র-সমন্বিত রাষ্ট্র, ধর্ম্মীয় রাষ্ট্র ইত্যাদি। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা নিজস্ব সংবিধান থাকে। আর থাকে সেই সংবিধানসম্মত সরকার বা শাসন-সংস্থা। সরকার রাজশক্তিরই প্রতীক। রাজশক্তির কাজ হচ্ছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, আভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং জনগণের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তাবিধান। সঙ্গে-সঙ্গে জনগণের সর্ব্ববিধ অভাব-অভিযোগ, অসুবিধা ও অযোগ্যতা দূরীকরণ এবং কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বগ্রহণ ও অধুনাতন সরকারসমূহের করণীয়ের অঙ্গীভূত। রাষ্ট্র ও সরকারের মৌলিক লক্ষ্য তাই সর্ব্বতোমুখী লোককল্যাণ। রাষ্ট্র ও সরকার যে-আদর্শ ও নীতি দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন, এ-কথা স্বতঃ-স্বীকার্য্য যে, শাসকদের সুখ-সুবিধা ও স্বার্থবিধানের জন্য শাসনসংস্থা ও জনগণের সৃষ্টি হয়নি, পরন্তু জনগণের সুখ-সুবিধা ও সঙ্গত স্বার্থবিধানের জন্যই শাসন-সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং শাসন-সংস্থার মধ্যে যিনি যত উচ্চপদেই আসীন হউন না কেন, তিনি জনসাধারণের সেবক মাত্র। এমন কি রাজতন্ত্রের মধ্যেও রাজার স্বেচ্ছাচারী হবার অধিকার নেই। তাঁর কর্ত্তব্যচ্যুতি হ'লে একজন সাধারণ প্রজাও তাঁর কাছে সমীচীনভাবে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে এবং তিনিও তার জবাবদিহি করতে বাধ্য। তাই ব'লে শাসকদের যে কোন

বিশেষ সুযোগ, সুবিধা, অধিকার, ক্ষমতা ও মর্য্যাদা থাকবে না, তা' কিন্তু নয়। সেগুলিরও উদ্দেশ্য হ'ল সুষ্ঠুতর প্রশাসনকার্য্য ও সেবাপরিবেষণের পথ প্রশস্ত ক'রে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যকে পদদলিত ক'রে সেগুলির অপব্যবহার করবার অধিকার তাদের নেই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা সেখানেই ক্ষমতার অপব্যবহারে উৎসাহিত হয়, যেখানে পরিবেশ অসৎ-নিরোধে সক্রিয় নয়। পৃথিবীর বহু পাপ ও বহু অপরাধের অন্যতম কারণ হচ্ছে পরিবেশের সৎসাহসের অভাব ও অসৎ-নিরোধ পরাঙ্মুখতা।

লোক কল্যাণের তাৎপর্য্য

আমরা যে লোক কল্যাণের কথা বলছিলাম, বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বোঝা যায়—প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণ ছাড়া লোককল্যাণ একটি অবাস্তব ব্যাপার। ব্যক্তির কল্যাণ মানে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। রাষ্ট্র তার সুযোগ দিতে পারে, কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা না-করা ব্যক্তির ইচ্ছাসাপেক্ষ ব্যাপার। আবার, মানুষের কল্যাণ একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক ব্যাপার। দেহ, মন ও আত্মা এ তিন নিয়ে একটা গোটা মানুষ। যুগপৎ তিনের সুসমঞ্জস বিকাশ ও পুষ্টি না হ'লে মানবসত্তা প্রকৃত স্বস্তি ও তৃপ্তি পায় না। দেহের ক্ষুধাকে, দেহের দাবীকে, দেহের প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে শুধু মন ও আত্মাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জীবন বাঁচে না। আবার, মন ও আত্মাকে বাদ দিয়ে শুধু দৈহিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যাকুল হ'লে, মন ও আত্মার সাহায্য, সহযোগিতা ও রসদের অভাবে দেহরক্ষণী বিহিত বুদ্ধি, বিবেচনা, কৌশল ও প্রেরণার যোগানে ব্যাঘাত ঘটে এবং তার ফলে ধীরে-ধীরে দৈহিক অস্তিত্বও বিপন্ন হ'য়ে ওঠে। আর, দেহের জীবন যদি অটুটও থাকে, তবে মন ও আত্মাকে উপেক্ষা ক'রে তার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য আমরা ঠিক-ঠিক উপভোগ করতে পারি না। সে-অবস্থায় যে-দেহসুখ আমরা ভোগ করি তা' পশু-সুলভ ভোগের চাইতে উন্নততর কিছু নয়। তার মধ্যে থাকে না মনুষ্যোচিত সাত্বত সংযম, শুচিতা, চারুতা ও সূক্ষ্মতা-সমন্বিত ভোগের নিবিড় রসাস্বাদন। তাই, দেহসর্ব্বস্ব হ'তে গিয়ে আমরা দেহকেও পাই না, তাকেও হারাই, তার অবদান থেকেও বঞ্চিত হই। দেহ, মন, আত্মা এই অচ্ছেদ্যত্রয়ীর যার সম্বন্ধে যখনই আমরা উদাসীন হই, তখনই তা' বিপর্যয়প্রসূ হ'য়ে ওঠে। এটা ব্যষ্টিজীবনে যদি সত্য হয়, তবে রাষ্ট্রজীবনে আরো বেশি সত্য।

রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম

তাই, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত সার্ব্বজনীন মানবধর্ম্মের ভিত্তির উপর। একমাত্র ধর্ম্মই পারে ব্যষ্টিমানব ও সমষ্টিমানবের অখণ্ড সত্তার পোষণ দিতে।

ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

ধর্ম্মের কথা উঠতেই মানুষের মনে জাগে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন স্থান নেই। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকতে পারে। তবে সব সম্প্রদায়ই মূলতঃ একপন্থী। সবারই লক্ষ্য হ'ল ইষ্টনিষ্ঠ তথা ঈশ্বরনিষ্ঠ হ'য়ে প্রবৃত্তিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে সপরিবেশ জীবন-বৃদ্ধির পথে চলা। ধর্ম্ম হ'ল বাঁচা-বাড়ার সার্ব্বজনীন বিজ্ঞান, যা' যুগে-যুগে মূর্ত্ত হয় ঈশ্বরসর্ব্বস্ব বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মহাপুরুষদের জীবন ও বাণীতে। ধর্ম্ম মানে ঈশ্বরানুমোদিত জীবনপথ যা' ব্যষ্টি ও সমষ্টির অস্তিত্বকে ধৃতি ও বৃদ্ধির পথে পরিচালিত করে। ঈশ্বর যেমন এক, ধর্ম্মও তেমনি এক, যত ধর্ম্মমত থাক না কেন তত একই পথ এবং প্রেরিতগণও এক বার্ত্তাবাহী। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয় হ'য়েই আছে। কারণ, সেগুলি একই তত্ত্বের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। মৌল ধর্ম্ম যা' তা' কখনও বহু বা স্ব-বিরোধী হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের কারণ আমাদের অজ্ঞতা, অনুদারতা ও অসহনশীলতা। সমস্ত প্রেরিতপুরুষই একই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা ও একই সত্যের উদগাতা। তাই, নিজ ইষ্টের প্রতি সুনিষ্ঠ হ'য়ে পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী প্রত্যেক প্রেরিতকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করতে হবে। তা' না করলে স্বীয় ইষ্টকেই অবমাননা করা হয়, তাঁকে ঠিক-ঠিক স্বীকার, শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করা হয় না। একজনের অতীত ও ভবিষ্যৎ রূপকে অশ্রদ্ধা ক'রে শুধু তাঁর বর্ত্তমান রূপকে শ্রদ্ধা দেখাতে গেলে সে শ্রদ্ধা কখনও সুসম্পূর্ণ ও অখণ্ড হয় না। আর, ঐ খণ্ডিত শ্রদ্ধায় কতটুকু কাজ হ'তে পারে, তা' সহজেই অনুমেয়। ঐ সব ভাগবত-মানবদের সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার ক'রে কাউকে ছোট বা কাউকে বড় করার প্রয়াস ভাল নয়। ওতেও অপরাধ হয়। আবার, পূর্ব্বতন যে-কোন প্রেরিত পুরুষকেই আমরা অনুসরণ করি না কেন, তাঁকে অনুসরণ করার সুষ্ঠু পন্থা হচ্ছে অধুনাতন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মণ প্রেরিতপুরুষ যিনি, তাঁকে গ্রহণ ও স্বীকার করা। কারণ, তাঁর মধ্যে

পূর্ব্বতন প্রত্যেকেই আরোতর পরিণতি নিয়ে জীয়ন্ত থাকেন। তাঁর মধ্যে সকলকেই পাওয়া যায়। তাঁকে গ্রহণ করা মানে কিন্তু কাউকে ত্যাগ করা নয়।

ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ধর্ম্মবিরোধী ব্যাপার

পিতৃপুরুষ, সাত্বত পিতৃকৃষ্টি ও প্রেরিতপুরুষকে ত্যাগ ক'রে যে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা' কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ধর্ম্ম-বিরোধী ব্যাপার। ধর্ম্ম কখনও উৎসবিমুখতা শেখায় না, ধর্ম্ম কখনও মানুষকে বিশ্বাসঘাতক হ'তে বলে না।

দীক্ষা

ধর্ম্ম প্রধানতঃ নিষ্ঠানন্দিত আচরণের ব্যাপার। দৈনন্দিন জীবনে যে-আচরণের অনুশীলন করতে হবে তার উপদেশ-নির্দ্দেশ ও পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে জ্ঞাত হওয়াকে বলে দীক্ষাগ্রহণ। তার জন্য পিতৃপুরুষ, পিতৃকৃষ্টি ও স্বীয় প্রেরিত-পুরুষকে ত্যাগ করতে হয় না। অধুনাতন বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-পুরুষের দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে নিষ্ঠার সঙ্গে করণীয় করতে থাকলে মানুষের যুগোপযোগী বিবর্ত্তন সহজ হ'য়ে ওঠে। দীক্ষার অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে মানুষ প্রকৃত মানুষ হ'য়ে ওঠে, তার জীবন ও চরিত্র পবিত্র ও সুন্দর হয়, তার সুপ্ত শক্তি ও সদ্‌গুণ বিকশিত হ'য়ে ওঠে, সে অখণ্ড ব্যক্তিত্ব লাভ করে এবং প্রকৃত দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী হয়। আবার, এই দক্ষতা ও যোগ্যতাকে সে স্বতঃই অপরের ধারণ, পালন ও পোষণে নিয়োগ করে। কারণ, সে বোধ করে যে, সে যে-পরমপুরুষের পূজারী, সেই পরমপুরুষই সত্তারূপে সবার মধ্যে বিদ্যমান।

ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সাত্বত রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক

তাকে দিয়ে ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। বরং অসৎনিরোধে সে হয় তৎপর। তার ব্যক্তিত্বই তাকে ক'রে তোলে দশের ধারক, পালক, পোষক, রক্ষক ও শাসক। সে যত ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্নই হোক না কেন, সে হ'য়ে ওঠে সাত্বত রাষ্ট্রশক্তির একটি ছোটখাট প্রতীক। সাত্বত রাষ্ট্রশক্তির ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীয়ন্ত প্রতীকস্বরূপ কতকগুলি মানুষ যদি একটা দেশে গজিয়ে না ওঠে, তবে শুধু সাংবিধানিক ধারাগুলির প্রয়োগে একটা সুষ্ঠু রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠতে পারে না।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মপ্রস্তুতি

প্রতিনিধিস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাঁরা হবেন, তাঁদের যেমন চাই জন্মগত শুভ-সংস্কার ও উপযুক্ত আধার, তেমনি চাই ইষ্টনিষ্ঠা তথা ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং দৈনন্দিন জীবনে বিহিত ধর্ম্মানুশীলন। এর ভিতর দিয়ে হয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও চিত্তশুদ্ধি। তাই-ই মানুষকে নিরভিমান, নিরাসক্ত, অপ্রমাদী ও অপ্রমত্ত ক'রে বৃহৎ-দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে ও বিপুল শক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে শেখায়। একজনের অন্যান্য গুণপনা যতই থাক্ না কেন, সে যদি প্রতিদিন আত্মবিচার, আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংশোধন ও ধর্ম্মানুশীলনে অভ্যস্ত না থাকে, তাহ'লে তার ভিতর ক্রমেই গলদ জমতে থাকে এবং পরিশেষে সাত্বত চলনে চলা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। অবশ্য সারাজীবন সাধনতপস্যা ক'রেও চরিত্র বদলায় না, এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তার কারণ দুর্ব্বলতার প্রতি মমতা। কিন্তু এ-কথা ঠিকই, কেউ যদি দুর্ব্বলতা অতিক্রম করতে ইচ্ছুক হয়, অনুরাগ-সমন্বিত তপস্যা তাকে উন্নত জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে এই কাজটিকে সহজসাধ্য ক'রে তোলে।

ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাগরিকদেরও ধর্ম্মপ্রাণ হওয়া অবশ্য প্রয়োজন

কোন রাষ্ট্র যদি ধর্ম্মনিরপেক্ষ হয়, তাহ'লেও বিশিষ্টদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও সাধনশীল হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নেই। ধর্ম্মনিরপেক্ষতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ কোন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। ধর্ম্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্ম্মহীনতা বা ধর্ম্মবিরুদ্ধতা নয়। তবে প্রচলিত ঐতিহাসিক ধর্ম্মমতের কোনটাই যদি একজন না মানে, তাহ'লে সেই না-মানার স্বাধীনতাও তার আছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতিদানও ধর্ম্মনিরপেক্ষতার অন্যতম লক্ষ্য। তবে অপরের বাঁচা-বাড়ার সুসঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ না করাটা কিন্তু ধর্ম্মেরই একটা নেতিবাচক অঙ্গ। ধর্ম্মের এই অংশটিকে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত না করলে কোন রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠতেও পারে না, টিকে থাকতেও পারে না। আবার, অন্যকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচতে চেষ্টা করার নীতিকে সব রাষ্ট্রই সাগ্রহে অনুমোদন করে। এই

নীতিটি কিন্তু ধর্ম্মেরই মৌল ভিত্তি। কারণ, "অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম্ম ব'লে জানিস তাকে।" যেনাত্মনস্তথান্যেষ্যাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ"। সুতরাং বিশ্লেষণ-সহকারে দেখতে গেলে কোন দেশ, কোন রাষ্ট্র, কোন সমাজ বা কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মবিহীন ও ধর্ম্ম-বর্জ্জিত হ'তে পারে না। তাহ'লে আত্মবিনাশের পথই উন্মুক্ত হয়। কারণ, অপরকে মেরে বাঁচতে চেষ্টা করা মানে তা'কে শত্রু ক'রে তোলা। অপরকে বাঁচিয়ে বাঁচার নীতির সুষ্ঠুতা মানুষ বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও স্বার্থ-সংঘাত ও প্রবৃত্তি-অভিভূতির মধ্যে প'ড়ে সে ক'রে বসে উল্টো। শুধু নীতিবোধ তাকে শাতনীশক্তির প্রবল প্রতাপ হ'তে রক্ষা করতে পারে না। সক্রিয় ইষ্টানুরাগ ও ইষ্টনেশা যখন তাকে পেয়ে বসে, তখনই সে অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি-অভিভূতির হাত থেকে ত্রাণ পায় এবং সর্ব্বস্বার্থী প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে স্বীয় দায়িত্বে সকলের বাঁচা-বাড়ার পথ প্রশস্ত করতে লেগে যায়। এমনি ক'রেই তার নিজের জীবনবৃদ্ধিও দৃঢ়তর হয়। সে মানুষকে যতরকমের সেবাই করুক না কেন, তার মুখ্য কাজ হয়—ধর্ম্মদান অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইষ্টানুরাগ তথা ঈশ্বরানুরাগ সঞ্চার। এর ভিতর-দিয়েই সমাজে গজিয়ে ওঠে প্রীতি-সঙ্গতি, প্রীতি-সংহতি ও প্রীতি-পরিচর্য্যা। আর, তাই-ই রাষ্ট্রকে জোগায় অপরিসীম শক্তি।

প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণতার লক্ষণ ও তার অপরিহার্য্যতা

তাই, মানুষের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে নিজে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হ'য়ে চলা এবং অন্যকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হ'তে প্রবুদ্ধ করা। প্রত্যেকের নিজ ধর্ম্মমতের মূলতত্ত্বগুলি যেমন জানা উচিত, অপরাপর ধর্ম্মমতের মূলতত্ত্বগুলিও তেমনি তার অবগত হওয়া উচিত। এই সশ্রদ্ধ অবগতি সাধারণের মধ্যে যত প্রসার লাভ করে ততই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সহজ হ'য়ে ওঠে। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা যাতে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে না পারে, কল্যাণকামী প্রতিটি নর-নারীর সে-দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আর, কোন শাস্ত্র ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অধুনাতন পুরুষোত্তম যিনি, তাঁর শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত এবং তিনি যে সর্ব্বসঙ্গতিশীল সমাধান দান করেন, তাই-ই গ্রহণ করা উচিত। কারণ, তিনি হলেন সর্ব্বশাস্ত্রের মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক স্বীয় স্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে গভীর বন্ধুত্বের

বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। একজন প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ, যে-কোন সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সে প্রতিটি মানবের অকৃত্রিম বান্ধব ও সেবক। সে যেখানেই থাক্, তার চেতনা, চরিত্র ও চলন অনিবার্য্যভাবে পরিবেশের মধ্যে সৎ-সংহতি গজিয়ে তোলে। সে-সংহতি যেমন রাষ্ট্রীয়-সংহতির সঙ্গে সুসঙ্গতিশীল, তেমনি তা' সুসঙ্গতিশীল অখণ্ড বিশ্ব-সংহতির সঙ্গে। তাকেই বলা যায় সব চেয়ে প্রগতিশীল মানুষ। কেননা, সে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধানের তালে-তালে পা ফেলে চলে। সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিরোধের ব্যবধান এড়িয়ে সে মিলনের সেতু রচনা করে। তাই ব'লে সে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা করে না। ব্যক্তিত্বের এই পরমবিকাশ ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে সম্ভব হয় না।

ধর্ম্মকে পরিহার ক'রে শুধু আইন মানুষকে সৎ ক'রে তুলতে পারে না

তাছাড়া, সরকারের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে সমাজ-বিরোধী আচরণ, অসাধুতা, দুর্নীতি ও অপরাধ নিবারণ। যদি মানুষের মধ্যে গভীর ধর্ম্মবোধ, জাগ্রত না হয়, তাহ'লে শুধু আইন ও শাসনের জোরে এটা করা অসম্ভব। তাই, কোন রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ হ'লেও সেই রাষ্ট্র ও সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের এমন নিষ্ঠা ও অনুরাগ-সহকারে ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে চলা উচিত, যাতে তাদের ভিতর-দিয়ে তা' সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে যেতে পারে।

প্রকৃত ধর্ম্ম উপেক্ষিত হ'লে রাষ্ট্র দুর্ব্বল হবে

আর, এমন যদি কোন সংস্থা থাকে যা' সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীভূত ক'রে প্রত্যেককে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হতে অনুপ্রেরণা জোগায়, তবে সরকারের উচিত ঐ সংস্থাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, যা'তে সত্যিকার ধর্ম্মের জাগরণ হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিরাকরণ হয়। সরকার যদি ঐ সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে না পারেন তাহ'লে জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে ঐ সংস্থার নিজ দায়িত্বে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়া উচিত। ধর্ম্ম মানুষের পশুত্বকে রূপান্তরিত ক'রে তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের

উদ্বোধন ঘটায়। আর, জাতির চরিত্রই রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। তাই, এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, অখণ্ড ধর্ম্মের যে অংশটুকু জাতীয়-জীবন থেকে বাদ পড়বে রাষ্ট্রের ভিত্তিও সেই পরিমাণে দুর্ব্বল হবে।

আদর্শ রাষ্ট্র সংগঠনে বর্ণাশ্রম ও পঞ্চবর্হির মূলনীতির উপযোগিতা

প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের জন্য সব চাইতে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্যের পথে পরিচালিত করা। মনীষী, সমাজতত্ত্ববিদ ও মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, জীবনের সব ব্যাপারে বিশেষতঃ শিক্ষা, জীবিকা ও বিবাহের ব্যাপারে মানুষের জৈব-সংস্থিতি, প্রকৃতি, গুণ, রুচি, পছন্দ ও প্রবণতা বিশেষভাবে বিচার্য্য। মানুষের বংশগতি, মানসপ্রকৃতি, যোগ্যতা ও জৈব-সংগঠনের স্বরূপ, তাৎপর্য্য ও সম্ভাব্যতাকে উপেক্ষা ক'রে সমাজদেহে তার স্থান, কার্য্যকারিতা ও উপযোগিতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুষ্ঠু সমাজবিধানের জন্য প্রয়োজন প্রতিটি ব্যক্তির জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্যতার নির্দ্ধারণ, প্রস্ফুরণ ও সমাজ-কল্যাণসঙ্গত বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা। এতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই উভয়ের পরিপূরক হ'য়ে ওঠে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজবিরোধী-রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, আবার সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে সাত্বত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুন্ন করতে হয় না। অবশ্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলেই তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে তার অপব্যবহার করবার স্বাধীনতা। সেই বিপদকে এড়াবার জন্য প্রয়োজন হয় অন্তরের শাসন ও বাহিরের শাসন। ঋষি-বিধৃত বর্ণাশ্রমের মধ্যে এই বিভিন্ন দিকের শোভন সমাবেশ দেখা যায়। সদ্দীক্ষা ও তার অনুশীলন, ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্টানুশাসন, সামাজিক বিধিনিষেধ, অনুমোদন ও শাস্তি একযোগে ভিতর ও বাহির উভয়দিক থেকে মানুষকে শিষ্ট চলনে চলতে সাহায্য করে। এতে জাতীয়-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য, উপাদান ও গুণই বংশপরম্পরায় উৎকর্ষ লাভ করে। নিষ্ঠা, জ্ঞান, গবেষণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মী চরিত্র, ত্যাগ, তপস্যা, প্রেম, দিব্যদৃষ্টি, শৌর্য্য, বীর্য্য, সংহতি, সংগঠন, নেতৃত্ব, সামরিক শক্তি, প্রশাসনী দক্ষতা, কূটচাতুর্য্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদনের প্রাচুর্য্য, ধন, সম্পদ, দক্ষশ্রম, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, সেবা-সাহচর্য্য, আপদ-নিরাকরণী ব্যবস্থা, পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা, সম্প্রীতি ইত্যাদি কিছুরই অপ্রতুলতা থাকে না দেশে। রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তি,

সামাজিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি উপভোগ করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ আত্মিক মুক্তির পথে পদক্ষেপ করে। সে তার চরম গন্তব্য যে ঈশ্বরপ্রাপ্তি অর্থাৎ ধারণ-পালন সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বলাভ, সেইদিকে অগ্রসর হ'য়ে জীবনের মহৎস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ একযোগে আলিঙ্গন করে তাকে। সে হয় যুক্তাত্মা। নিয়ত ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের সমন্বয় সাধন ক'রে চলে সে। 'মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়' 'মরো না, মেরো না, পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর'—দুনিয়ার বুকে এই হয় তার অতন্দ্র অমৃত অভিযান।

এমনি ক'রে জন, জাতি, দেশ, রাষ্ট্র ও জগৎ মহাশক্তি ও মহামঙ্গলের অধিকারী হয়। তাছাড়া, বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক বিধান-অনুযায়ী বিবাহ, দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকলে, দেশে কখনও শুভসংস্কারসম্পন্ন, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিদীপ্ত, হৃদয়বান, কল্যাণকর্ম্মা, শক্তিধর যোগ্য মানুষের অভাব হ'তে পারে না, যেটা কিনা রাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ও সর্ব্বোত্তম সম্পদ। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখেই মহাজনরা বলেছেন যে, রাজশক্তির প্রধান করণীয় হচ্ছে বর্ণাশ্রম ঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা' দেখা এবং তার প্রতিবন্ধক যেগুলি আছে, সেগুলি দূর করা। বর্ণাশ্রম কথাটা সম্বন্ধে হয়তো অনেকের আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য যা', উদ্দেশ্য যা', তা' সকলেরই কাম্য। বর্ণ মানে হচ্ছে জন্মগত সংস্কার-অনুযায়ী বৃত্তি ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, আর আশ্রম মানে হ'ল চতুরাশ্রম, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের ক্রমবিস্তারশীল চারটি অধ্যায়। অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের রায় এই যে, মানুষকে তার প্রকৃতিসম্মত যথাযোগ্য কাজে নিয়োগ না ক'রে খেয়ালমত যত্র-তত্র স্থাপন করলে সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, অপটুতা, অসন্তোষ ও বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। কথায় বলে—'যার কাজ তার সাজে, অন্যজনায় লাঠি বাজে।' যে-কাজ যার সত্তা ও বৈশিষ্ট্যসঙ্গত, উপচয়ীভাবে সেই কাজে রত থাকার সুযোগ যদি সে পায়, তাহ'লে সে নিজে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র লাভবান হয়। দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, সুপ্রজননবিদ্যা, বংশগতি ও পরাবিজ্ঞানের এক অপূর্ব্ব প্রয়োগিক সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় বর্ণাশ্রমে। তাই, সর্ব্বসমঞ্জসা সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনেই একদিন উদ্ভব, উদ্ভাবন ও বাস্তব প্রয়োগ হয়েছিল বর্ণাশ্রমের শাশ্বত

তত্ত্বের। সে-প্রয়োজন কোন স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে-প্রয়োজন সব দেশের, সব কালের। তাই, বর্ণাশ্রমের ব্যবহারিক প্রয়োগের রূপ দেশকাল ও পরিবেশ-অনুযায়ী পরিবর্ত্তন লাভ করবেই। কিন্তু এই জীবনজড়িত বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলে তাকে সত্য-বিমুখতা ও বিজ্ঞানবিরোধী সংস্কারাচ্ছন্নতা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ফলকথা এক, অদ্বিতীয়কে মানা, পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের মানা, পিতৃপুরুষকে মানা, বর্ণাশ্রমের বিজ্ঞান মানা, যুগপুরুষোত্তমকে মানা—অর্থাৎ পঞ্চবর্হির অনুসরণ যদি জাতীয় জীবনে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহ'লে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

শান্তি, প্রগতি, স্বাধীনতা ও সমাজকল্যাণকে যারা ব্যাহত করে, তাদের রুখতে হবে

প্রত্যেকটি দেশেরই, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই আছে তার সাত্বত আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আত্মশাসন বা স্বাধীনতার অধিকার। সামরিক শক্তিপ্রসূত, কূটনৈতিক শক্তিপ্রসূত, অর্থনৈতিক শক্তিপ্রসূত বা রাজনৈতিক মতবাদপ্রসূত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ যদি সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ, খর্ব্ব বা অবলুপ্ত করে, তাহ'লেই কিন্তু বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হ'তে থাকে। কোথাও অশান্তি দেখা দিলে, সেই অশান্তি কিন্তু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা' ক্রমে-ক্রমে বিস্তারলাভ করে, এমন-কি বাঁচা-বাড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত মৌলিক মানবিক অধিকারগুলি কোথাও উল্লঙ্ঘিত হ'লে, তা'ও ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ ক'রে সমাজজীবনে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। মানবসমাজ একটি অখণ্ড দেহ-বিশেষ, তার একটি ক্ষুদ্রকোষে আঘাত করলেও, সেই আঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দৃশ্য-অদৃশ্যভাবে তার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। তাই, পৃথিবীর বহু মানুষের মধ্যে যদি সর্ব্বস্বার্থী জ্ঞান, বোধ ও প্রচেষ্টা এবং অসৎ-নিরোধী তৎপরতা না জাগে, তাহ'লে জাতিগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, পরিবারগত ও ব্যক্তিগতভাবে কেউই অখণ্ড শান্তি, স্বস্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করতে পারে না। আমরা সকলেই এক মূলতঃ অবিভক্ত, অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন, অভিন্ন গোটা বিশ্বের অধিবাসী! আমরা শুধু ব্যক্তিগত কর্ম্মফলই ভোগ করি না, দেশের ও জগতের সমষ্টিগত কর্ম্মফলও আমাদের অল্পবিস্তর ভোগ করতে হয়। কারণ, আমরা পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের অচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে বৃহত্তর পরিবেশকে

সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে তৎসৃষ্ট দুর্ভোগের ভাগীদার হ'তে হয় আমাদের। বিজ্ঞান স্থান-কালের দূরত্ব অপসারণ করায় দূরতম পরিবেশের ঘটনাবলীর প্রভাবও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা আজকাল সহজেই অনুভব করতে পারি। তাই, একযোগে সকলের ভাল যাতে হয় তাই করতে হবে। আমার উপর দাবী আছে দেশের ও পৃথিবীর সকলের, এবং তাদের সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব এবং করণীয়ও অশেষ। এটা হচ্ছে মানুষ-হিসাবে মানুষের দেশে, মানুষের পৃথিবীতে, মানুষের মত বাঁচার মহৎ সুযোগ ও অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিচ্ছেদ্য পূত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। এটা যদি করি তাহ'লে কোন বাহাদুরী নেই, কারণ এটা আমার ব্যাপক স্বার্থেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। যদি সাধ্যমত না করি, তাহ'লে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হ'তে হবে এবং সঙ্কীর্ণতা ও অযোগ্যতার অভিশাপ বহন করতে হবে। তাই সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, পোষণহীন শোষণ, প্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতা, বিশ্বশান্তি বিরোধী উগ্রজাতীয়তাবাদ ও ভ্রান্ত স্বার্থপরতার নিরসনের জন্য আমাদের লড়তে হবে।

নূতন সমাজ-গঠনে মানুষের দায়িত্ব ও করণীয়

কিন্তু আপনি, আমি যদি সর্ব্বস্বার্থী জ্ঞান ও বোধে উদ্দীপ্ত হই, তাহ'লেই বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে করতে পারি কতটুকু? তার উত্তর হ'চ্ছে—ঐ সর্ব্বস্বার্থী জ্ঞান, বোধ, প্রেম ও মঙ্গলপ্রচেষ্টার মূর্ত্ত প্রতীকস্বরূপ যদি কেউ থাকেন, আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে, নিজেরা ঐভাবে আরো গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে পারি, চিন্তা, চলন, কর্ম্ম ও বাক্যে ঐ ভাবগুলি প্রস্ফুটিত ক'রে তুলতে পারি, নিজেদের আচরণ-সমন্বিত জীবনসম্বেগ ও প্রত্যয় নিয়ে আমরা এগুলি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, সমভাবাপন্ন অন্য মানুষ যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগঠিতরকমে অমনতর আচরণ ও সঞ্চারণাকে ক্রমবৃদ্ধিপর ক'রে তুলতে পারি, এবং এই করার পথে নিজেদের ভিতর ও বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত যে-সব বাধা, বিঘ্ন ও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, প্রেম ও কুশলকৌশলী পরিচালনা এবং পরাক্রম নিয়ে আমরা সেগুলির নিরাকরণ ক'রে চলতে পারি। এমন ক'রে আদর্শনিষ্ঠা ও ধর্ম্মকে কেন্দ্র ক'রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানবের মঙ্গল, অভ্যুদয়, সংহতি ও শান্তির পথ প্রস্তুত হ'তে পারে। আমাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য

যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, আমরা যদি সঠিকপথে এক পা'ও অগ্রসর হ'তে পারি, তারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। প্রত্যয়দীপ্ত, সিদ্ধ সৎজীবন ও সৎদৃষ্টান্তের এক অমোঘ প্রভাব আছে এবং সে-প্রভাব অমর ও চিরবিস্তারশীল।

"চালাকী দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না।" আচরণহীন ফাঁকা বোলচাল হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তা' কারও মনে দাগ কাটতে পারে না। যদি কোন দাগ কাটে, তা' সোচ্চার হ'য়ে ঘোষণা করে যে, লোকটি মিথ্যাচারী ও কপট। এই আচরণ ও আন্তরিকতার দৈন্যের দরুণ বহু শক্তিমান ও প্রতিভাধর মানুষ স্থায়ী সাত্বতমূল্যসম্পন্ন কোন কাজ করতে পারে না। যা'হোক, যারা সৎনিষ্ঠ তারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকলে চলবে না, তাদের চাই সুসংহত, সুসংবদ্ধ, ধারাবাহিক প্রয়াস। অবশ্য, যেখানেই কোন আদর্শনিষ্ঠ সংগঠন দানা বেঁধে উঠতে যায়, সেখানেই কতকগুলি সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর, ধুরন্ধর মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেই। তাই সেখানে আদর্শানুগ যোগ্য নেতৃত্বের শক্ত হাতে হাল ধরা চাই। নইলে শক্তিমান, বুদ্ধিমান, লোভী দুষ্ট লোকেরা ঐ সংগঠনের ক্ষমতার মঞ্চ দখল ক'রে নিজেদের হীন মতলব চরিতার্থ করতে কসুর করে না। সঙ্ঘশক্তিকে যদি জয়যুক্ত করতে হয়, তবে সৎ-মানুষদের অর্জ্জন করতে হবে তেমনতর শক্তি, সামর্থ্য, জিতেন্দ্রিয়তা, ক্ষুরধারবুদ্ধি, বিবেচনা, কুশলকৌশলী পরিচালনা-প্রতিভা, স্নেহ-মমতা, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, উদারতা, মহত্ত্ব ও প্রচণ্ড অসৎ-নিরোধী পরাক্রম, যার ফলে দুর্জ্জয় শাতনীশক্তিকে রূপান্তরিত বা পরাভূত করা যায়, কিন্তু তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে না হয়।

নেতা হবার যোগ্যতা

প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের একটা গতি আছে, আছে একটা স্ফুটনোন্মুখ মগ্ন চৈতন্যের আত্মবিকাশের নিজস্ব ধারা। আবার, তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অন্তর্লীন ক্ষমতা। তাঁরাই জাতির নেতা হবার যোগ্য যাঁরা জাতির চিরপ্রবহমান প্রাণপ্রবাহ, অতীতের জীয়ন্ত উত্তরাধিকার, জাতির বর্ত্তমান সমস্যা ও পরিস্থিতি, বর্ত্তমান বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও জাতীয়-জীবনের উপর বর্ত্তমান বিশ্বের প্রভাব, মানবসভ্যতার গতি ও ভবিষ্যৎ, আগামী দিনে বিশ্বসভায় জাতির স্থান ও ভূমিকা, মানববিবর্ত্তনে জাতির সম্ভাব্য অবদান, এককথায় জাতির অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অনাচ্ছন্ন,

স্বচ্ছ ধ্যানদৃষ্টিতে অখণ্ডভাবে দেখতে পান। এমনতর দূরদর্শী নেতা অতীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাস্তব বর্ত্তমানকে এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে পারেন, যাতে জাতির ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর, সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

সার্থক নেতৃত্ব

জাতীয় প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের প্রাণময় স্বরূপটি, জাতীয় ভাগ্যবিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়টি যাঁর হৃদ্‌পদ্মে রূপ ধ'রে বিকশিত হ'য়ে না ওঠে, তিনি জাতির মর্ম্মমূলকে আন্দোলিত ক'রে তাকে মহত্তর আত্মোপলব্ধির সাধনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারেন না। আর, তপস্যার পথ ছাড়া জাতি তার সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাব্যতার সন্ধান পায় না, প্রকৃত বড় হ'তে পারে না। নেতার কাজ হ'ল জাতির জীবনে প্রীতিপ্রবুদ্ধ তপস্যাপরায়ণতা জাগ্রত ক'রে তোলা। নেতা যদি তাঁর নেতানিষ্ঠ নেতার প্রতি সুনিষ্ঠ না হন, ঐ নিষ্ঠা যদি তাঁকে সুনীত, সুনিয়ন্ত্রিত ও তপস্যাতন্ময় ক'রে না তোলে, তাহ'লে তিনি কিন্তু জাতিকে তার বিধিনির্দ্দিষ্ট সাধনশীলতার পথে পরিচালিত করতে পারেন না। লোকের প্রবৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে তাদের প্রিয় হওয়ার ফিকিরে ঘোরা নেতার কাজ নয়। ঐ রকমের নকল নেতৃত্ব নেতার নিজের পক্ষেও বিপজ্জনক বটে। নেতার কাজ হ'ল নিজেকে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে অপরকেও সাত্বত আত্মনিয়ন্ত্রণ, ত্যাগ, সেবা, প্রেম ও জীবন-ঐশ্বর্য্য আহরণের পথে নিত্য চলৎশীল রাখা। এমনতর নেতৃত্ব অপরিশুদ্ধ জনমতের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে লোকের ক্ষতিসাধন করে না, বরং অপরিশুদ্ধ জনমতকে তা' পরিশুদ্ধির পথে নিয়ন্ত্রিত ক'রে জনমঙ্গলকে সুনিশ্চিত করে। একেই বলে সার্থক নেতৃত্ব, সৃজনাত্মক নেতৃত্ব।

ভাগবত পুরুষের একনায়কত্ব

আমরা ভাগবত পুরুষের একনায়কত্বে বিশ্বাসী, কারণ, তিনি অভ্রান্ত এবং পক্ষপাতশূন্যভাবে প্রত্যেককেই তাঁর বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিপূরণ, পরিপালন এবং পরিরক্ষণ ক'রে থাকেন। ভজমানতা তাঁর স্বভাবগত। রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব ও সমষ্টিব্যক্তিত্ব তাঁতে পূর্ণপ্রভায় দেদীপ্যমান। তিনি অসামান্য গুণ ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিরভিমান, সহজ, সরল ও নির্লিপ্ত। তাই, তাঁর দ্বারা কারও অহং প্রতিহত তো হয়ই না, বরং অহং-এর এমন নিরাপদ আশ্রয়

ও সাত্বত প্রশ্রয় মানুষের অন্য কোথাও মেলে না। তাই ব'লে তিনি অন্যায় ও অমঙ্গলকে কখনও বরদাস্ত করেন না। মানুষকে প্রীতির ডোরে বেঁধে ছলে, বলে, কৌশলে তার মঙ্গলই করেন। তিনি তাঁর অপার অপার্থিব স্নেহপ্রীতি ও আস্থা দিয়েই মানুষের অন্তর্নিহিত সর্ব্বোত্তম গুণ ও শক্তি তার অতলতল থেকে টেনে বের করেন। তিনি হলেন ঈশ্বরের নরায়িত বিগ্রহ। তাঁর আবির্ভাব হয় মানুষ যা'তে তাঁকে ভালবেসে তার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরীয় সত্তার সন্ধান পেতে পারে। জীবনের সর্ব্বব্যাপারে তাঁর উপদেশ ও নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে অনুসরণ করাই মঙ্গলপ্রদ। কারণ, তিনি বাস্তবে অভ্রান্ত ও লোকস্বার্থী। তাঁর উপর বৃত্তিভেদী টান যদি কারও হয়, তারও জীবনের ভাগবত রূপান্তর সাধিত হয়। একনায়কত্ব ভাগবত পুরুষেই কেন্দ্রীভূত ও সীমিত হওয়া ভাল। কারণ একমাত্র তাঁর কাছেই প্রত্যেকের সাত্বত অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতম স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পায়।

সাধারণ মানবীয় একনায়কত্ব

সাধারণ মানবীয় একনায়কত্ব যেখানে, সেখানে বাহ্যিক অনেক উন্নতি দেখা গেলেও বহু মানুষের সাত্বত অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হ'তে বাধ্য। আদর্শপ্রাণ, আপোষরফাহীন, নির্ভীক, নিঃস্বার্থ, স্বাধীনচেতা, বিবেকী, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমসম্পন্ন মানুষগুলিই একটা দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারাই হ'ল ন্যায় ও সত্যের জাগ্রত প্রহরী। মানবীয় একনায়কতন্ত্র যেখানে, সেখানে এই লোকগুলিকেই ঘায়েল করার চেষ্টা করা হয় সর্ব্বপ্রথম। একনায়কতন্ত্রে সাত্বত সমালোচনাও বর্ব্বরোচিত শাস্তির খড়্গাঘাত থেকে রেহাই পায় না। পরমত-অসহিষ্ণুতা, সকলের সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতা, এবং অর্থবল ও পশুবলের সাহায্যে সকলকে পদানত ক'রে একক সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব কায়েম রাখার প্রচেষ্টা একনায়কতন্ত্রের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা। এইজন্য একনায়কতন্ত্র জনগণের অন্তরতম সহযোগিতা ও সমর্থনলাভ করে কমই। ভীতি, জবরদস্তি বা প্রলোভন কাউকেই নন্দিত, তৃপ্ত বা দীপ্ত করে না। নেতৃশক্তি যদি দাম্ভিক, ক্রোধী, নিষ্ঠুর, মদগর্ব্বী, অত্যাচারী ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়, তাহ'লে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী লোক ছাড়া স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণ ঐ সরকারের অবসানই কামনা করে। এতে সামরিক শক্তি, পুলিশী-শক্তি, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও

গুপ্তচরবাহিনীর তৎপরতা ও অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও জনসমর্থন হারিয়ে রাষ্ট্র দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রে সাধারণতঃ মৌলিক মানব-অধিকার ও মানব-স্বাধীনতা অল্পবিস্তর উপেক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক অধিকার বিপন্ন না হ'লেও, রাজনৈতিক অধিকার বিপন্ন হয়। কিন্তু নেতা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সেবা দিয়ে চলেন এবং তাঁর নীতি যদি কল্যাণকর হয়, তাহ'লে জনমনে তিনি স্থান পেতে পারেন। তবে যিনি যতই শক্তিমান হ'ন না কেন, যতই দক্ষ হ'ন না কেন, যতই সেবা-দান করুন না কেন, মানুষের অহং-এ আঘাত করা যদি তাঁর স্বভাব হয়, তাহ'লে তাঁর পতন অনিবার্য্য। মানবীয় একনায়কতন্ত্র দীর্ঘকাল কোথাও সাফল্যলাভ করে না। নিপীড়িত জনমত একদিন তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়ই। আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী সর্ব্বময় প্রভুত্বলিপ্সু, ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞাপরায়ণ, অসহিষ্ণু মনোবৃত্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিকতার লক্ষণ নয়। ঐ মানসিকতার তাড়নায় কেউ যদি দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা মহানায়কও হ'য়ে ওঠে, তাহ'লেও মহাকালের বিচারে শেষপর্য্যন্ত তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়—ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

একনায়কত্বের উপযোগিতা

কোন-কোন লোক নিরভিমান, প্রীতিপ্রাণ, বুদ্ধিদীপ্ত, সেবা পরিচালনা-চাতুর্য্য ও সংগঠন-প্রতিভার গুণে জন-মনে প্রভুত্ব করেন। বিশেষ সঙ্কটের সময়ে জনগণের আবাহনে তিনি যদি একচ্ছত্র ক্ষমতার আসন গ্রহণ করেন এবং অর্থ, সুখ-সুবিধা ও ক্ষমতা যদি তাঁকে প্রমত্ত ও প্রমাদী না করে, তবে সঙ্কটকালীন সাময়িক ঐ একনায়কতন্ত্র সুফলপ্রসূই হ'য়ে থাকে। নায়ক যদি দক্ষ ও সৎ হন তবে একনায়কতন্ত্রে যে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে মঙ্গলকর সিদ্ধান্ত গৃহীত ও রূপায়িত হ'তে পারে এবং তাতে দেশের সংহতি, উন্নতি ও নিরাপত্তা যে সুনিশ্চিত হ'তে পারে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একনায়কতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কুফল

কিন্তু দীর্ঘকাল একনায়কতন্ত্রী শাসন চালু থাকা মঙ্গলকর নয়। কারণ, অপরিবর্ত্তনীয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সাধারণ মানুষকে নিঃশেষে কলুষিত করে। তাই, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত যিনি, তাঁর জানা থাকা ভাল যে, তিনি জাতির পক্ষে

অপরিহার্য্য ব্যক্তি নন এবং তাঁর গর্ব্বেপ্সু নেতৃত্বমোহকে চিরকাল অক্ষত রাখবার জন্য জাতির সৃষ্টি হয়নি। জাতীয়-ইতিহাসের সাত্বত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কালের ইঙ্গিত-অনুযায়ী তাঁকে নির্লিপ্তভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে স'রে দাঁড়াতে হবে। তিনি যে তাঁর যোগ্যতা দিয়ে দেশকে সেবা করার সুযোগ ও অধিকার পেয়েছেন, সেই তাঁর মহা-সৌভাগ্য। সাধারণ মানুষ তার ভালমন্দ-মিশ্রিত প্রকৃতির দাস। সে ভাল যেমন করে, মন্দও করে তেমনি। তার ভাল করার শক্তিও যেমন কম, মন্দ করার শক্তিও তেমনি কম। কিন্তু নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী কোন শক্তিধর মানুষ যদি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাহ'লে তাঁকে দিয়ে লোকের অশেষ ক্ষতি সাধিত হ'তে পারে। তিনি জাতির যতই মঙ্গল ক'রে থাকুন না কেন, সেই অজুহাতে তাঁকে অবাধে অমঙ্গল করতে দেওয়া চলে না। অপরের অমঙ্গল করাটা অপরাধ। অপরাধ মানে সমাজবিরোধী আচরণ। সমাজ যদি তা' রুদ্ধ করার ব্যবস্থা না করে, তবে ঐ অপরাধ একদিন সমাজকে গলা টিপে মারবে। দূষিত ক্ষতের নিরাকরণ না করলে সারাদেহেই তা' বিস্তারলাভ করে।

পারিবারিক জীবনে আদর্শ একনায়কতন্ত্রের নিদর্শন

কতকগুলি পরিবারে আমরা একনায়কতন্ত্রের সার্থক প্রয়োগ দেখতে পেয়েছি। সাধারণতঃ দেখেছি যে সে-সব পরিবারের অভিভাবক অত্যন্ত দরদী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, সহ্য-ধৈর্য্যশীল, ব্যক্তিত্বশালী অথচ নিরভিমান, সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সমীহের পাত্র। পরিবারের সকলের সঙ্গেই তাঁর প্রাণের যোগ, পরিবারের প্রত্যেকেই মনে করে তিনি তাকে সবচাইতে বেশি ভালবাসেন, তাঁর খুশির জন্য সকলেই প্রভূত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। আবার, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে পরিবারের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবন্ধনও খুব দৃঢ় হয়। এমনতর এককেন্দ্রিক সুসংহত পরিবারগুলি দেখলে মনে হয় রাষ্ট্র যদি এইভাবে গ'ড়ে ওঠে, তাহ'লে কত সুন্দরই না হয়। তবে ঐ ধরণের দেবদুর্লভ চরিত্রসম্পন্ন স্বভাবসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতা ইচ্ছা করলেই তো পাওয়া যায় না। বিশেষ জন্মগত সম্পদ না থাকলে মানুষ ঐভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে না। তাই, দোষগুণসম্পন্ন সাধারণ মানুষ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে সাত্বত গণতন্ত্রই সর্ব্বোত্তম রাষ্ট্রবিধান। ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও প্রশংসনীয়।

গণতন্ত্র

গণতন্ত্রের প্রধান গুণ এই যে, তা' সুস্থমস্তিষ্ক প্রতিটি ব্যক্তির মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতিদান সভ্যতার একটি রাজলক্ষণ। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক সরকার জনতার দ্বারা নির্ব্বাচিত ও তার নিকট দায়ী ব'লে জনস্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে সহজে স্বৈরাচারীরূপ ধারণ করতে সাহস পায় না। কোন ক্ষমতাসীন দল তেমন হ'লে তাদের শাসন দীর্ঘদিন স্থায়ী হ'তে পারে না। কারণ, সচেতন জনসাধারণের হাতে তার প্রতিকারের ক্ষমতা থাকে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকলেও, সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিরোধী দল গঠন এবং সরকারের সমালোচনা করার অধিকার থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, স্বার্থ ও অধিকার যাতে বিপন্ন না হয়, তার জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকে। উদারতা, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, পক্ষপাতশূন্য বিহিত সার্ব্বজনীন সুযোগ ও অধিকার, প্রগতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগঠন ও জনকল্যাণকর বিভিন্ন মতবাদ প্রচারের স্বাধীনতা থাকে। জনমতগঠন ও গণসমর্থন লাভের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই উঠে-প'ড়ে লাগে। কারণ, সাধারণ নির্ব্বাচনে বিপুল সাফল্যলাভ করতে না পারলে কোন দলই সরকার গঠন করতে পারে না।

গণতন্ত্রের সঙ্কট

ভোটদানের অধিকার তাই জনসাধারণের একটি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার। এই অধিকারের সদ্ব্যবহারের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। কিন্তু ভোটারদের নৈতিক মান যদি উন্নত না হয়, রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধ যদি বিকশিত না হয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা যদি না বাড়ে, দারিদ্র্য যদি দূরীভূত না হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা যদি না কমে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্রপ্রার্থীদের অজস্র রকমের অবিবেকী চক্রান্ত ও অপকৌশল যদি নিবারিত না হয়, তবে ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার হওয়া সম্ভব নয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন। সাধারণ ভোটারদের বহুপ্রকারের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ও অহিতকর ভেদবুদ্ধি ও বিরোধবুদ্ধি থাকে। এইগুলি সাধারণতঃ জাতীয়তাবোধ, সমষ্টিস্বার্থ ও সংহতির

বিরোধী। ভোটপ্রার্থীরা অনেকসময় এগুলির নিরসনের চেষ্টা না ক'রে এই দুর্ব্বলতাগুলিতে ইন্ধন যুগিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করেন। এর ফলে দেখা যায়—নির্ব্বাচনী প্রচার উপলক্ষ্য ক'রে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ, গণ্ডীস্বার্থ, শ্রেণীবিদ্বেষ, বর্ণ ও জাতিবিরোধ, ভাষা সমস্যা, দলীয় ও অন্তর্দলীয় নিন্দাবাদ, কলহ্ ও শত্রুতা, কুৎসিত উপায়ের আশ্রয়গ্রহণ, দ্বেষ, হিংসা, বলপ্রয়োগ, টাকা দিয়ে ভোট কেনা, সমাজবিরোধী লোককে প্রশ্রয় ও উৎসাহদান, বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার, মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদান, আত্মসমীক্ষণ-বিমুখতা ইত্যাদি বিশেষভাবে বেড়ে যায়। সাধারণত লোকের রাজনৈতিক চেতনা ও বিচারবুদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্ত্তে তাদের বিভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতাই বৃদ্ধি পায়। দেখা যায়, যে-দলের অর্থবল ও সংগঠন জোরদার সেই দলই প্রায় জয়ী হয়। আর যে-দল ক্ষমতার আসন অধিকার করে, সে-দল ঐ ক্ষমতার বলে তাদের দলীয় স্বার্থকেই পুষ্ট করতে চেষ্টা করে এবং তাকেই জাতীয়স্বার্থ ব'লে ব্যাখ্যা করে। ক্ষমতাসীন দল আবার দলরক্ষার স্বার্থে বহু শক্তিমান, স্বার্থান্ধ, দুষ্ট, সমাজবিরোধী লোককে শাসন না ক'রে পালন-পোষণ ক'রে থাকে। আবার, ঐ একই স্বার্থে জনকল্যাণকামী ভিন্নদলীয় রাজনৈতিক কর্ম্মীদের নানা অছিলায় নির্য্যাতন করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এমতাবস্থায় সুশাসন ও সংহতি স্বতঃই ব্যাহত হয়।

ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র

আর একটা ঐতিহাসিক সত্য এই যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করতে পারে না। কারণ, এতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয় ধনিকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং ঐ ক্ষমতার সাহায্যে তাঁরা কিংবা তাঁদের স্বার্থসেবী ঈঙ্গিত কোন দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার ক'রে কলে-কৌশলে ধনিকশ্রেণীর শোষণের পথ উন্মুক্ত রাখতে সহায়তা করেন। আজকাল কোন-কোন দল বিদেশের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ ক'রেও ভোটযুদ্ধে জয়ী হ'তে চেষ্টা করেন ব'লে শোনা যায়। এর ফল জাতীয়-জীবনের পক্ষে কখনও ভাল হয় না। যাহোক, সাধারণ মানুষকে ভোট দান ও দলগঠনের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া ভাল, কিন্তু উৎপাদন ও উপার্জ্জনের উপায়, উপকরণ ও উপাদানগুলির মালিকানা থেকে তাদিগকে বঞ্চিত ক'রে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাপারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদিগকে যদি ব্যক্তিগত মুনাফাশিকারী মুষ্টিমেয় ধনিক ও মালিকের

কৃপাপ্রার্থী ক'রে রাখা হয় সেখানে আর যা'হোক সামাজিক ন্যায়বিচার, বিহিত সাম্য, মৈত্রী, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তির মর্য্যাদা ইত্যাদি থাকতে পারে না। আর, এইগুলিই হ'ল গণতন্ত্রের প্রাণ। উৎপাদন ও উপভোগের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রশ্রয় দেয় গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের জঠর থেকে জন্ম নেয় ধনতন্ত্র। গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র যখন একযোগে সমাজ-বিরোধী-ভূমিকা গ্রহণ করে, গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র দুইয়েরই তখন মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়। গণতন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার থাকে, এইকথা বলা হ'লেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যায়—মাঝে-মাঝে কতকগুলি অবিবেকী দুষ্ট স্বার্থপর লোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশেষ ক্ষমতার আসন অধিকার ক'রে অপরের সঙ্গে যোগসাজশে ছলে-বলে-কৌশলে জনস্বার্থকে বিপন্ন ক'রে নিজেদের হীনস্বার্থ ও খেয়াল চরিতার্থ করতে কসুর করে না। এই জনপ্রতিনিধিগণ যদি সুনিয়ন্ত্রিত, সুযোগ্য, নির্লোভ, নির্ভীক, আদর্শপ্রাণ, ত্যাগী ও সেবাব্রতী না হন, তবে গণতন্ত্রের পক্ষে তা' সমূহ বিপদেরই কথা। এতে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থাই বিচলিত হ'য়ে পড়ে।

সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়

তাছাড়া, গণতন্ত্র যদি মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়, তাহ'লে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রসূত ধনতান্ত্রিকতার প্রতিবিধানকল্পে সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুদয় অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে। ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় জমিজায়গা, কলকারখানা, খনি, রেলপথ, বিদ্যুৎ, কাঁচামাল, মূলধন, বাড়িঘর, আসবাবপত্র, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদন ও উপার্জ্জনের প্রধান উপাদানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তিগত লাভের জন্য পরিচালিত হয় ব'লে প্রচণ্ড ধনবৈষম্য, শ্রেণীবিরোধ, বেকারসমস্যা, অসম-উৎপাদন ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে। সমাজতন্ত্রবাদীরা তাই, ঐ ধরণের আত্মস্বার্থসর্ব্বস্ব মালিকানা, উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রবর্ত্তন ক'রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে সামাজিক প্রয়োজন-অনুযায়ী উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা চালু করতে প্রয়াস পান। এতে সাধারণের অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য যে বাড়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সশস্ত্র বিপ্লব

কিন্তু সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের পথে প্রায়ই দেখা যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইনের সাহায্যে তা' যথাযথভাবে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে না; কারণ, স্বার্থপর কায়েমী স্বার্থের কারসাজির অন্ত নেই। তা'ছাড়া লোকপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎকোচ ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বশীভূত করা ধনিকদের পক্ষে কিছুই কঠিন হয় না। এইসব কারণে বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদীরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে জোর ক'রে ধনিক ও মালিক শ্রেণীকে উৎখাত ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার পক্ষপাতী। সমাজতন্ত্রবাদিগণ শুধু উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কিন্তু সাম্যবাদিগণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের সমর্থক।

সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্রের দোষগুণ

সাম্যবাদী রাষ্ট্র আবার শাসিত হয় একটি মাত্র দল কর্ত্তৃক, যে-দলে সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, মুষ্টিমেয় লোক শাসন-ব্যবস্থা হাতে নিয়ে বলপ্রয়োগে জনমণ্ডলীকে সাম্যবাদী ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করে। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে দলীয় সংহতি, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে যে-কোন নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করা হ'য়ে থাকে। নেতৃত্ব বা নেতৃত্বের অনুসৃত নীতির মধ্যে ভুলত্রুটি যাই থাক না কেন, তার সমালোচনা করা চলে না। অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন করতে দেওয়া হয় না। বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব'লে কোন জিনিস সাম্যবাদী রাষ্ট্রে থাকে না। ব্যক্তির স্বাধিকার লোপ ক'রে ব্যষ্টিসমন্বিত সমষ্টির সার্ব্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন কিভাবে সাধিত হ'তে পারে তা' চিন্তার বিষয়। জন নিয়ে জাতি। তাই, প্রতিটি ব্যক্তির আদর্শানুগ সমাজকল্যাণসংগত সর্ব্বতোমুখী সাত্বত স্বাধীনতার ব্যবস্থা যদি না হয় তাহ'লে জাতীয় স্বাধীনতা অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রকে সর্ব্বশক্তিমান ক'রে তুলে রাষ্ট্রের হাতে মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্রনিয়ন্তাগণ যে ভুল, অন্যায় ও অবিচার করবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? রাষ্ট্র যে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার বৈশিষ্ট্য, রুচি ও জন্মগত সংস্কার-অনুযায়ী পরিচালিত করবে, তার ব্যবস্থা কোথায়? ইচ্ছানুযায়ী

সৎভাবে কাজকর্ম্ম, উপার্জ্জন ও উপভোগ করার স্বাধীনতা যদি না থাকে, প্রতি পদক্ষেপে মানুষের জীবন যদি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ চলতে থাকে, তবে সেই বন্ধনবিড়ম্বিত যান্ত্রিক জীবনে মানুষের প্রেরণা ও সুখ কোথায়? ইষ্ট, ধর্ম্ম, দীক্ষা ও কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অনুশাসন দিয়ে যেখানে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা, সেখানে মানুষের অন্তরজীবন ও বৃত্তি-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করার পথ কোথায়? নিছক বস্তুতন্ত্রবাদী আদর্শ, দর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের আত্মিক বিবর্ত্তনকে ব্যাহত করে কিনা তাও ভাববার বিষয়। কারণ, স্বতঃস্বেচ্ছ ঈশ্বরানুরাগপ্রসূত মানবপ্রীতিই আত্মিকতাপ্রবুদ্ধ সামাজিক সঙ্গতির প্রাণ। তার উদ্বোধনের চেষ্টা না ক'রে ভীতির শাসন ও জবরদস্তির ভিতর দিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে সামাজিক সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহ'লে উৎসাহ ও অনুশীলনের অভাবে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক জীবনে কি একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয় না? অবশ্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমষ্টিগত স্বার্থের পথ প্রশস্ততর হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার ফলে মানুষ বেকারত্ব, অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অনিশ্চয়তা এবং দারিদ্র্য ও অভাবের ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয় এবং জনসাধারণের পক্ষে এটা নিতান্ত কম আশ্বাসের কথা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ামকতায় পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত পরমত-অসহিষ্ণু মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা গঠিত একটিমাত্র সর্ব্বেসর্ব্বা দলের শাসনে জনসাধারণ যে রাজনৈতিক অধিকার ও সমীচীন বৈশিষ্ট্যানুসরণ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়, তা' অবধারিত।

ধর্ম্ম, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সমন্বিত বিকল্প ব্যবস্থা

তাই, ধর্ম্ম, ইষ্ট, দীক্ষা, কৃষ্টি, অতীত ঐতিহ্য, সুবিবাহ, সুজনন, সুশিক্ষা, বৈশিষ্ট্যসম্মত সমাজকল্যাণমূলক জীবিকা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি-উন্নয়নের ভিত্তির উপর রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে মানুষগুলি স্বতঃই সুনিয়ন্ত্রিত, যোগ্য ও ইষ্টস্বার্থী তথা সমাজস্বার্থী হয়। এতে জাতীয় জীবনের ভিত তলা থেকে শক্ত হ'য়ে গেঁথে ওঠে। অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠলে এবং মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বতঃস্ফূর্ত্ত মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লে জাতির আর কোন ভাবনা নেই। তারপর মৌলিক, ভারী ও বৃহৎশিল্প ও অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবসায়গুলি রাষ্ট্রায়ত্ত

করা চলতে পারে। তাছাড়া, ছোট-ছোট গার্হস্থ্য যন্ত্র ও শক্তি-সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে উৎপাদন-পদ্ধতিকে এমন সহজ, সরল ও বিকেন্দ্রীকৃত ক'রে দিতে হবে যাতে পরিবারে-পরিবারে শিল্প গ'ড়ে ওঠে এবং দেশের শ্রমশক্তি ও যোগ্যতার অপব্যবহার না হয় এবং দেশে দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যা না থাকে। গৃহে-গৃহে যেসব কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় গ'ড়ে উঠবে, সমগ্র পরিবারই হবে তার মালিক। গৃহের লোকজন একই সঙ্গে হবে শ্রমিক ও মালিক। তাই, শ্রমিক-মালিক বিরোধের কোন প্রশ্ন থাকবে না। বাইরের কোন শ্রমিক এইসব প্রতিষ্ঠানে না নেওয়াই ভাল। কোন শ্রমিক নিলে তার উপর কোন অবিচার করা চলবে না। পারিবারিক শিল্পের প্রসার হ'লে উৎপাদন ও উপার্জ্জনের উপাদান ও উপায় পরিবারগুলির আয়ত্তাধীন থাকবে। তাতে কেন্দ্রীভূত বিপুল মূলধন, বৃহৎ যন্ত্র ও অতিকায় ব্যবস্থাপনা-সমন্বিত অবিমিশ্র সমাজতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থাপ্রসূত অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে বহু মানুষ রক্ষা পাবে। আয়ত্ত-বহির্ভূত বিশাল যন্ত্রদানবের প্রভাবমুক্ত হ'য়ে তাদের মানবীয় সত্তা যন্ত্রাভিভূতির যন্ত্রণা থেকে বাঁচবে। পারিবারিক কৃষিশিল্পের আওতায় পরিবারের বিভিন্ন লোক তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা-অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার বিশিষ্ট প্রয়োজন-অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার বিশিষ্ট প্রয়োজন-অনুযায়ী কাজ পাবে। একেই বলা যায় আদর্শ সাম্যসঙ্গত বন্টন। অবশ্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাতে শোষণ ও সামাজিক অনৈক্য, বিরোধ, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কারণ হ'য়ে উঠতে না পারে, তেমনতর ব্যবস্থা চাই। ইষ্টীপূত সমাজকল্যাণকর বিনিয়োগ চাই যা-কিছুর। তাই, সুসমন্বিত সর্ব্বাঙ্গীণ সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে যুগপৎ প্রত্যেকের মানবিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার ও আত্মিক অধিকার অব্যাহত রাখা অসম্ভব নয়। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, ইষ্টানুসরণ আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংগঠনমূলক আচরণ, সাত্বত যাজন ও অসৎনিরোধ বাদ দিয়ে কোন বিধি-ব্যবস্থাই সম্যক কার্য্যকরী হ'তে পারে না। ধর্ম্ম ও কৃষ্টিশাসিত সমাজ রাষ্ট্রের রাজমুকুট। কারণ, সেই সমাজ এমনতর চরিত্রবান মানুষের সৃষ্টি করে যারা সমগ্র জাতি এবং অখণ্ড মানবসমাজের কল্যাণের হোতা হ'য়ে ওঠে। আমরা ইষ্টহীন, বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত ও সমাজবিমুখ ব্যক্তিজীবনের কল্পনাই করি না। ইষ্টনিষ্ঠা, বৈশিষ্ট্যানুসরণ ও সমাজকল্যাণপ্রচেষ্টা

এই তিনটের কোন একটা বাদ পড়লে মানুষের বোধ, চলন ও ব্যক্তিত্ব বিকৃতিমুখী হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি যাতে ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে নিজ-বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিবেশকে সত্তাসম্বর্দ্ধনী সেবা জুগিয়ে চলে, সেইভাবে তাকে গঠিত ক'রে তোলাই পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব। সুবিবাহ ও সুজননের সঙ্গে-সঙ্গে এই মূল দিকে লক্ষ্য রাখলে সমাজস্বার্থ, জাতীয়-স্বার্থ ও বিশ্বস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার মত চরিত্র-সম্পন্ন মানুষের অভাব হবে না। বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, একসূত্র-সঙ্গতিশীল, অখণ্ড আদর্শের পথে চলাই অখণ্ড ব্যক্তি, অখণ্ড জাতি ও অখণ্ড জগৎ গড়ার সহজতম পথ।

গণপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক দল

তাই, গণপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন করার সময় বিশেষভাবে দেখতে হবে যাতে তাঁরা ধর্ম্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টিনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, সেবাপ্রাণ, উদার, ত্যাগী, সংযত, সৎ, নির্লোভ, নির্ভীক ও ব্যক্তিত্ববান হন। কোন প্রলোভন বা ভয়ে তাঁরা যেন আদর্শচ্যুত না হন। যিনি যে-কোন দলভুক্ত হউন না কেন, এই গুণগুলি প্রত্যেকেরই থাকা চাই। স্বার্থলোলুপ, নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত, ভাগ্যান্বেষী কোন মতলববাজ লোক যেন নির্ব্বাচিত হবার সুযোগ না পায়। আর, তেমন কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয় যারা সমষ্টিস্বার্থের বিনিময়ে গণ্ডী-স্বার্থী বা বিদেশের নীতি, নির্দ্দেশ ও স্বার্থের তল্পীবাহী ও যারা জাতীয় স্বার্থ, সংহতি, সংস্কৃতি ও কল্যাণের পরিপন্থী এবং বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির আদর্শে অবিশ্বাসী। জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে যাতে তারা বিচার ক'রে ভোট দিতে পারে। তাছাড়া, সরকার যাতে বিপথে চলতে না পারে, সেদিকেও তাদের সজাগ দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

রাষ্ট্রের কার্য্যক্রম

সমগ্র জাতির সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ যাতে হ'তে পারে তেমনতর সুসম্বদ্ধ, সর্ব্বতোমুখী পরিকল্পনা নিয়ে রাষ্ট্রকে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে হবে, আবার প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে ঐ পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে গেলে যেমন চাই সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন, কঠোরকর্ম্মা, কর্ত্তব্যপরায়ণ যোগ্য কর্ম্মচারী সংগ্রহ, আবার চাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সংযোগ, সমন্বয়, সহযোগিতা,

সমতানতা ও একসূত্রসঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে পারস্পরিক যোগাযোগে প্রতিটি করণীয় ক্ষিপ্রগতিতে সম্পাদন ক'রে লোকমঙ্গল ত্বরান্বিত করা। দেশের একটি মানুষও যাতে অনাহারে না থাকে, বেকার না থাকে, রোগে অচিকিৎসিত না থাকে, অশিক্ষিত না থাকে, অযোগ্য না থাকে, অসহায় না থাকে, সেদিকে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য দিতে হবে। দরিদ্রদের উন্নতির জন্য ধনীদের প্রতি প্রয়োজনমত কঠোর হ'তে হবে। আবার, দরিদ্রদের মধ্যে যারা শ্রমবিমুখ ও অলস, তাদের জোর ক'রে কাজে লাগাতে হবে। অসাধু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। রাজনৈতিক কর্ম্মী ও সরকারী কর্ম্মচারিগণ দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ করলে তাদের গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। জনসাধারণকে এমনভাবে গঠিত করতে হবে যাতে তারা সমাজকল্যাণ ও সমাজস্বার্থের জাগ্রত প্রহরীস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। তাই, যুগপৎ চাই, সত্তাচর্য্যা ও অসৎনিরোধী প্রচেষ্টা।

আইন-প্রণয়ন

আন্তর্জাতিক আইন এবং দেশের সংবিধান ও দেশীয় আইনপ্রণয়নের বেলায় দেখতে হবে যাতে অদূরদর্শিতাবশতঃ মানুষের বাঁচা-বাড়া, সাত্বত ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ব্যাহত হ'তে পারে এমন কোন বিধান তৈরি না হয়। সুবিবাহ ও সুজনন মানবজাতির মৌলিক প্রয়োজন, এই দুটি জিনিস যাতে অব্যাহত থাকে, সেদিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে চলতে হবে। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ প্রতিলোম-বিবাহ নিরুদ্ধ হ'লেও অনুলোমক্রমে সমাজ যাতে সংহত আত্মবিস্তারের পথে চলে তার ব্যবস্থা চাই-ই। অপকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করতে হবে, উৎকৃষ্টকে অপকৃষ্ট করা চলবে না। লোকনিয়োগের সময় দেখতে হবে যাতে প্রত্যেকে তার জন্মগত সম্ভাব্যতা, সংস্কার ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত হয়। এতে শাসন-সংস্থার কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। জনসাধারণের শিক্ষা ও জীবিকাও ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও বিরোধী দলের ভূমিকা

রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য হচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ। দেশের পুলিশবিভাগ ও বিচারবিভাগ নিরপেক্ষ, সৎ ও দক্ষ না হ'লে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন। সৎলোক যদি নির্য্যাতিত হয়

এবং অপরাধী যদি টাকার জোরে বা খুঁটোর জোরে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়, তাহ'লে আইনের কোন মর্য্যাদা থাকে না। সরকারের জানা উচিত যে সৎশক্তি যদি মর্য্যাদা ও প্রাধান্য না পায় তবে অসৎশক্তি সেই শূন্যস্থান অধিকার ক'রে সরকারকেই বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে। তাই শিষ্টের পালন, পোষণ ও সম্মান ও দুষ্টের শাস্তিবিধান চাই-ই। অবশ্য, শাস্তি নিষ্ঠুরতামূলক না হ'য়ে সংশোধনমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার, বিবাহ ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবন, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ-পরিবেশ ও শাসনসংস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে অপরাধীর সংখ্যা দেশে বিশেষ বাড়তে না পারে। যারা জন্মগত অপরাধপ্রবণতা নিয়ে জন্মায় তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। গুপ্তচর বিভাগকে বিশেষ সজাগ থাকতে হবে যাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অন্তর্ঘাতমূলক কার্য্যকলাপ মাথা তোলা দিতে না পারে। অবশ্য সরকারের দোষত্রুটি থাকলে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিরোধীদলের আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারপক্ষের নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করবেন যাতে বিশেষ-বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে তিনি বিরোধীদলের সৎপরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করতে পারেন। এতে ঐক্য ও শৃঙ্খলার আবহাওয়া পুষ্ট হ'তে পারে। অবশ্য, প্রত্যেক দলেরই চাই দলীয় স্বার্থের চাইতে জাতীয় স্বার্থকে বড় ক'রে দেখা।

প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ও বিশ্বশান্তির অনুকূল পরিবেশ গঠন

প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে বিহিত প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে যুদ্ধ এড়িয়ে চলা যায়। প্রত্যেক দেশ যাতে প্রত্যেক দেশের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে, বিশ্বশান্তির অনুকূল তেমনতর একটা বিশ্বপরিবেশ গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বাদ-দ্বন্দ্ব, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও প্রবৃত্তি-দ্বন্দ্বের উপরে একটা জিনিস আছে মানুষের, সেটা হচ্ছে অস্তিত্ব-সংরক্ষণ। সেই সর্ব্বস্বার্থ-সমাধানী বিশ্বসত্তাসংরক্ষণী আদর্শের বাণী নিয়ে আমরা দেশ-বিদেশের ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ব, এবং দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর মধ্যে এক নূতন সর্ব্বস্বার্থী ভাগবত দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালী সঞ্চারিত ক'রে দেব। এ-ছাড়া বিশ্ববিধ্বংসী আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, মেগাটন বোমা ও মিসাইল-বহুল ছিন্নমস্তা সভ্যতার যুগে নিজেরা বাঁচা ও জগৎকে বাঁচাবার কোন

পথ নেই। আজ আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, চায়না প্রভৃতি আণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলির কোন একটি দেশের মুহূর্ত্তের হঠকারিতার ফলে সারা পৃথিবী থেকে মানুষজাতি তার লাখো-লাখো বৎসরের সাধনায় গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি-সহ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারে। যদি কিছু লোক বেঁচে থাকে তারাও তেজস্ক্রিয়তার বিষাক্ত প্রভাবে বংশপরম্পরায় দুরূহ রোগব্যাধির কবলে পড়বে, এবং বায়ুমণ্ডল ও খাদ্যদ্রব্যাদি বিষদুষ্ট হ'য়ে থাকায় পদে-পদে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন সঙ্কট আর কোনদিন আসেনি। তাই, আজ বিশ্বপিতার অমরণমন্ত্র সর্ব্বত্র বিলিয়ে দেবার পূত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে দেবভূমি ভারতকে। আর, চেষ্টা করতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ধ্বংসাত্মক আণবিক শক্তিকে নিষ্ফল ক'রে দেবার মত কোন শুভজনক মহাশক্তি আবিষ্কার করা যায় কিনা। অগ্নি যত প্রচণ্ডই হোক তা' যেমন জলে নির্ব্বাপিত হ'তে পারে, ধ্বংসাত্মক আণবিক শক্তিকে অকার্য্যকর ক'রে দেবার মতও তেমন কোন কৌশল আবিষ্কৃত হ'তে পারে।

জাতীয় সংহতি

জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাতীয়-সংহতি, ঐক্য ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু এই ঐক্য হওয়া চাই বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য-সমন্বিত। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে বরবাদ করতে গেলে গণতন্ত্র বা ঐক্যের কোন মানে হয় না। সে হয় নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক একাকারতা। বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য-পরিপালী ঐক্য-বিধায়নী সর্ব্বপরিপূরক মূর্ত্ত আদর্শকে অবলম্বন ক'রে এই কাজটি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হ'তে পারে। তাতে শুধু জাতীয় জীবনই ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত হয় না, আন্তর্জাতিক জীবনও ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত হয়।

বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের সংগঠন

প্রকৃত আদর্শপ্রাণ, বোধবান মানুষ মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে যে, পৃথিবীর সবগুলি মানুষের জীবন মিলিয়ে যেন একটা জীবন। সবার মধ্য-দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এক অভিন্ন অখণ্ড প্রাণস্রোত। কাউকে বাদ দিয়ে কারও ভাল-থাকার জো নেই। ঈশ্বরীয় আদর্শকে ভালবেসে প্রত্যেকের প্রত্যেককে ধারণ, পালন, সহন, বহন, সেবা, সাহায্য, সহযেগিতা ও সম্বর্দ্ধনা ক'রে চলতে হবে। সকলের জন্য

সকলকে ভাবতে হবে, করতে হবে। পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতা ও সত্তাচর্য্যাকে অপরিহার্য্য আত্মসংরক্ষণী স্বার্থ ক'রে নিয়ে চলতে হবে। এই আচার ও প্রচারের ক্রমাগতি ও প্রাবল্য দিয়ে মনুষ্যজাতির একাংশের মনন ও চলন আমূল পালটে দিতে হবে। তারই ফলে পৃথিবীতে এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যেদিন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক রাষ্ট্র তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও এক বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের নূতন জগৎ ও নূতন সমাজ গঠনের দিকে অগ্রসর হ'তে হবে। পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে আজ চিন্তার সঙ্কট, চরিত্রের সঙ্কট, নেতৃত্বের সঙ্কট। তা' দূরীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে যাতে পারস্পরিক আদান-প্রদান, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকের সাত্বত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

সার্থক কূটনীতি

দেশের কূটনীতিক নেতা যাঁরা, তাঁরা সকলের সঙ্গে বান্ধব-বন্ধন সৃষ্টি ক'রে এমন দূরদর্শী, দক্ষ, চতুর, সর্ব্বতোমুখী, সজাগ ব্যবস্থিতি ও প্রস্তুতির জাল বিছিয়ে চলবেন যাতে দেশের বা বিদেশের যে-কোন চক্রান্ত বা আক্রমণকে সুরুতেই ত্বরিত-তৎপরতায় খতম ক'রে দেওয়া যায়। আর, তার ভিতর-দিয়ে পরাক্রম ও কূটকৌশলের এমন জেল্লা ঠিকরে বেরুন চাই যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ কখনও এই দেশের ক্ষতি করার কল্পনা করতে সাহস না পায়।

মানবজাতির কাম্য

আমরা যে স্বদেশের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রের কল্যাণ, উন্নতি ও পারস্পরিক শুভ সম্পর্ক কামনা করি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে শান্তি, সমৃদ্ধি, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, স্বাধীনতা ও প্রগতির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হ'তে পারে। মানুষের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আত্মিক বিকাশ যাতে একযোগে সম্ভব হ'তে পারে। আমরা চাই ঈশ্বরৈকলক্ষ্য আত্মনিবেদন, আত্মশুদ্ধি ও সাত্বত বিবর্ত্তনের বিপ্লব, যাতে মানুষের গোটা জীবনটা যোগযুক্ত সেবা ও সক্রিয় ইষ্টতন্ময়তার আনন্দে বিভোর হ'য়ে কেটে যায়। বিংশ শতাব্দী যদি প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারে, কর্ম্মযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি

করতে না পারে, আত্মজ্ঞানীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারে, বৈশিষ্ট্যজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারে, স্মৃতিবাহী চেতনাকে আয়ত্তে আনার পথে অগ্রসর হ'তে না পারে, দেবজাতি গঠনের বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে না পারে, তবে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কাজ হ'ল মহত্তর জীবন-গঠনের সহায়তা করা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই হবে তার সাফল্যের বিচার। স্রষ্টার চরণে জগতের শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে সুকেন্দ্রিক আদর্শচরিত্র মানব। তারই জন্য তিনি তৃষিত হ'য়ে থাকেন।

পরিশেষে আমরা আবার স্মরণ করি শ্রীশ্রীঠাকুরের যুগান্তকারী দিব্যবাণী—

আমাদের গন্তব্য

'আমাদের গন্তব্য হ'ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি—
ধারণ-পালন-সম্বেগ-সিদ্ধ-ব্যক্তিত্ব,
তার উপায় হচ্ছে আচার্য্যে সক্রিয় অনুরতি,
তার থেকে আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ,
পরিবার-নিয়ন্ত্রণ, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ;
আর, এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে
সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা ক'রে
সবটা নিয়ে বিবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলা,
আর, এই সবগুলিকে সার্থক ক'রে তোলা—ঈশ্বরে;
আর, প্রাপ্তির পরমবেদনা এই-ই।'

দর্শন

দর্শনের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ মননশীল জীব। সে অন্ধের মত চলতে চায় না। সে চায় পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের অনন্ত ঘটনারাজি ও স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যাবলীর মধ্যে একটি সঙ্গতির সূত্র খুঁজে পেতে। নইলে তার মন তৃপ্ত হয় না। মানুষ একটি অবিভাজ্য সত্তা, সেই সত্তার সম্বেগ তাকে নিয়ত প্রধাবিত করে বোধ, কর্ম্ম, ঈপ্সা, জ্ঞান ও প্রেমের রাজ্যে এক পরম অখণ্ড বোধায়নী ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে। বিচ্ছিন্ন নানাত্বকে সে যদি একার্থ-সার্থকতায় অর্থান্বিত ক'রে তুলতে না পারে, তাহ'লে তার ব্যক্তিসত্তাই যেন ছিন্ন ও খণ্ডিত হ'য়ে পড়ে। সে সুখ পায় না অন্তরে। মানুষের এই সামঞ্জস্য-সন্ধানী মূল কারণ-আবিষ্করণী, অন্তঃশীল পিপাসাই পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে দর্শনের। তার কারবার সত্য অর্থাৎ সত্তাকে নিয়ে। তাই, দর্শন যতই চরম ও পরমতত্ত্বের সন্ধানে রত থাকুক না, তা' হওয়া চাই বাস্তবতাসম্মত, জীবনসম্পৃক্ত, পারস্পরিক যোগসূত্র-নিবন্ধ, সর্ব্বসঙ্গতি-সম্পন্ন বিজ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রত্যয়-প্রদীপী।

প্রকৃত দর্শন

দর্শন মানে দেখা। যে-জ্ঞান প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বা অভিভূতিমুক্ত অপরোক্ষ অনুভূতি-সিদ্ধ নয়, যে-অভিজ্ঞতা সত্তায় সংগ্রথিত হয়নি—সুসঙ্গত সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণায়,—বিজ্ঞান, বাস্তবজীবন ও যুক্তির সঙ্গে যার যোগ নেই, যার প্রায়োগিক উপযোগিতা নেই, যা' বাস্তবতাবর্জ্জিত নিছক মানসকল্পনা বা অনুমানশাস্ত্রের জটিল জালে নিবদ্ধ তা' কিন্তু প্রকৃত দর্শন ব'লে গণ্য হবার যোগ্য নয়। দর্শন দেখাবে জীবনের পথ—ধারণারঙ্গিল আত্মগত ভাবালুতায় নয়, প্রতিক্রিয়াশীল, একদেশদর্শী, সাম্যসঙ্গতিহারা উগ্র উন্মাদনায়ও নয়, বরং মোহমুক্ত, সত্যনিষ্ঠ, ঊর্জ্জনাঋদ্ধ তত্ত্বদীপনায়,—বাস্তব তথ্যের সার্থক বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যায়,—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুবিন্যাসী সমন্বয়

সাধনে,—ব্যষ্টি ও সমষ্টির বৈশিষ্ট্যসম্মত ইষ্টানুগ সম্পূরণে। জগতের বুকে এই সামগ্রিক দৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য সাত্বত শক্তি ও সম্বেগ সঞ্চারের জন্য যুগপ্রয়োজনে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরমাণ তত্ত্বপুরুষের আবির্ভাব হয়। সঙ্কটকালে আবির্ভূত হ'য়ে তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের গতিপথ ও দিক নির্ধারণ ক'রে দিয়ে যান। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁকেই বলা যায়—দর্শনমূর্ত্তি।

মানুষের মূল সমস্যা ও তার সমাধান

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অপরোক্ষ উপলব্ধি-জাত সহজসুলভ সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে জটিল যুগজীবনের প্রতিটি বিষয়ের মর্ম্মকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ ক'রে আমাদের স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন—মনুষ্যপ্রকৃতির মূলতত্ত্ব ও স্বরূপ কী, তার চাহিদা কী এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের পটভূমিকায় পারস্পরিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সহকারে তা' পরিপূরিত হ'তে পারেই বা কেমনভাবে। মানুষের ব্যক্তিসত্তা আজ বৃত্তিপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে শতধা খণ্ডিত ও ক্ষতবিক্ষত। এই মানসিকতা নিয়ে সে নিজেও শান্তি পায় না, পরিবেশের সঙ্গেও সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে নিজ করণীয় ক'রে চলতে পারে না। এই মূল ব্যাধির দরুন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সর্ব্বক্ষেত্রে আজ বিরোধ, বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার ছড়াছড়ি। অর্থাভাব, অন্নাভাব, দারিদ্র্য, বেকারী, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মালিক-শ্রমিক বিরোধ, উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি, জাতীয় অনৈক্য, আন্তর্জাতিক অশান্তি ইত্যাদি সব-কিছুর পিছনে এটা একটা অন্যতম মূলীভূত প্রধান কারণ। তাই, চাই ব্যক্তিজীবন গঠন। ভালবাসার শক্তি ও প্রবণতা মানুষের জন্মগত সম্পদ। এই শক্তিকে সে যেখানে সক্রিয়ভাবে ন্যস্ত করে, সে তেমন হ'য়ে ওঠে। ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব, সর্ব্বপ্রেমী, বৈশিষ্ট্যপালী, সর্ব্বপূরয়মাণ কোন মানুষকে যদি সে জীবনের ধ্রুবতারা ব'লে গ্রহণ ক'রে তাঁর নীতি ও নির্দ্দেশ অনুসরণ ক'রে চলে, তাহ'লে সে কিন্তু নিজ-বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী বাড়তেও পারে এবং লোকস্বার্থীও হ'তে পারে। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট-সমীপে দীক্ষাগ্রহণ এবং তাঁর প্রতি অচ্যুত সক্রিয়-নিষ্ঠা নিয়ে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজের ও অপরের জীবনবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত ক'রে চলাই শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রবর্ত্তিত জীবনদর্শনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান নির্দ্দেশ। এর ভিতর-দিয়েই মানুষ অখণ্ড ও সর্ব্বসঙ্গতিশীল সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'তে পারে এবং ঈশ্বরৈকপ্রাণ বৈশিষ্ট্যপূরণী সমষ্টিগত মানব-সংহতি সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ

ধর্ম্মের বিষয় আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তবু একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাঁচা-বাড়ার জন্য যত রকম বিষয়ের বিকাশের প্রয়োজন তার কোন একটাকে অপুষ্ট রাখলে মানুষের বাঁচা-বাড়া কিন্তু সেই পরিমাণে ব্যাহত হবে। তাই, সূতিকাগার থেকে শ্মশান পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় সবকিছু উপাদান ও উপকরণকে ক্রমোন্নত ক'রে তুলতে হবে। অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎকে যত আমরা ঈপ্সিত রকমে রূপান্তরিত করি, ততই আমাদের জীবনের রূপান্তর বাস্তব ও সত্য হ'য়ে ওঠে। চাই অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গতি-সহকারে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অন্তর-বাহিরের একসূত্রসঙ্গত সার্ব্বিক কল্যাণ ও অভ্যুদয়। আর, শুধু আজকের দিনের কথা ভাবলে চলবে না। ভাবতে হবে সমাজের ভবিষ্যতের কথা। তার জন্য সুবিবাহ ও সুজনন অপরিহার্য্য প্রয়োজন। যেমন চাই অতন্দ্র তপস্যা, তেমনি চাই উন্নততর সংস্কার-সম্পন্ন সন্তান। কৃষ্টিগত ও জীববিজ্ঞানগত উত্তরাধিকারকে বংশপরম্পরায় ক্রমোন্নত ক'রে মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলতে হবে দেবদুর্লভ চরিত্র অর্জ্জনের দিকে। বিবাহ, শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের জন্মগত সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা ও তার পরিপোষণের দিকে নজর দিতে হবে। এই সব মূল বুনিয়াদ ঠিক রেখে শাশ্বত, ভাগবত বিশ্ববিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই সুরে সুর মিলিয়ে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ছন্দে যদি প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় যা'-কিছুর বিধিবিধান, সংগঠন ও পরিচালনা করা যায়, অসৎ-নিরোধকে সাবুদ ও সাবলীল রেখে, তাহ'লে প্রতিটি দেশে ও সমগ্র বিশ্বে সব্যষ্টি সমষ্টিজীবন সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, প্রজ্ঞা, প্রীতি ও পরাক্রমে উচ্ছল হ'য়ে চলতে পারে—স্বার্থ ও পরমার্থের শোভন আলিঙ্গনে। শ্রীশ্রীঠাকুর এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত, সার্ব্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনতন্ত্র রচনার বিধান দিয়েছেন—যার ফলে ঈশ্বর-নিষ্ঠ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত, সমাজতান্ত্রিক গণ-সংস্থিতির অভ্যুদয়ে সমগ্র মানবসমাজ অখণ্ড ঐক্য-বিধৃত হ'য়ে ওঠে।

জীবন-দর্শনের বাস্তবায়ন

প্রকৃত প্রস্তাবে যুগপুরুষোত্তমই হ'লেন এই অখণ্ড ঐক্য-উদ্বোধনী-জীবন-দর্শনের জাগ্রত, জীয়ন্ত প্রতীক এবং আমরা যদি চাই, তাহ'লে তাঁকে কেন্দ্র ক'রে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, সম্প্রদায়-বৈশিষ্ট্য, সমাজ-বৈশিষ্ট্য, জাতি-বৈশিষ্ট্য, দেশ-বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও পরিপূরণে এক মহামিলনে সংহত হ'তে পারে। তাতে একের বিনিময়ে অর্থাৎ একেকে শোষণ ক'রে অন্যে উন্নত হবে না। পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বদ্ধতায়, সহযোগিতায়, পোষণে, পূরণে, আদানে, প্রদানে, প্রতিটি ব্যষ্টি, প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি দল, প্রতিটি সমাজ, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি দেশ, প্রতিটি রাষ্ট্র, এককথায়—নিখিল-বিশ্ব যুগপৎ সর্ব্বতোমুখী অভ্যুদয়ের অভিযাত্রী হ'য়ে চলবে। এর পরিপন্থী যা', তার নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও পরস্পর বদ্ধপরিকর হবে। আর, সৎসঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে এই দিব্য কল্যাণকর প্রয়াসই উৎসারিত হ'য়ে চলেছে। তবে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ঋষিকে বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনায় আমরা ভ্রান্তি ও দুর্ব্বলতা এড়াতে পারব না।

সৃষ্টির মূলতত্ত্ব

সৎসঙ্গের মূল কথা এই যে, সৃষ্টির আদিতে আছে এক অদ্বয়শক্তি। আত্মিক-জগৎ ও বস্তু-জগৎ দুটি স্বতন্ত্র জগৎ নয়। স্থূল যা', তা' সূক্ষ্ম ও কারণশক্তিরই পরিণয়ন। কারণশক্তি স্থূল ও সূক্ষ্মেরই মূলীভূত হেতু। পরস্পরের মধ্যে আছে এক অচ্ছেদ্য যোগ। তাই, সূক্ষ্ম ও কারণের রাজ্যে যে যত প্রবেশ করে সে স্থূলকে তত বিশদভাবে বুঝতে ও পরিচালনা করতে পারে। স্থূল-জীবনের কল্যাণের জন্য তাই প্রয়োজন কারণমুখিনতা। কারণ, অপরিবর্ত্তনশীল সৎকে বাদ দিয়ে পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে এবং অসীমকে বাদ দিয়ে সসীমকে আমরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে, বুঝতে ও জানতে পারি না। জীবন ও জগৎ গতিশীল। কিন্তু এই গতিশীলতার সার্থকতার জন্য চাই গন্তব্য সম্বন্ধে সদাজাগ্রত সচেতনতা ও তদভিমুখী চলন। এরই মধ্যে নিহিত আছে আত্মিকতা ও

জাগতিকতার শুভ সমন্বয়। উভয়েরই উদ্দিষ্ট ঈশ্বরপ্রাপ্তি। সবটা যেয়ে পর্য্যবসিত হ'চ্ছে একে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি জগতে মূলতঃ এক, অদ্বিতীয়ই আছেন। তবে যে আমরা জগতে বহু বৈচিত্র্য দেখতে পাই সেগুলি কি সব মিথ্যা? না, তা' নয়। একই বহু হয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞান বা বৃদ্ধির জ্ঞানলাভ করা মানে, জানা সেই এক কোথায় কোন্ ঔপাদানিক সংস্থিতি নিয়ে কিভাবে কী হ'য়ে আছেন এবং কোন্ বিশেষের সংগঠন কী, গুণ কী, ক্রিয়া কী। তাহ'লে ব্রহ্মজ্ঞানই ডেকে আনে বৈশিষ্ট্যবোধ, বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। আর, স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পথে না চ'লে ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ, বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ইষ্টানুপূরণ ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্যপালী সাত্বত সেবাই বাস্তববৃদ্ধি ও বোধবিকাশের পথ। আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাধনা, ভক্তি, বৈশিষ্ট্যানুসরণ, সেবা, কর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, ত্যাগ, ভোগ, ইহকাল, পরকাল সবই একসূত্র নিবদ্ধ। কারণ, সবটারই উদ্দেশ্য সমষ্টিগত সত্তাপোষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যষ্টিগত সত্তাপোষণ। সত্তার পূর্ণতার প্রতীক হ'লেন ইষ্ট। তিনি হ'লেন নামী পুরুষ। বিশ্বের মূলে যে অনাহত আদিবাক, যার থেকে সৃজনধারা প্রসূত হ'য়ে চলেছে, তিনি হলেন তার রক্তমাংসসঙ্কুল চেতন বিগ্রহ। কারণমুখী হওয়ার জন্য তাই চাই দীক্ষা, আত্মসমর্পণ, নামসাধন, পরিবেশের প্রাণঢালা সেবা ও সর্ব্বতোভাবে নামীর অনুসরণ। সমস্ত জীবনের সব-কিছুই প্রযুক্ত হওয়া চাই তঁৎপ্রীত্যর্থে, তঁৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার্থে। তাতে আমরা অহমিকা, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার ঊর্দ্ধে উঠি। তাছাড়া, প্রবল ইষ্টনিষ্ঠা থাকলে প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন, দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট, রোগ, শোক, তাপ, সুখ ঐশ্বর্য্য বা প্রলোভন কিছুতেই আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারে না। আমরা হ'য়ে উঠি চির-অপরাজেয়। সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, জগতে মন্দের কোন নিরপেক্ষ ও পরম অস্তিত্ব নেই, তার উদ্ভব হয় উৎস-বিমুখতা-প্রসূত অজ্ঞতা থেকে। তাই, উৎসমুখিনতাকে অকাট্য ক'রে তোলার মধ্যেই আছে মন্দের নিরসন। আর, ইষ্ট তথা ঈশ্বর বা পরমউৎসে বৃত্তিভেদী, অহেতুক ঊর্জ্জী অনুরাগের ভিতর-দিয়েই হয় আমাদের জীবন্মুক্তি। ঐ অবস্থায় আমরা প্রবৃত্তি-অভিভূতিমুক্ত হ'য়ে ইষ্টকে তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করতে পারি। একেই বলে আত্মদর্শন। যে মূল এক জগতের বহুত্বে বিরাজ করছেন, সেই অবস্থায় তিনি কখনও আমাদের চেতনা থেকে অন্তর্হিত হন না। আমরা ইষ্টকেন্দ্রিক

বিশ্বাত্মবোধে উপনীত হ'য়ে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ইষ্টকেই দেখি, ইষ্টকেই সেবা করি, ইষ্টকেই উপভোগ করি, ইষ্টেই বসবাস করি, ইষ্টেরই গুণগান করি, ইষ্টার্থেই বাঁচি, ইষ্টের জন্যই যা'-কিছু করি। এমনি ক'রেই জীবন ও জগতের নানা বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা, অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য, এককথায়—ভরদুনিয়ার যাবতীয় যা'-কিছু সব একার্থ-সার্থকতায় সার্থক হ'য়ে একায়িত হ'য়ে ওঠে। আমরা সমাহারী প্রজ্ঞায় উপনীত হই। সব-কিছুই আমাদের বোধের সমক্ষে একসূত্র-সঙ্গতিশীল অর্থদীপনা নিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। নিষ্ঠানন্দিত একমুখিনতার ফলে বিষয়-কর্ম্ম বা আত্মিক-অনুশীলন, অপরাবিদ্যা বা পরাবিদ্যা যখন যা'-কিছু নিয়েই আমরা লিপ্ত থাকি না কেন, আমাদের যোগজীবন বা ব্রহ্মবিহার কখনও লহমার জন্য ছিন্ন হয় না। গোটা জীবনটা এক অতন্দ্র উৎস-অভিসারে পরিণত হয়। সে যেন এক একৈকলক্ষ্য আত্ম-সমাহিত পূজারী। তাছাড়া, সবার সঙ্গে একাত্মবোধ সহজ হ'য়ে ওঠায় ব্যবহারিক জীবনেও তা' প্রতিফলিত হয়। জীবনচলনার সর্ব্বক্ষেত্রে নিয়ামক নীতিই হয়—'অপরের প্রতি কর সেই আচরণ, নিজে তুমি পেতে যাহা কর আকিঞ্চন।' আত্মপ্রীতি বিশ্বপ্রীতিতে উদগতিলাভ করে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এই বোধই সর্ব্বপ্রকার মানবিক সম্পর্ককে চিরমধুর ক'রে তোলে। তাই, তখন সব-কিছুর ভিতর-দিয়েই সপরিবেশ আমরা অন্তহীন অখণ্ড জীবন ও অক্ষয় অমৃতের অধিগমনে অঢেল হ'য়ে উঠি। এই তো দর্শন-প্রদর্শিত জীবনদর্শনের বাস্তবরূপ। আর, এরই অনুবর্ত্তনে জীবনের পরম উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ ধারণ-পালনী-সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বলাভ বা ভগবান লাভ অর্থাৎ সতত-সাত্বত সেবানিরত চারিত্র্য অর্জ্জন এবং স্মৃতিবাহী-চেতনালাভ—তা' মানব-সমাজে আরও-আরও বাস্তবায়িত হবে এবং মানব-বিবর্ত্তন এক নবতর-অধ্যায়ে উন্নীত হবে। তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষে জগৎ ও জীবন নিছক ব্রহ্মময় হ'য়ে উঠবে। মানুষের বস্তুতান্ত্রিক বিকাশ ও আত্মিক বিকাশ পরস্পর-পরস্পরের সহায়ক হ'য়ে হাত ধরাধরি ক'রে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চরম সম্ভাব্যতার বাস্তব রূপায়ণকে ত্বরান্বিত ক'রে তুলবে। দেব-মানব ও দিব্যসভ্যতার অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠবে বিশ্বে।

বন্দে পুরুষোত্তমম্

কতিপয় অভিমত

অখণ্ড জীবন দর্শন (প্রবন্ধ)। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস, পি (বিহার)। দাম—নয় টাকা।

'সৎসঙ্গ' প্রতিষ্ঠানের সমগ্র ভাবধারা নিয়ে রচিত গ্রন্থ অখণ্ড জীবন দর্শন। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ব্যক্তিক ও ব্যবহারিক জীবন এবং সমাজের অভ্যন্তরে সর্ব্বমানবের মানসিক ও আত্মিক জীবন ভাবনা ধারণার রূপ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বস্তু এবং আত্মিক জগতের মূলীভূত অস্তিত্ব ও লক্ষ্য যে অদ্বয়শক্তি—তারই সহজ সরল বিশ্বাস্য এবং আদরণীয় ব্যাখ্যা দান করেছেন এই গ্রন্থে। লীলাবাদীরা বলে গেছেন "লীলার্থম কল্পিতম্ দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম"। কিন্তু এই চিরকালের লীলাবাদীদের ধ্যান ধারণার পাশে সৎসঙ্গের মূল কথা প্রসঙ্গে এসে প্রবন্ধকার জানিয়েছেন—

"অপরিবর্ত্তনশীল সৎ-কে বাদ দিয়ে পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে এবং অসীমকে বাদ দিয়ে সসীমকে আমরা যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে, বুঝতে ও জানতে পারি না।" (সৃষ্টির মূল তত্ত্ব)।

বস্তুত প্রবন্ধকার সৎসঙ্গের মূল লক্ষ্য ও ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করেই মানুষের গড়া আবহমান কালের সংসার তার যাবতীয় বাস্তব জীবন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভাল-মন্দের চমৎকার যুক্তিগ্রাহ্য বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। 'সাহিত্য', 'শিল্পকলা ও বিজ্ঞান', 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি', 'শিক্ষা', 'অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ', 'প্রতিলোম বিবাহ', 'পারিবারিক জীবন', 'সমাজ জীবন' ইত্যাদি অধ্যায় সুচিন্তিত মন্তব্যে ও সহজ সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ্য অংশ বলে বিবেচিত হবে। সংসারের মধ্যে থেকেও মানুষ কিভাবে সুস্থ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে সামাজিক, শিক্ষা-সম্বন্ধীয়, সাহিত্য ও রাজনীতি সর্ব্বোপরি দর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তায় দৈনানুদৈনিক জীবন ভাবনাকে সম্মিলিত করতে পারে, 'অখণ্ড জীবন দর্শনের' লেখক তার নির্দ্দেশ দিয়েছেন নিখুঁতভাবে।

গ্রন্থটির সবচেয়ে বড় গুণ এর ভাষা এবং দুরূহ তত্ত্ব ও দর্শন চিন্তাকে সহজ

করে সাধারণ মানুষের জন্য বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা। সৎসঙ্গের পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমের যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরা ছাড়াও যাঁরা বাহিরে আছেন তাঁরাও এই গ্রন্থ-পাঠে সৎসঙ্গের বিরাট ধর্ম্মীয় কর্ম্মযজ্ঞের ও ভাবযজ্ঞের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন। সাধারণ সংসার-দীক্ষিত মানুষ আলোচ্য গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন সহজেই। এই বিশ্বাস গ্রন্থ-পাঠান্তে জন্মেছে বলেই গ্রন্থ ও গ্রন্থের লেখক অভিনন্দন-যোগ্য। বস্তুত গ্রন্থটি সর্ব্বস্তরের মানুষের সংগ্রহযোগ্য।

("অমৃত" ১৩ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।)

(২)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান এবং সেই একত্বের মধ্যে নিজের সত্তার অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকেই হল দর্শনের উৎপত্তি। জ্ঞানের সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে সৃষ্টি থেকেই রহস্যের আদি-অন্ত আবিষ্কার করার সাধনা থেকে বিবিধ দর্শনের সন্ধান পেয়েছে মানুষ। সহজ ও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, খণ্ড, ছিন্ন ও ভিন্ন বোধ দূর করে যে জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তাকে অখণ্ড বলে উপলব্ধি ক'রে, নিজেকে সর্ব্বময়ের সঙ্গে মিলিত বা যুক্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—তাকেই অখণ্ড জীবন-দর্শন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রদর্শিত পথকে আমরা অখণ্ড জীবন-দর্শনের পথই বলতে পারি। তাঁর একটি বাণী হল, "সত্তা সচ্চিদানন্দময়", আমরা আছি মানেই আমাদের সত্তা আছে। এতদ্‌ব্যতীত তাঁর অপর একটি বাণী হল, "আমাদের গন্তব্য হ'ল ঈশ্বরপ্রাপ্তি।" গন্তব্য স্থলে উপনীত হতে অগ্রসর হবার জন্য যে সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই, শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দেশিত সেই সকল বিষয়েই এই গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন প্রাজ্ঞ গ্রন্থকার, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের বিভাব যেমন বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থের মধ্যে, তেমনি অপর দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত রচিত এই গ্রন্থ "সৎসঙ্গ"-র ভাবধারার প্রাঞ্জল পরিচয় বহন করে এনেছে।

কেবলমাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকরাই গ্রন্থখানি পাঠ করে তৃপ্তি পাবেন না, সাধারণ চিন্তাশীল পাঠকরাও বহু জিজ্ঞাসার উত্তর পাবেন—এই মূল্যবান গ্রন্থখানির মাধ্যমে।

(দৈনিক বসুমতী, সোমবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৮৩, ১২ই জুলাই, ১৯৭৬ ইং)

(৩)

গ্রন্থের মুখবন্ধে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৬৪ সালের শেষভাগে আমাকে সৎসঙ্গের সমগ্র ভাবধারা নিয়ে একখানি বই লিখতে বলেন। তার অব্যবহিত পরে এই বই লেখা সুরু করি। 'সত্তা সচ্চিদানন্দময়' বলে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে বাণীটি আছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অবলম্বন করে প্রথম অধ্যায়টি রচিত হয়, একেবারে শেষ অধ্যায় ছাড়া অন্যান্য অধ্যায়গুলি রচিত হয় 'আমাদের গন্তব্য হল ঈশ্বরপ্রাপ্তি'—এই বাণীর উপর ভিত্তি করে।

লেখকের দৃষ্টি একটি লক্ষ্যে থাকলেও সেই লক্ষ্যের পথ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ধর্ম্ম, ইষ্ট থেকে সুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কৃষি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, বিশ্বশান্তি প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে সে আলোচনা লেখকের সেই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যার লক্ষ্য হল ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

লেখকের ভাষা সুন্দর, বিশ্লেষণ হৃদয়গ্রাহী। যাঁরা তাঁর এই বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হবেন না তাঁদেরও গ্রন্থটি ভাল লাগবে। তাঁরা গ্রন্থটির সর্ব্বত্র একটি প্রত্যয়-নিষ্ঠ মনের সন্ধান পাবেন।

(যুগান্তর—শনিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৮১, ইং ২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৪।)